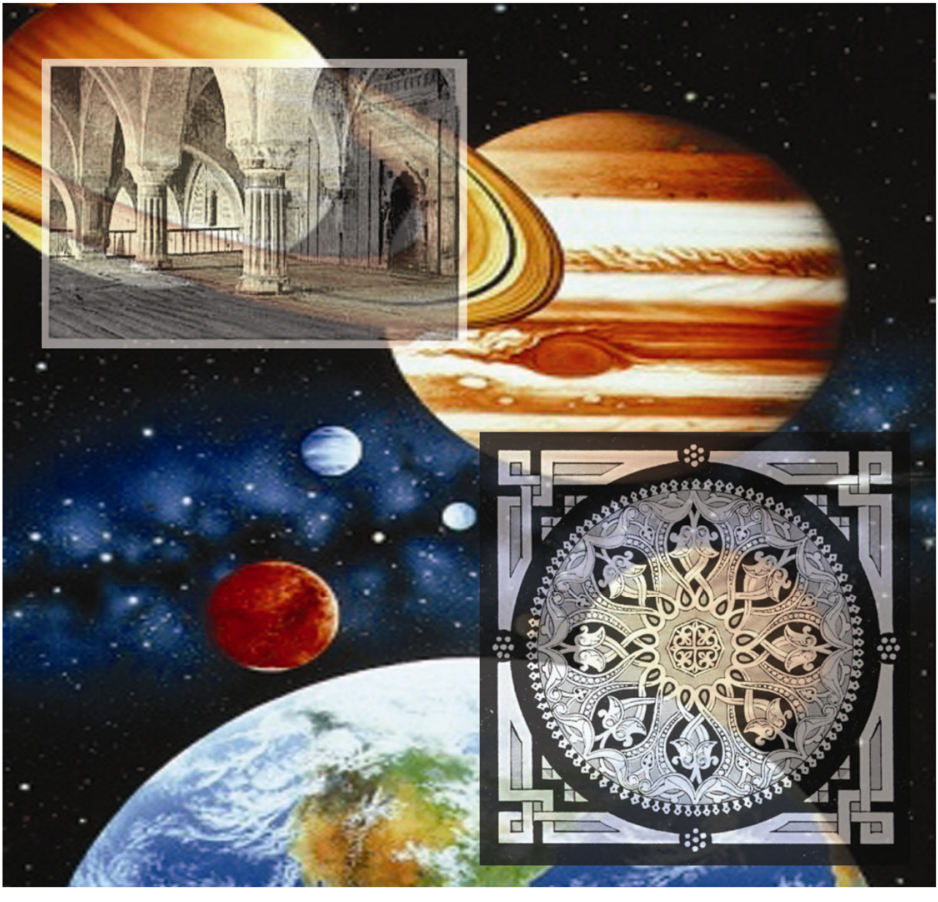
ইসলাম ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড



ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইসলাম ও বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

রচনাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।
engineerazizulbari@gmail.com

✲✲✲✲ বিষয়সূচী ✲✲✲✲



ইসলাম ও বিজ্ঞান (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রচনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

গবেষণা বিভাগ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন
শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির

দু'আ ও বাণী

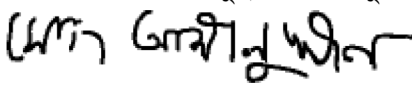
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমার প্রিয় মুরীদ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী এই গ্রন্থটি বেশ পরিশ্রমের বিনিময়ে রচনা করেছেন। এতে ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আধুনিক যুগে মানুষ বিজ্ঞানকে খুব বেশি আকড়ে ধরেছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কেউ কিছু বুঝতে বা বিশ্বাস করতে চায় না। লেখক বইটিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা চালিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের কোনো হক্ব তথ্য ইসলামের সঙ্গে মোটেই সংঘাতময় নয়- বরং এসব ক্ষেত্রে শুধু মিল আর মিল বিদ্যমান। আমি মনে করি সকলেই এই কিতাব পাঠ করে উপকৃত হবেন। আমি দু'আ করি এটা পাঠকদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হোক।

আমি লেখকের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন তার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। সবশেষে বইটির বহুল প্রচার কামনা করে শেষ করছি।

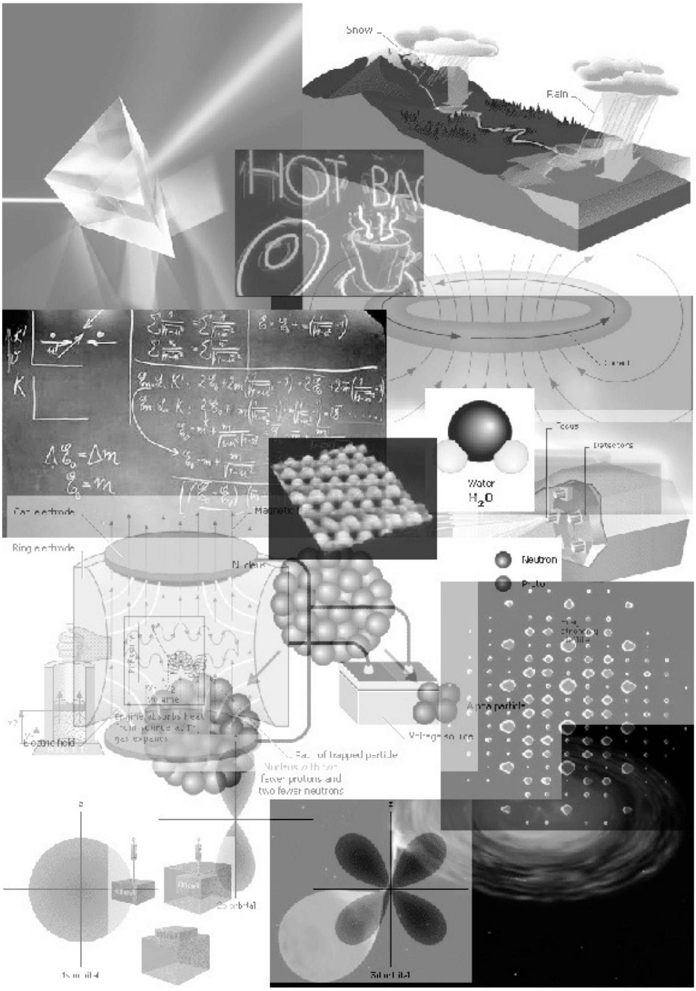
মুহাম্মদ আমীনুদ্দীন



প্রতিষ্ঠাতা মুহতামীম
দারুল উলূম জামিয়া ইসলামিয়া অলৈতলী ও কাতিয়া
জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ
২৩ জুন, ২০০৬ ঈসায়ী।

দ্বিতীয় খণ্ড

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি



"তিনি পূর্বদ্বয়ের প্রতিপালক (মালিক) এবং পশ্চিমদ্বয়ের প্রতিপালক (মালিক), অতএব তোমারা (হে মানুষ ও জ্বিন জাতি!) স্বীয় প্রভূর কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারূপ করবে?" [সূরা আর-রাহমান ঃ ১৭-১৮]

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ভূমিকা

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিধি ব্যাপক। বর্তমান বিশ্বে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করছে যে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে আলাদা একটি বিশ্বকোষ লিখতে হবে। এছাড়া প্রতিটি আবিষ্কার ও বিশেষকরে প্রযৌক্তিক অসংখ্য উন্নয়ন সম্পর্কে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা উপস্থান করা এরূপ একটি পুস্তকে আদৌ সম্ভব নয়। তবে এ খণ্ডে পাঠকদেরকে বিরাট এই বিষয়ের উপর সাধারণ একটি পরিচিতি তুলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান বিষয়ে এটা কোন টেক্স বুক নয়। সাধারণ্যের নিকট ইসলামের আলোকে বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রাখাই এই পুস্তক রচনার আসল উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য হসিলে শেষ খণ্ডে ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যতার উপর বিশদ আলোচনা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক আলোচনা এবং এ খণ্ডে আলোচিত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপার-স্যাপার পাঠকদের মানসিকভাবে এবং যৌক্তিকভাবে শেষ খণ্ডটি পড়ে আসল মেসেজটি অনুধাবন করার প্রস্তুতি যোগান দেবে। সুতরাং এই খণ্ডে আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রধান প্রধান দিক ও এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন জটিল বিষয়ের গভীর গবেষণায় না গিয়ে সাধারণ্যের বোধগম্য মূল বক্তব্য তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তবে যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মৌলিকভাবেই তেমন সহজ বিষয় নয়, সুতরাং অনেকে

হয়তো বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত বক্তব্য পুরোদমে অনুধাবন করতে পারবেন না। বিজ্ঞানের উপর যাদের ন্যুনতম জ্ঞান আছে তারা কিন্তু সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি অনুরোধ করবো, যারা বিজ্ঞানের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞাত তারাও সবকিছু পাঠ করে অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। এতে আর কিছু না হলেও বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও জানার স্পৃহা জাগ্রত হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়া একটি কথা এখানে বলে রাখা জরুরী। আজকাল বিজ্ঞানের মূলতঃ ইংরেজিভিত্তিক একটি আলাদা ভাষা আছে। সুতরাং এটাকে বাংলায় সরল করে বলাও সহজ ব্যাপার নয়। আমি যতটুকু সম্ভব ইংরেজি বা নন-বাংলা শব্দব্যবহার এড়িয়ে গেছি- কিন্তু দু'একটি ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ যেহেতু বাংলা ভাষাভাষীদের জন্যও বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ তাই বিদেশী শব্দটিই রেখে দিয়েছি।

বিজ্ঞানের মূল শাখা মাত্র দু'টি। এর প্রথমটি হলো বস্তুজগত ও অপরটি প্রাণীজগত। বস্তুজগতের অনেকগুলো প্রতিশাখা আছে। যেমনঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আনবিক বিজ্ঞান, মহাকর্ষ, পরমাণূ বিজ্ঞান, ইলেকট্রিসিটি ও চুম্বক, মেকানিক্যাল সাইন্স ইত্যাদি। একইভাবে প্রাণীজগতেরও অনেক প্রতিশাখা আছে। যেমনঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান, বায়োলজী, ভেষদবিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি।

অণু-পরমাণু থেকেই পুরো বস্তুজগত সৃষ্ট। সুতরাং ছোট থেকে বড়- অণু থেকে মহাবিশ্ব, এ তরতীবে আমি বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছি। শেষের দিকে প্রযুক্তির মৌলিক বিভিন্ন দিক আলোচনা হয়েছে। তবে আবারও স্বীকার করে নিচ্ছি যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরাট ফিল্ডের সর্বত্র বিচরণ এ গ্রন্থে সম্ভব হয় নি। বলা চলে বিরাট এই বিষয়ের উপর কিছুটা ভাসাভাসা আলোচনা মাত্র এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। যদি আল্লাহ পাক তাওফিক দেন এবং বর্তমান গ্রন্থখানা পাঠকদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে তাহলে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর আলাদা করে বই-পুস্তক লিখে প্রকাশের আশা রাখি।

"ইয়া-সীন, বিজ্ঞানপূর্ণ কুরআনের শপথ" [সূরা ইয়াসীন ঃ ১-২]।

পরিচ্ছেদ ১

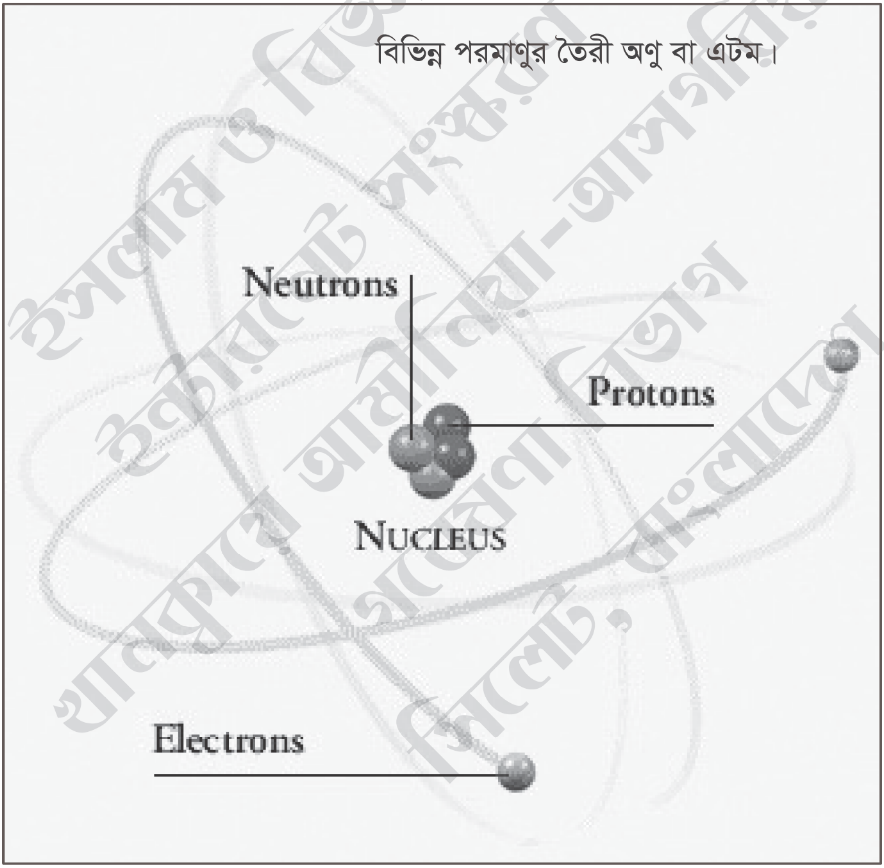
অণু থেকে মহাবিশ্ব ঃ বস্তুজগত

বস্তুজগত নিয়ে গবেষণার নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। এই বস্তুজগতের স্বরূপ জানার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আমরা অণু-পরমাণু থেকে মহাবিশ্বের অসংখ্য তারকাজগত নিয়ে আলোচনা করবো। জগতের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক- অণুর স্বরূপ, এর সম্পর্কে বিভিন্ন থিওরী ও মডেল, এর ভেতরের মৌলিক শক্তি প্রভৃতি আমরা প্রথমে বর্ণনা করবো। এরপর এই অণু থেকেই কিভাবে সমগ্র মহাবিশ্বটি গড়ে উঠেছে এবং অস্তিত্ব বজায় রাখছে সেসব ব্যাপারে আলোচনা হবে। আমরা বিষয়টিকে সরলকরণে এ খণ্ডের বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করেছি। পাঠকদের সঙ্গে সংলাপভিত্তিক এই উপস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানের জগতকে জানার এই পদ্ধতি পাঠকদের সরাসরি অংশগ্রহণ করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাছাড়া এরূপ বর্ণনাভঙ্গি ভাষাগত দিক থেকেও বেশ চিত্তাকর্ষক বলে মনে করি। তবে সবক্ষেত্রেই যে এভাবে বর্ণনা দেয়া হবে- তা নয়, একমাত্র প্রয়োজনবোধে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অণু বা এটম

একটি পাকা বিল্ডিং তৈরীর জন্য মৌলিক কিছু উপাদান জরুরী। যেমন, ইট, বালু, পাথর, রড-সিমেন্ট ইত্যাদি। এসব মূল বস্তু যোগাড় হয়ে গেলে এগুলোকে কিছু বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তার আগে রাজমিস্ত্রীর হাতে থাকতে হবে বিল্ডিং আর্কিটেকের একটি সুপরিকল্পিত প্ল্যান বা নক্সা। এই নক্সাকেই নির্মাণ-কৌশলীরা মৌলিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবে রূপান্তর করেন। তারা গড়ে তুলেন অট্টালিকার ফাউণ্ডেশন, ফ্লোর, দেয়াল, ছাদ, কক্ষ, দরজা, জানালা, ইত্যাদি। সুতরাং মৌলিক উপদান থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠে একটি পূর্ণাঙ্গ

অট্টালিকা। বস্তু জগতটাও এরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ মাষ্টার প্ল্যানের বাস্তবতা। এর আর্কিটেক প্রথমে কিছু মৌলিক বিল্ডিং ব্লক তৈরী করে এগুলোকে একটি বিরাট পরিকল্পনা মুতাবিক বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন। স্বভাবের এই মৌলিক বিল্ডিং ব্লকের নামই হচ্ছে এটম বা অণু। তবে যেভাবে ইটকেও বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রথমে তৈরী করতে হয় সেভাবে অণুকেও প্রথমে একাধিক আরও মৌলিক বস্তু দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এসব বস্তুর নাম হলো সাব-এটমিক পার্টিকেল বা পরমাণু।



বিভিন্ন পরমাণুর তৈরী অণু বা এটম।

এ মহাবিশ্বের সবকিছু পরমাণু থেকে সৃষ্ট এটম দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। আপনার দেহ, মাটি, আগুন, পানি, বাতাস, বৃক্ষ-তরু-লতা, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা প্রভৃতি বস্তু জগতের যা কিছুই বিদ্যমান সবই সৃষ্টি হয়েছে এই অণু দিয়ে। সুতরাং স্বভাবের এই মৌলিক বস্তু অণু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে বিজ্ঞান বিষয়ের আসল জিনিষটিই আমরা জানতে পারবো না। তাহলে, এবার এই অণু সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে তা ভালো করে তলিয়ে দেখা যাক। তবে এখানে একটি কথা পাঠকদের আগেই জানিয়ে দেওয়া জরুরী মনে করছি- আর তাহলো, অণু কিংবা এমনকি বিজ্ঞানের যাবতীয় জ্ঞানই কিন্তু ফাইনেল বা চূড়ান্ত জ্ঞান নয়।

আজ অণু সম্পর্কে বিজ্ঞান যা বলছে তা ১০০% সত্য বলে দাবী করার কোন উপায় নেই। কারণ, কাল হয়তো বিজ্ঞানই আবিষ্কার করবে যে, সেই ধারণা বা থিওরীটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলো না। কিংবা এমনও হতে পারে যে, আজ বিজ্ঞান যা জানে না, কাল তা আবিষ্কার হবে। সুতরাং এই খণ্ডে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যই যে, চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য তা ভাবার কোন পথ নেই। এ ব্যাপারে পাঠকরা শতর্ক থাকবেন আশাকরি। যা হউক, অণু সম্পর্কে জানা তথ্য এখন একে একে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

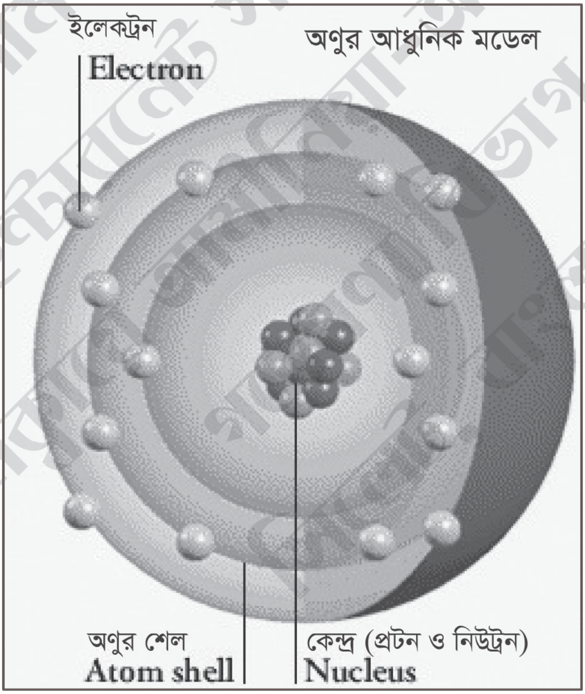
অণুর আধুনিক মডেল

অণু খুব ছোট্ট বস্তু। খালি চোখে এগুলো দেখা তো দূরের কথা, এমনকি শক্তিশালী মাইক্রস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না। একমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ নামক অণুবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে অণুকে দেখতে পাওয়া যায়। একেকটি অণুর আয়তন হচ্ছে ১০ প-১০ মিটার। এর অর্থ হলো ১ মিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ। ১ সেন্টিমিটার ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (কিউবিক) বস্তুর মধ্যে অন্ততঃ১০ প ২৪ টি অণু আছে। এ সংখ্যাটি হচ্ছে ১০ বাদে ২৪টি শূন্য দিলে যে বিরাট নাম্বার হয় সেই নাম্বার। সুতরাং অণু যে কত ক্ষুদ্র বস্তু তা সহজেই অনুমেয়। বাস্তবে এদের আয়তন সঠিকভাবে ধারণা করাই সম্ভব নয়। আর এ কারণেই এগুলো সম্পর্কে পুরো তথ্য আবিষ্কার করাও কঠিন।
[নোট: ১০ প –১০ অর্থ ১০ পাওয়ার মাইনাস ১০ এবং ১০ প ২৪ অর্থ ১০ পাওয়ার প্লাস ১০]

আধুনিক এটমিক থিওরীর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ

অণুকে ভালো করে বুঝতে হলে আধুনিক যুগে এ সম্পর্কে কিভাবে বিভিন্ন থিওরী উপস্থাপিত হয়েছে তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

উনবিংশ শতাব্দিতে সর্বপ্রথম এটমের উপর গবেষণার গুরুত্ব বিজ্ঞানীরা অনুধাবন করেন। তখন থেকে এই ফিল্ডে কিছু লোক বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এটম গবেষণা একটি ইজম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকেই এটমিজম শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সে সময় দুটি এটমিক মডেল গড়ে উঠে- এর একটি ছিলো জন ডালটনের আর অপরটি রুডলফ কোসিয়াস ও জেমস ক্লার্ক মেস্কওয়েল উপস্থাপন করেন।



ডালটনের মডেলের মৌলিক বিষয় হচ্ছে অণুর ওজন নিয়ে গবেষণা। অপরদিকে কোসিয়াস ও মেস্কওয়েলের মডেলের মৌলিক দিক ছিলো গ্যাস অবস্থায় অণুর ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়া নিয়ে। তবে অণুর প্রকৃত স্বরূপ তখন থেকেই উন্মোচন হতে থাকে, যখন জে জে থমসন ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রন নামক পরমাণু আবিষ্কার করেন। এ থেকেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ আসলে অণু নয় বরং এসব পরমাণু। এছাড়া বিংশ শতকের শুরুতে আরেক মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে আসে। মেরী কিউরী, হেনরী বেকুরেল প্রমুখ লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন মৌলিক পদার্থের অণুগুলো স্থায়ীভাবে একই অবস্থায় থাকে না। যেমন ইউরেনিয়ামের (একটি পদার্থ) অণু ধীরে ধীরে থরিয়াম (আরেকটি পদার্থ) নামক বস্তুর অণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এরপর এ অবস্থা থেকেও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত লেড বা সীসায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর ক্রিয়াটি রেডিওএকটিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা নামে পরিচিত। এর কারণ হলো, পরিবর্তনের সময় অণু থেকে রেডিয়েশন বা তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ হয়। এই তেজষ্ক্রিয়া মূলত একটি শক্তিশালী এনার্জি (উদ্যম)।

অণু সাধারণতঃ ইলেকট্রিক্যাল দিক থেকে নিউট্রেল বা ব্যালান্স অবস্থায় আছে। অণুর চতুর্দিকে ঘুর্ণমান ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে একটি ঋণাত্মক (নেগিটিভ) চার্জ বিদ্যমান। কিন্তু এগুলোকে ব্যালান্স করে রাখতে অপর একটি ধণাত্মক (পজিটিভ) চার্জের প্রয়োজন দাঁড়ায়। এছাড়া অণুর ওজনের এক ক্ষুদ্রাংশ আছে ইলেকট্রনের মধ্যে- সুতরাং বৃহত্তর ওয়েট বা ওজন অন্য কোথাও অবস্থান করছে। এসব চিন্তা থেকেই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, অণুর কেন্দ্রে বিরাট শক্তিশালী একটি ধণাত্মক অংশ আছে যাকে বলা হয়, নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র সবগুলো ইলেকট্রনকে ধরে রেখেছে। কিন্তু যেহেতু তারা ঘুর্নমান তাই নিউক্লিয়াসের উপরে যেয়ে পতিত হয় না। ব্যাপারটা অনেকটা সৌরজগতের মতো। সূর্যের বিরাট মহাকর্ষ প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহকে আটকে রেখেছে কিন্তু কোনটাই তার উপরে যেয়ে পতিত হচ্ছে না। তার কারণ হলো, গ্রহগুলোর বার্ষিক গতি বা প্রদক্ষিণ। সুতরাং সূর্য যেভাবে সৌরজগতের সেন্টারে অবস্থান করে গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে ঠিক তদ্রুপ নিউক্লিয়াস নিজের শক্তি দিয়ে ইলেকট্রনকে ধরে রেখেছে। কিন্তু এই নিউক্লিয়াস কি? এবার এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য বিজ্ঞানীরা ব্যকুল হয়ে উঠলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে একটি মডেল তৈরী হলো।

রাদারফোর্ড মডেল

রাদারফোর্ড নামক বিজ্ঞানী গত শতকের প্রথম দিকে অণুর একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, প্রতিটি অণু একটি ইলেকট্রিক্যাল আকর্ষণের মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যে একটি ফোর্স বিদ্যমান। ঠিক যেভাবে সূর্য ও গ্রহের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে মহাকর্ষ। এই মডেল অনুযায়ী নিউক্লিয়াস থেকে দূরে অবস্থান করে ইলেকট্রন চতুর্দিকে ঘুর্নমান আছে। রাদারফোর্ডের এই মডেলটি প্রাত্যহিক রসায়নিক বিভিন্ন ঘটনা এবং পদার্থের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনেকটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই মডেল কিন্তু চূড়ান্ত ছিলো না। অণুর বিভিন্ন অংশ নিয়ে আরও গভীর গবেষণা শুরু হয় এবং অবশেষে বিজ্ঞানের নতুন একটি শাখার জন্ম হয় যাকে আমরা আজ “এটমিক ফিজিক্স” বা আনবিক পদার্থবিজ্ঞান নামে জানি।

বিজ্ঞানীদের গভীর গবেষণা শুরু হওয়ার পরই রাদারফোর্ডের উপরোক্ত মডেলের উপর দুটি ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ তাঁর এ মডেলটির ভিত্তি ছিলো নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, নিউটনের থিওরী অনুযায়ী একই পদার্থের ভিন্ন এটমের মধ্যকার ইলেকট্রনগুলো যে কোন পথে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল- তা এভাবে হয় না। একই পদার্থের সবগুলো ইলেকট্রনই একটি বিশেষ প্রদক্ষিণপথে ঘুরে। দ্বিতীয়তঃ ঘুরার সময় ইলেকট্রনগুলো সর্বদাই তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ করার কথা- এর ফলে নিজেদের এনার্জি হারিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা নিউক্লিয়াসের উপর পতিত হবে। এ হিসেবে স্বভাবের সর্বাপেক্ষা সাধারণ পদার্থ হাইড্রোজেন অণু (এই অণুর একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে) মাত্র ১০ প-৯ সেকেন্ডের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা-তো হয় না।

সুতরাং যেহেতু রাদারফোর্ডের মডেল সম্পূর্ণ নির্ভুল হলে উপরোক্ত দুটি ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার কথা, তাই বিজ্ঞানীরা এই মডেলকে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। এই সংস্কার কাজে হাত দিলেন নিয়েল্স বোর নামক এক বিজ্ঞানী। ১৯১৩ সালে তিনি তাঁর নতুন মডেল প্রকাশ করলেন।

বোর মডেল

নিয়েল্স বোর অণুর যে মডেল উপস্থাপন করেন তাতে বলা হয়েছে, অণু বাস্তবে বিভিন্ন স্টেজে থাকে। এর মধ্যে একটি মৌলিক অবস্থা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেজ।

সাধারণতঃ অণু এই স্টেজে থাকাকালে সম্পূর্ণ অপরিবর্তন হওয়ার অবস্থায় বিরাজ করে। এটাকে স্থির অবস্থাও বলা যায়। এই অবস্থায় বোর দেখিছেছেন অণু থেকে কোন ধরণের তেজষ্ক্রিয়াও বিকিরণ হয় না। তবে অণুকে এই স্থির অবস্থা থেকে এনার্জির মাধ্যমে এক্সাইটেড বা অস্থির অবস্থায়ও ফেলা যায়। দুটি উপায়ে অণুকে অস্থির করা যায়- একটি হলো রেডিয়েশন ও অপরটি সংঘর্ষ। তিনি বলেন, অণুকে এভাবে অস্থির করার পর সে খুব দ্রুত ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশন- যেমন এক্স-রে, গামা-রে, রেডিও ওয়েভ প্রভৃতি এনার্জি বিকিরণ করে আবার তার স্বাভাবিক গ্রাউন্ড স্টেজে ফিরে যাবে। বোর আরও বলেন, এই যে রেডিয়েশন বের হয়ে আসে এগুলো একেকটি প্যাকেট বা কোয়ান্টা হয়ে আসে। এই কোয়ান্টার নাম হলো ফোটন। বোর এ মডেল সৃষ্টিতে ম্যাক্স প্লাংকের প্রখ্যাত কোয়ান্টাম থিওরী ব্যবহার করেন। বোর এর মডেলকে বিজ্ঞানীরা কিছু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

নিউক্লিয়াস

এ পর্যন্ত আমরা যা জানতে পেরেছি তাহলো, অণুর দুটি মৌলিক অংশ আছে- নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র) ও একে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ (ধণাত্মক) ও ইলেকট্রনের চার্জ নেগিটিভ (ঋণাত্মক)। ইলেকট্রন সম্পর্কে কিছুটা ধরাণা আমাদের জন্মেছে। তবে নিউক্লিয়াস আসলে কি? এর মধ্যে আরও পরমাণু থাকতে পারে কি? আসুন তাহলে, নিউক্লিয়াসকে আরও গবেষণা করে দেখা যাক।

পদার্থবিদরা যখন ইলেকট্রন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করলেন তখন তাদের পুরো দৃষ্টি পড়লো নিউক্লিয়াসের উপর। তারা নিউক্লিয়াসকে আরও জানার জন্য গবেষণা শুরু করলেন। রেডিওএকটিভ ক্ষয়ের (তেজষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয়) কারণে কোন কোন

নিউক্লিয়াস যে রদবদল করে তা আগে থেকেই জানা হয়ে গিয়েছিল। রাদারফোর্ড ১৯১৯ সালে দেখিয়েছেন যে, কৃত্রিম উপায়েও এই অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব। এতে দেখা গেছে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস থেকে একটি পরমাণু বেরিয়ে এসেছে যার নাম হলো প্রটোন। সুতরাং নিউক্লিয়াসে যে প্রটোন নামক একটি বস্তু আছে তা জানা হলো। এবার সবাই ধারণা করলো অণুর নিউক্লিয়াসও মূলত একাধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। এটারও বিল্ডিং ব্লকস্ আছে।

তবে কিছুদিন সবার বিশ্বাস জন্মে যে, বিভিন্ন বিল্ডিং ব্লক মূলতঃ এক বা একাধিক প্রটোন থেকে গঠিত। অর্থাৎ এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যক প্রাটোন দ্বারাই নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছে। এ ধারণা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে এটা পরিষ্কার হলো যে, নিউক্লিয়াসে প্রটোন ছাড়াও অন্যান্য আলাদা কিছু পরমাণু নিশ্চয়ই বিদ্যমান। ১৯৩২ সালে এ ব্যাপারে আরও জানা গেল। এ বছর জেমস চাদউইক নামক এক বিজ্ঞানী নিউট্রন নামের আরেকটি পরমাণু আবিষ্কার করেন। এটিও নিউক্লিয়াসের বাসিন্দা। এই নতুন পরমাণুর নিজস্ব কোন চার্জ নেই- তবে তার ওজন প্রটোন থেকেও বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ নিউক্লিয়াসের বাসিন্দাগণ হচ্ছে প্রটোন ও নিউট্রন নামক পরমাণু। যেমন হিলিয়াম পদার্থের নিউক্লিয়াসে আছে দুটি প্রটোন এবং দুটি নিউট্রন।

এই আবিষ্কারের পর আরও নতুন সমস্যার জন্ম দিল। কারণ, এই দুটি পরমাণুকে এত ক্ষুদ্র একটি স্থানে কোন্ শক্তিটি একে অন্যকে ধরে রেখেছে? বিজ্ঞানীরা স্বভাবের মৌলিক ফোর্স সম্পর্কে যা জানতেন তা থেকে এই ফোর্সটি ছিলো ভিন্ন। কোন নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনকে টেনে বের করে আনতে যে ইলেকট্রিক ফোর্সের প্রয়োজন তা থেকেও এই অজানা শক্তি ছিলো অনেকগুণ বড়। অপরদিকে একটি নিউক্লিয়াস থেকে অপরটির মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান আছে তা ছিলো অনেক দুর্বল। সুতরাং এই বিরাট শক্তিশালী ফোর্সটি কি হতে পারে? ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বিজ্ঞানীরা এই নিউক্লিয়াস ফোর্স নিয়ে তাই ব্যাপক গবেষণা শুরু করলেন। এই নেচারেল শক্তি কি এবং এটাকে কাজে লাগানোর উপায় কি? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালালেন। আর এ থেকেই আবিষ্কার হলো আনবিক বোমা। এছাড়া এই গবেষণা থেকে বিজ্ঞানের আরেকটি নতুন শাখাও গজে উঠলো যাকে বলে, পার্টিকেল বা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

নিউক্লিয়ার ফোর্স এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

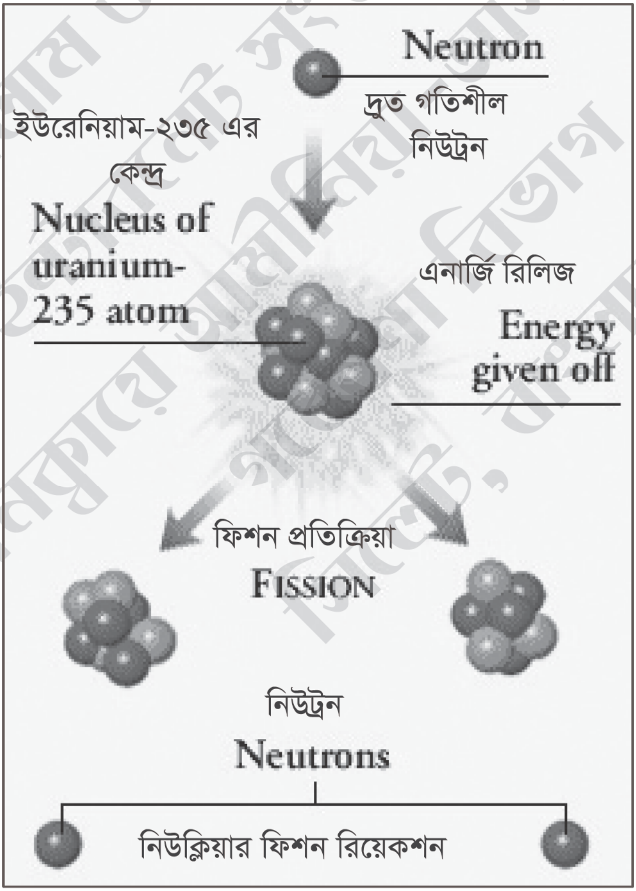
পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেল যে, নিউক্লিয়াসের মধ্যকার ফোর্স হচ্ছে একটি বাইণ্ডিং (একত্রিত হওয়ার) ফোর্স বা এনার্জি। বাংলায় বলা যায় একত্রে জড়িত রাখার শক্তি। এছাড়া দেখা গেল নিউক্লিয়াসের ওজন যা হওয়ার তার চেয়ে সর্বদাই কিছুটা কম। এই কম হওয়ার কারণই হচ্ছে উপরোক্ত বাইণ্ডিং এনার্জি। সুতরাং এই বাইণ্ডিং এনার্জি মেপে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোন ক্রিয়া সংঘটিত হবে কি না কিংবা সংঘটিত করতে অতিরিক্ত এনার্জির প্রয়োজন কি-না তা জানার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন হলো।

এই রিয়েকশন সৃষ্টিকে বলে ফিউশন। এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসকে একত্রিকরণ। তবে সাধারণতঃ এটা সম্ভব নয় কারণ নিউক্লিয়াস এটকা আরেকটা থেকে দূরত্ব বজায় রাখে একটি ফোর্সের মাধ্যমে। যেভাবে দুটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু কিংবা উত্তর মেরু একত্রিত হয় না। এই ফিউশন তখনই সম্ভব যখন নিউক্লিয়াসগুলো খুব দ্রুত অস্থির হয়ে চলতে থাকে। এই উচ্চতর অস্থিরতা বা ফিউশন শক্তিই হচ্ছে তারার এনার্জি সূত্র।

আমাদের সূর্যের ভেতরে এই ফিউশন রিকেশন অনবরত চলছে। এই রিকেয়শনের মাধ্যমে পদার্থ (মূলতঃ হাউড্রোজেন) বদলে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন সূর্যের ভেতরের ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রিয়েকশন থেকে হিট এনার্জি (তাপশক্তি), আলো প্রভৃতি সূর্য থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ফিউশন হচ্ছে এক ধরণের আনবিক রিয়েকশন। এই রিয়েকশনের জন্য যে কণ্ডিশন প্রয়োজন তা এই পৃথিবীতে নেই। তবে অপর আরেকটি নিউক্লিয়ার রিয়েকশন আছে। এর নাম হলো ফিশন।

ফিশন রিয়েকশন

ভারী নিউক্লিয়াস (এটমের কেন্দ্র) কোন কোন সময় ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক নিউক্লিয়াসে পরিণত হতে পারে। তবে এই প্রসেসের সময় এটম থেকে এনার্জি (উদ্যম) বিকিরণ হয়। সাধারণতঃ যেসব নিউক্লিয়াসে ২১০ বা ততোধিক ভিন্ন পরমাণু আছে সেগুলো অত্যন্ত অস্থির থাকে। এর কারণ হলো, এসব ভারী নিউক্লিয়াস থেকে তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ হয়। ১৯৩৮ সালে ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ থেকে এরূপ তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ আবিষ্কার করেন ওটো হান নামক এক বিজ্ঞানী। যে উপায়ে নিউক্লিয়াস এভাবে ভেঙ্গে পড়ে তার নাম হচ্ছে "নিউক্লিয়ার ফিশন"।



ফিশন রিয়েকশের মাধ্যমে নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে নতুন দু'টি নিউক্লিয়াস ও কয়েকটি নিউট্রন (পরমাণু) সৃষ্টি হয়। ফিশন রিয়েকশন দু'টি উপায়ে সম্ভবঃ ১. প্রাকৃতিক উপায়ে ও ২. কৃত্রিমভাবে। ফিশন রিয়েকশনের মাধ্যমে কোটি কোটি ভল্ট (ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি) উদ্যম বিকিরণ হয়। বিশেষকরে ইউরেনিয়াম থেকে মোটা অংকের এনার্জি বেরিয়ে আসে। এছাড়া যেহেতু এই ফিশনের মাধ্যমে কিছু নিউট্রন বেরিয়ে পড়ে তাই এগুলো অন্যান্য নিউক্লিয়াসে পতিত হয়ে আরও রিয়েকশন ঘটাতে পারে। এভাবে একটি চেইন রিয়েকশন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই চেইন রিয়েকশনই আনবিক চুল্লি ও আনবিক বোমার (এটম বোমার) ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

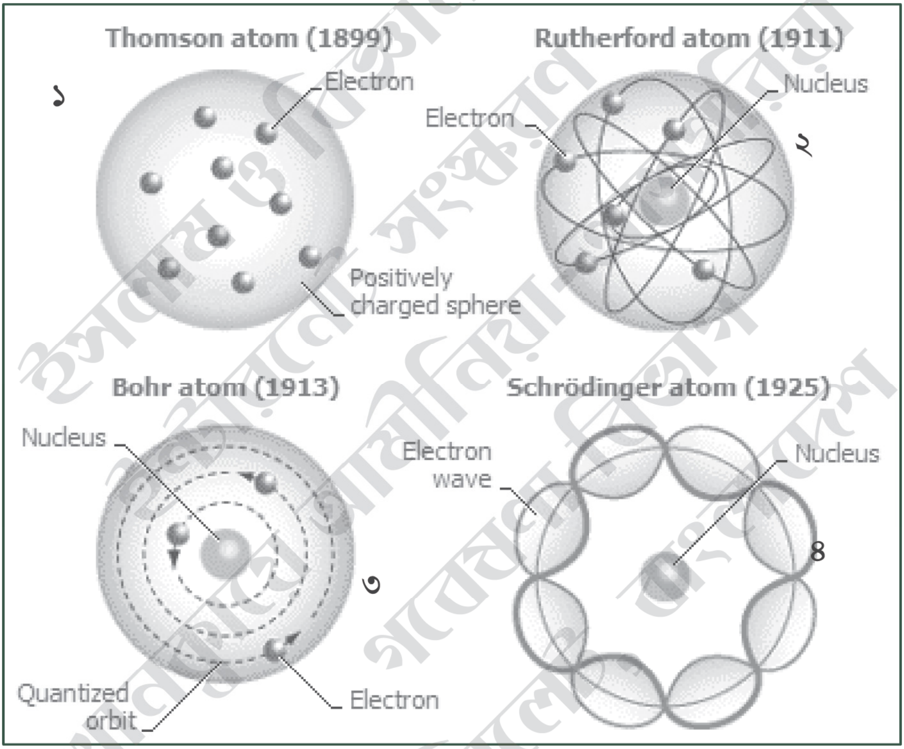
সংক্ষেপে অণু

এবার সংক্ষেপে অণুর একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আমরা এখন তুলে ধরতে পারি।
অণু হচ্ছে স্বভাবের ক্ষুদ্র একেকটি সৌরজগত। এর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস নামক একটি বিরাট শক্তিশালী অংশ। নিউক্লিয়াসও কিন্তু একক কোন পরমাণু নয়। একেকটি নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ও পজিট্রন নামক পরমাণু থাকে।

নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দিয়ে একাধিক নিউক্লিয়াস তৈরী সম্ভব যাকে বলে নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়েকশন। ফিশনের সময় নিউক্লিয়াস বিরাট অংকের এনার্জি বিরিকণ করে। এই রিয়েকশনই আনবিক চুল্লি ও আনবিক বোমায় ব্যবহৃত হয়।

নিউক্লিয়াসকে এক বা ততোধিক কিছু পরমাণু অনবরত প্রদক্ষিণ করে- এগুলোর নাম হচ্ছে ইলেকট্রন। অণুর একাধিক নিউক্লিয়াসকে জোর করে একত্রে আনাও সম্ভব। আর যে রিয়েকশনের মাধ্যমে তা হয়ে থাকে তার নাম হলো, ফিউশন রিয়েকশন। আমাদের সূর্যসহ বিভিন্ন তারার ভেতরে এই রিয়েকশনই সংঘটিত হচ্ছে। এই রিয়েকশনের মাধ্যমে পদার্থ একটা থেকে অপরটিতে পরিণত হয়। যেমন হাইড্রোজ বদলে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া।

তাহলে দেখা গেল অণু দ্বারাই সব বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। অনুর নিউক্লিয়াসে কি আছে বা কটি নিউট্রন, প্রটোন, প্রভৃতি বিদ্যমান তা থেকেই বস্তুটি কোন্ পদার্থ তা নির্ণিত হয়। অণু সম্পর্কে এই সাধারণ জ্ঞানার্জনের পর একাধিক অণু থেকে পাদার্থ ও একাধিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন বস্তু কিভাবে গঠিত হলো, এবার সেদিকে লক্ষ করে দেখা যাক।



বিভিন্ন এটমিক মডেলঃ ১. থমসন এটম; ২. রাদারফোর্ড এটম; ৩. বহ্‌র এটম; ৪. স্রোডিঙ্গার এটম।

"তিনিই সৃজন করেছেন আকাশ ও ভূমণ্ডল সূচারুরূপে... [সূরা আনআম ঃ ৭৩]।

পরিচ্ছেদ ২

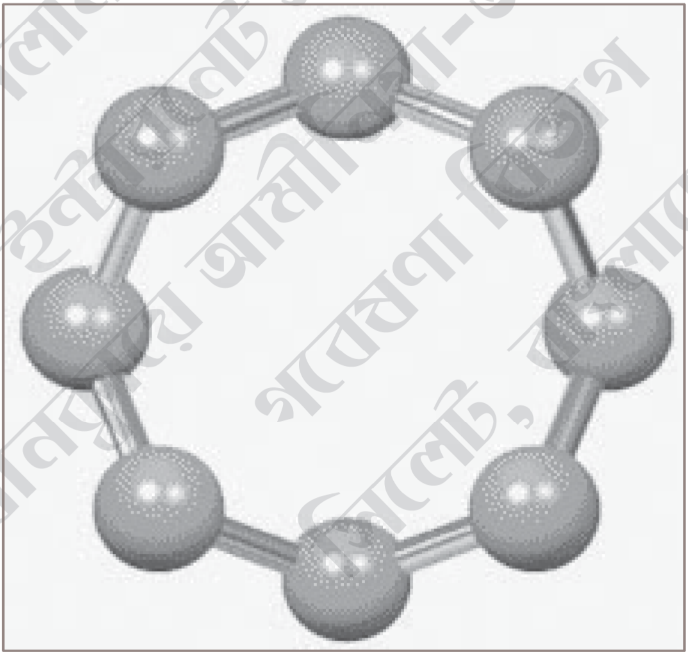
অণু থেকে বস্তু

একই নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন সম্বলিত একাধিক এটম মিলে প্রথমে তৈরী হয় কেমিক্যাল বন্ড বা রসায়নিক সংযুক্তি। এই বন্ডের মাধ্যমে একাধিক এটম যুক্ত হয়। আর যুক্ত বন্ডের নাম হচ্ছে মলিকিউল। সুতরাং মলিকিউল একাধিক অণুর মাধ্যমে সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র বস্তু। এই বন্ড থাকায়ই বস্তু স্থির থাকে। বস্তুর মধ্যে তাই কোটি কোটি মলিকিউল বিদ্যমান।

মলিকিউল কিভাবে গড়ে উঠে

মলিকিউল কিভাবে তৈরী হয় তা বুঝার জন্য অতি সাধারণ একটি গ্যাস হাউড্রোজেন নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট। এই গ্যাসের মধ্যে দুটি এটম কেমিক্যাল বন্ডের মাধ্যমে জড়িত হয়ে একটি মলিকিউল তৈরী হয়। আমরা জানি হাইড্রোজেনের এটমে আছে একটি ইলেকট্রন (নেগিটিভ চার্জসম্পন্ন), নিউক্লিয়াসে আছে একটি নিউট্রন (চার্জ নাই) ও একটি প্রটোন (চার্জ পজিটিভ)। যখন ঘুর্নমান দুটি হাইড্রোজেন এটমের ইলেকট্রন একটা আরেকটির কাছাকাছি আসে তখন একাধিক শক্তি বা ফোর্স সক্রিয় হয়ে উঠে। আর এর ফলেই দুটি এটমের মধ্যে বন্ড সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন আরেকটিকে আকর্ষণ করে যা থেকে নিউক্লিয়াসগুলোও একে অন্যের প্রতি আকর্ষিত হয়। সুতরাং দুটি এটম মিলে একটি মলিকিউল সৃষ্টি হলো। তবে মলিকিউলার বন্ডের মাধ্যমে একটি নিউক্লিয়াস আরেকটির উপরে যেয়ে পতিত হয় না। তাদের নেগিটিভ ফোর্স একটা আরেকটাকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে দেয়। অর্থাৎ মলিকিউলে একটি ব্যালান্স তৈরী হয়।

সুতরাং মলিকিউল হচ্ছে ইলেকট্রন মেঘ [ইলেকট্রন এতো দ্রুত প্রদক্ষিণ করে যে এটাকে ক্লাউড দ্বারা সম্বোধন করা হয়ে থাকে] দ্বারা সৃষ্ট একাধিক এটমের তৈরী একেকটি বন্ড। কোন কোন মলিকিউলে শত শত পর্যন্ত এটম থাকতে পারে। আর এই মলিকিউলে কোন্ ধরণের এটম, বন্ডের স্বরূপ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন বস্তু নিজেদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে কার্বন মলিকিউল। কার্বন মলিকিউলের এটমগুলো কিভাবে সৃষ্ট এর উপর ভিত্তি করেই বস্তুটি হয় সাধারণ লেড না হয় ডায়মণ্ড বা হীরা। অর্থাৎ লেডের দুর্বলতার কারণ মলিকিউলের গঠনপ্রণালী, আর ডায়মণ্ডের সবলতা ও কাঁচের মতো রং মলিকিউলের অন্য ধরণের গঠনপ্রণালী। কিন্তু দুটিই মৌলিকভাবে কার্বন এটম দ্বারা তৈরী। সুতরাং মলিকিউল কোন্ উপায়ে সৃষ্ট সেটা থেকেই পদার্থ ও একাধিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুর আলাদা বৈশিষ্ট্য বিরাজ করছে।



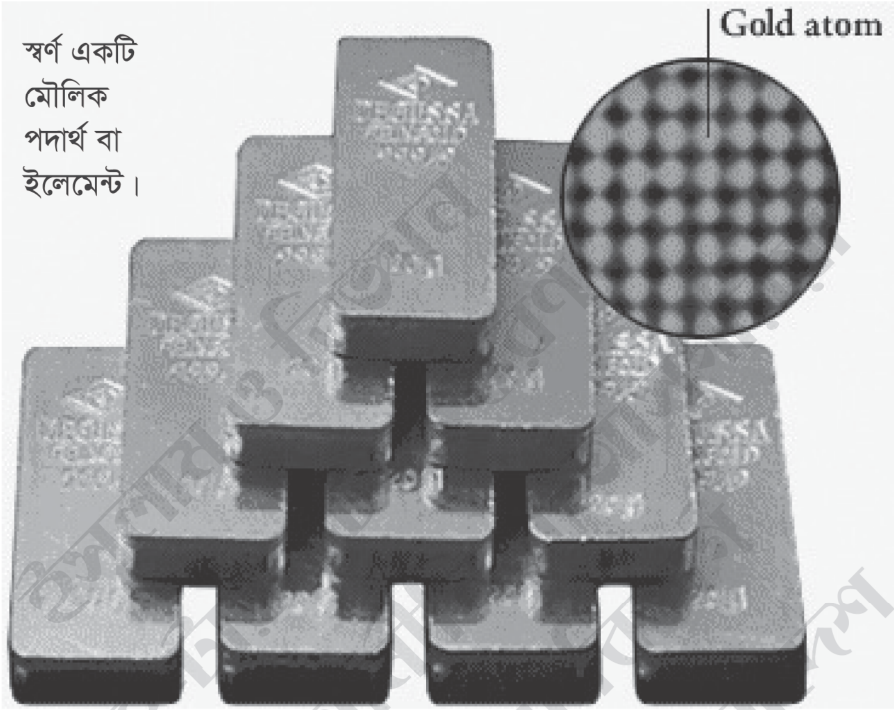
মলিকিউলঃ একাধিক এটমের মধ্যে শক্তিশালী ‘বন্ড’ (যুক্ততা) তৈরী করে সৃষ্টি হয় একেকটি মলিকিউল।

ইলেমেন্ট (মৌলিক পদার্থ) ও কম্পাউন্ড (যুক্ত পদার্থ)

বস্তু সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত যা জেনেছি তার সারমর্ম হলো: স্বভাবের ক্ষুদ্র একটি অংশ হচ্ছে অণু। অণুর মধ্যে আছে একটি কেন্দ্র আর সেখানে বিদ্যমান দুটি পরমাণু- নিউট্রন ও প্রটোন। এই কেন্দ্রকে এক বা একাধিক একটি পরমাণু যার নাম হলো ইলেকট্রন, সর্বদা প্রদক্ষিণ করে। একাধিক এটম মিলে একেকটি মলিকিউল তৈরী হয়। আর মলিকিউল থেকেই তৈরী হয় বস্তু। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য এটমের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এটমের মধ্যে ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রটোন প্রভৃতি কটি করে আছে সেটাই বিভিন্ন পদার্থের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। এবার আমরা বস্তু সম্পর্কে আরও কিছু মৌলিক বিষয় শিখে নেব। এর মাধ্যমে বস্তু যে আসলে কি তা জানা যাবে।

ইলেমেন্ট

ইলেমেন্ট হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট মৌলিক পদার্থ। ইলেমেন্টের অণু-পরমাণুকে রসয়ানিক উপায়ে কিংবা শক্তির মাধ্যমে রদবদল করা যায় না। একমাত্র নিউক্লিয়ার রিয়েকশনের মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে। ইলেমেন্টের এটমগুলো সবই একই ধরণের- অর্থাৎ এতে কোন ভিন্নতা নেই। এটমগুলো কেমিক্যাল বন্ডের মাধ্যমে মলিকিউল হিসেবে থেকে সমগ্র পদার্থটি তৈরী করেছে। ইলেমেন্ট একটা আরেকটা থেকে আলাদা হয় তার এটমে কটি প্রটোন আছে তার উপর ভিত্তি করে। এই সংখ্যাকেই বলে এটমিক নাম্বার। যেমন হাউড্রোজ এটমে আছে একটি ইলেকট্রন, নিউক্লিয়াসে একটি প্রটোন ও একটি নিউট্রন। জানা থাকা দরকার এটমের মধ্যে যে সংখ্যক প্রটোন থাকে তার সমপরিমাণ ইলেকট্রনও থাকে। নীচের পিরিওডিক টেবিল-টি দেখলেই বিভিন্ন ইলেমেন্টের স্বরূপ কি তা সহজে বুঝা যাবে।



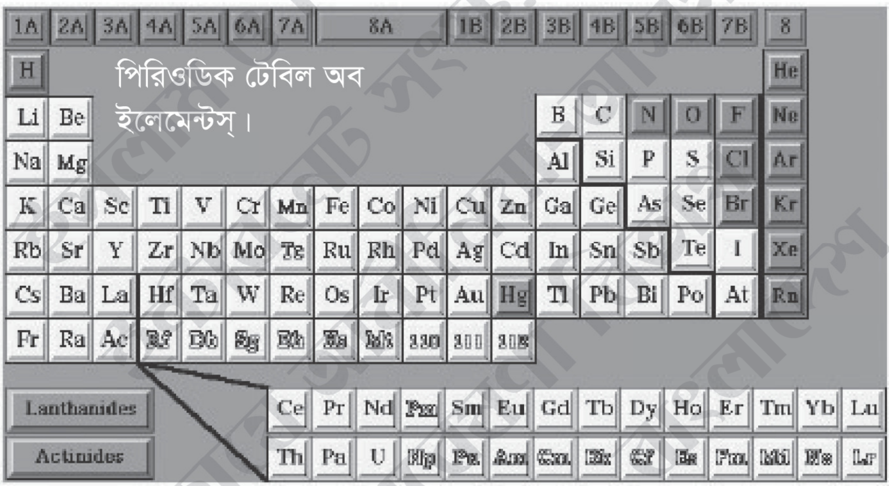
স্বর্ণ একটি মৌলিক পদার্থ বা ইলেমেন্ট।

ইলেমেন্টের পিরিওডিক টেবিল

ইলেমেন্টের প্রখ্যাত 'পিরিওডিক টেবিল অব ইলেমেন্ট' রুশ বিজ্ঞানী ডিমিট্রি মেন্ডেলিয়েভ ১৮৬৯ সালে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনি ইলেমেন্টের একটা আরেকটার মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ইলেমেন্ট পরিবার বিশেষ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেন। পিরিওডিক টেবিলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটার দিকে ভালো করে তাকালে অতি সহজেই স্বভাবের জানা সকল ইলেমেন্টের বিভিন্ন দিক বুঝা যায়। মেন্ডেলিয়েভ এটমিক ওজন (এটমিক নাম্বার) দিয়ে তাঁর এই টেবিল তৈরী করেন। টেবিলের প্রতিটি ইলেমেন্টকে তাদের সাংকেতিক নাম দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে। পাশের নাম্বারগুলোই তাদের এটমিক ওজন বা নাম্বার।

পিরিওডিক টেবিলের গ্রুপ

উপর থেকে নীচে টেবিলের প্রতিটি ইলেমেন্ট হচ্ছে একই গ্রুপের বা পরিবারভুক্ত। অপরদিকে পাশাপাশি ইলেমেন্টগুলো এটমিক নাম্বারের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ ১ থেকে ২, ৩, ৪ প্রভৃতি একটার পর আরেকটা ইলেমেন্টকে পাশাপাশি স্থাপিত করে এটমিক নাম্বারের সঙ্গে ইলেমেন্টের ভিন্নতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।



টেবিলে মোট ১৬টি গ্রুপ আছে। এগুলোকে আবার সাতটি প্রধান গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো, ১. আলকালি মেটাল (১এ), ২. আলকালিন আর্থ মেটাল (২এ), ৩. ট্রানজিশন মেটাল (১বি, ২বি, ৩এ... ...৮এ), ৪. রেপ্রেজেন্টেটিভ গ্রুপ (৩বি...৬বি), ৬. হ্যালোজেন (৭বি) এবং ৭. নবোল গ্যাস (গ্রুপ ৮)।

টেবিলের উপরে সব গ্রুপের নাম আছে। এই নামের নীচের সবগুলো ইলেমেন্টই এই একই গ্রুপের। যেমন ১এ গ্রুপের মধ্যে আছে, হাউড্রোজেন (এইচ), লিথিয়াম (এলআই), সডিয়াম (এনএ), পটাসিয়াম (কে), রুবিডিয়াম (আরবি), সিজিয়াম (সিএস) এবং ফ্রান্সিয়াম (এফআর)। এসব ইলেমেন্ট হচ্ছে আলকালি মেটাল গ্রুপের।

এ পর্যন্ত ১১২টি ইলেমেন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে ১১০, ১১১ এবং ১১২ নাম্বারের নাম কিংবা সংকেত এখনও দেয়া হয়নি। পিরিওডিক টেবিলে প্রতিটি ইলেমেন্টের মৌলিক তথ্যও দেয়া আছে। যেমন হাইড্রোজেনের তথ্যাবলি হচ্ছেঃ ১. সংকেতঃ এইচ, ২. গ্রুপঃ ১এ, ৩. এটমিক ওয়েট (ওজন): ১.০০০৭৯৪, ৪. এটমিক নাম্বারঃ ১, ৫. ডেনসিটি (ঘনত্ব): ০.০৮৯৯, ৬. আবিষ্কারঃ হেনরি কেভেন্ডিশ (ইংরেজ), বছরঃ ১৭৬৬ সাল, ৭. গলনাঙ্ক (মেল্টিং পয়েন্ট- যে তাপ পেলে এই ইলেমেন্ট গলে তরল পদার্থে পরিণত হয়): -২৫৯.৩৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, ৮. স্ফূটনাঙ্ক (যে তাপে বাস্পিভূত হয়): -২৫২.৮৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ৯. অক্সিডেশন অবস্থা (যে অবস্থায় ইলেমেন্ট অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়েকশন করে মরিচাযুক্ত হয়): ১।

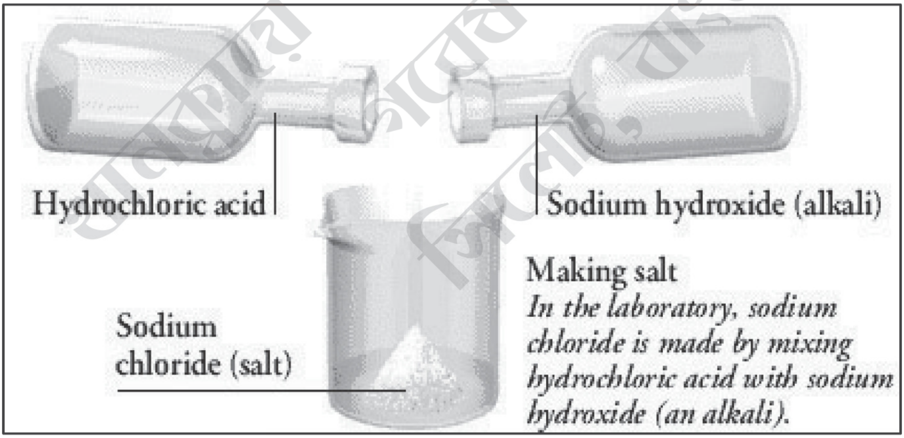
এই নয়টি তথ্য অপর একটি মূল্যবান ইলেমেন্টের ক্ষেত্রে কি তা দেখলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ইলেমন্টটি হচ্ছে স্বর্ণঃ ১. সংকেতঃ এইউ, ২. গ্রুপঃ ১বি, ৩. এটমিক ওয়েট (ওজন): ১৯৬.৯৬৬৫, ৪. এটমিক নাম্বারঃ ৭৯, ৫. ডেনসিটি (ঘনত্ব): ১৯.৩ (পানি থেকে এতগুণ বেশী ঘন), ৬. আবিষ্কারঃ প্রাচীন যুগ, বছরঃ প্রাচীনকাল থেকেই এই ইলেমেন্ট সম্পর্কে মানুষ জানতো, ৭. গলনাঙ্ক (মেল্টিং পয়েন্ট- যে তাপ পেলে এই ইলেমেন্ট গলে তরল পদার্থে পরিণত হয়): ১০৬৪.৪৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, ৮. স্ফূটনাঙ্ক (যে তাপে বাস্পিভূত হয়): ২৮৫৬.৮৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ৯. অক্সিডেশন অবস্থা (যে অবস্থায় ইলেমেন্ট অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়েকশন করে মরিচাযুক্ত হয়): ৩, ১।

এখানে স্বর্ণ সম্পর্কে যে কটি মূল্যবান তথ্য আমরা পেলাম তাহলো, স্বর্ণের ঘনত্ব বেশী থাকায় এটা অত্যন্ত ভারী, এর এটমে মোট ৭৯টি প্রটোন ও ইলেকট্রন আছে, এর স্ফূটনাঙ্ক অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রাসম্পন্ন। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে পিরিওডিক টেবিল একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর মাধ্যমে স্বভাবের জানা সকল ইলেমেন্ট সম্পর্কে

অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায়। এছাড়া যেহেতু সব কম্পাউন্ড বা বস্তু একাধিক ইলেমেন্টের মিশ্রণে তৈরী তাই ওগুলো সম্পর্কে তথ্যাবলীও এই পিরিওডিক টেবিল থেকে জানা সম্ভব। এককথায় বস্তু জগতকে জানার একটি সুন্দর ও সহজ উপায় হচ্ছে এই পিরিওডিক টেবিল।

কম্পাউন্ড বা যুক্ত পদার্থ

জগতের মধ্যে **১১২**টি জানা ইলেমেন্ট থাকলেও এগুলো অমিশ্রিত অবস্থায় অল্পই আছে। বস্তুজগতরের বেশীরভাগ জিনিষ হচ্ছে একাধিক ইলেমেন্ট দ্বারা গঠিত। আর এই অবস্থায় যেসব বস্তু আছে এগুলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় কম্পাউ বা যুক্ত পদার্থ বলে। যেমন সাধারণ লবণ। লবণের মধ্যে সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামক দুটি ইলেমেন্ট বিদ্যমান। এর কেমিক্যাল নাম হচ্ছে সোডিয়াম-ক্লোরাইড। উল্লেখ্য ক্লোরিন বাস্তবে একটি বিষাক্ত বস্তু। অথচ সোডিয়ামের সঙ্গে তা মিশ্রিত হয়ে খাবার যোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অপর আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পানি। পানির কেমিক্যাল ফর্মুলা হলোঃ এইচ২অ (H_2O), অর্থাৎ হাউড্রোজেন (দুটি এটম) ও অক্সিজেন (একটি এটম) মিলে পানি হয়েছে। এভাবে জগতের অসংখ্য বস্তু আছে যা মূলত একাধিক ইলেমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত।



Making salt
In the laboratory, sodium chloride is made by mixing hydrochloric acid with sodium hydroxide (an alkali).

সাধারণ লবণঃ লবণের কেমিক্যাল নাম সোডিয়াম ক্লোরিন (NaCl)। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশিয়ে লবণ তৈরী করা যায়। এটি একটি যুক্ত পদার্থ।

স্বভাবে বস্তুর ৪টি অবস্থা

প্রাকৃতিকভাবে সব বস্তু চারটি অবস্থায় বিদ্যমান রেয়েছে। এগুলো হলোঃ ১. তরল, ২. কঠিন, ৩. গ্যাস ও ৪. প্লাজমা।

তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করেই বস্তুর অবস্থা নির্ণিত হয়। যেমন পানি সাধারণত তরল বস্তু হিসেবে অস্তিত্বশীল। কিন্তু এর ভেতরের তাপমাত্রা কমিয়ে ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে আনলে তা হয়ে যায় বরফ। এই বরফ তখন একটি কঠিন পদার্থ। অন্যদিকে তাপমাত্রা ১০০ ডি.সে. হলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। তখন পানির অবস্থা হলো একটি গ্যাস।

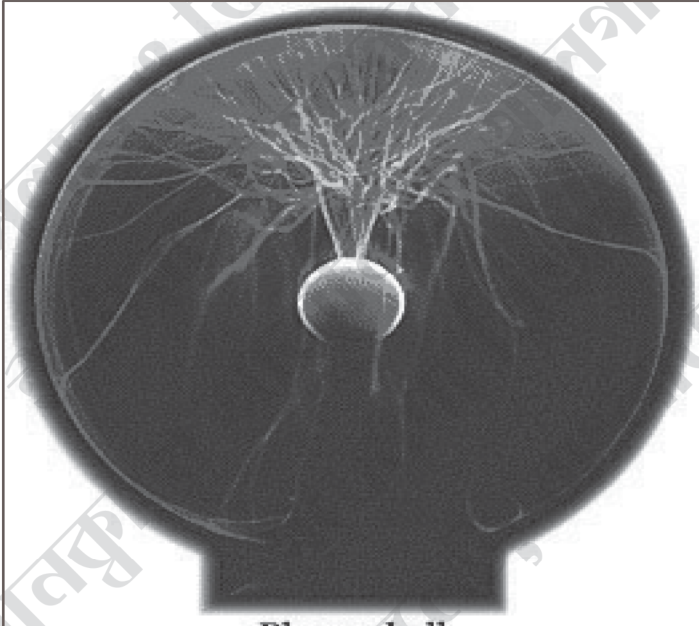
বস্তুর প্লাজমা অবস্থাটি স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর মাটিতে বিদ্যমান নেই। কারণ এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য যে তাপমাত্রার প্রয়োজন তা পৃথিবীর মাটিতে সাধারণতঃ হয় না। কৃত্রিম উপায়ে প্লাজমা গ্যাস তৈরী সম্ভব। প্লাজমা অবস্থা সূর্যের মধ্যে বিদ্যমান। কারণ, সূর্যের ভেতরের তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডি.সে.। এই উচ্চ তাপে বস্তু প্লাজমা অবস্থায় বিরাজ করে।

বস্তুর সারসংক্ষেপ

বস্তু সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হলোঃ ১. বস্তুজগত অণু-পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। প্রাকৃতিকভাবে অস্তিত্বশীল ১১২টি মৌলিক পদার্থের কথা এ পর্যন্ত জানা গেছে। একই ধরণের এটম দ্বারা সৃষ্ট মৌলিক বস্তুকে বলে ইলেমেন্ট। বস্তুর মধ্যে এটমগুলো একে অন্যকে একটি শক্তি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে একেকটি ইউনিট হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই ইউনিটের নাম হলো মলিকিউল। একাধিক ইলেমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুকে বলে কম্পাউন্ড। সুতরাং জগতব্যাপী দুধরনের বস্তু

বিদ্যমান- এর একটি ইলেমেন্ট আর অপরটি কম্পাউন্ড। ইলেমেন্টকে কোন কেমিক্যাল কিংবা সাধারণ শক্তির মাধ্যমে আলাদা করা বা বদলানো যায় না- একমাত্র আনবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রদবদল সম্ভব। তবে কম্পাউন্ডকে রসায়নিক উপায়ে কিংবা মিশ্রণের মাধ্যমে বদলানো সম্ভব।

বস্তু স্বাভাবিকভাবে চারটি অবস্থার যে কোন একটির উপর বজায় থেকে অস্তিত্বশীল আছে। এই চার অবস্থার কোনটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান তা তার তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।



Plasma ball
A powerful electric current at the center of this ball of gas creates plasma.

প্লাজমা অবস্থাঃ স্বভাবে বস্তুর চতুর্থতম অবস্থা প্লাজমা। পৃথিবীর বুকে স্বাভাবিকভাবে প্লাজমা অবস্থায় বস্তু নেই। তবে মহাবিশ্বের অধিকাংশ বস্তু তথা হাইড্রেজেন গ্যাস প্লাজমা অবস্থায় বিরাজ করছে। প্রতিটি তারার মৌলিক উপাদান হলো প্লাজমা অবস্থায় থাকা হাইড্রেজেন গ্যাস। এই গ্যাসটি হলো তারার আনবিক জ্বালানি।

"আলিফ-লাম-রা; এগুলো বিজ্ঞানপূর্ণ কিতাবের আয়াত" [সূরা ইউনুস ঃ ১-২]।

পরিচ্ছেদ ৩

বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত মহাবিশ্ব

গেল পরিচ্ছেদে আমরা বস্তুর মৌলিক গঠনপ্রণালী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবার এই বস্তু দ্বারা যেভাবে এ মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে তার স্বরূপ কি তা জানবো।

বাস্তবে সমগ্র মহাবিশ্বের ফিজিক্স বা গঠনপ্রণালী কয়েকটি মৌলিক ফোর্সের উপর নির্ভরশীল। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা চারটি এরূপ নেচারেল ফোর্স আবিষ্কার করেছেন। এই চারটি ফোর্সকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফান্ডামেন্ট্যাল ফোর্সেস অব নেচার বা স্বভাবের মৌলিক শক্তিবলী। আমরা একে একে এসব ফোর্সের উপর অল্প-বিস্তর আলেচনা করবো।

প্রাকৃতিক চারটি ফোর্স

যে চারটি ফোর্স এই মহাবিশ্বকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করছে তাহলোঃ ১. মহাকর্ষ (গ্র্যাভিটি), ২. দুর্বল আনবিক শক্তি (উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স), ৩. সবল আনবিক শক্তি (ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স) এবং ৪. বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি (ইলেকট্রমেগন্যাটিক ফোর্স)। এ চার শক্তিই সমগ্র বিশ্বের গঠনপ্রণালী এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী। এবার একে একে এই ফোর্সগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ

বস্তুর মধ্যে এই শক্তিটি সর্বত্র বিদ্যমান। আপনার আমার দেহের ভেতর, পৃথিবীর উপর বিচরণের কারণ, সৌরজতে পৃথিবীর অবস্থান ও গতিশীলতা থেকে শুরু করে একটি তারাজগত থেকে অপরটি পর্যন্ত সর্বত্র যে শক্তিটি ক্রিয়াশীল আছে তার নাম হচ্ছে গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ।

অন্যান্য নেচারেল শক্তির তুলনায় মহাকর্ষের কিছু মৌলিক স্বাতন্ত্র্য আছে।

প্রথমতঃ এটি সার্বজনিন ও সর্বত্র ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ জগতের এমন একটি স্থান ও বস্তু নেই যেখানে এই ফোর্সটি ক্রিয়া করছে না। এমনকি লাখ লাখ আলোক বৎসর (**আলোক বৎসর:** এক বছরে আলোক রশ্মি ভ্রমণ করে যে দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে তাকে বলে এক আলোক বৎসর। ইংরেজিতে একে বলে লাইট ইয়ার।) দূরত্বে অবস্থানরত গ্যালাক্সির (তারাজগত) মধ্যেও এই ফোর্স বিদ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ গ্র্যাভিটি সর্বদাই পজিটিভ ফোর্স- অর্থাৎ এটি বস্তুর মধ্যে সর্বদাই আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এতে কোন বিপরীত আকর্ষণ বা নেগিটিভ ক্রিয়া নেই। অর্থাৎ গ্র্যাভিটি কোন সময়ই কোন বস্তুকে দূরে সরে দেয় না, বরং সব সময় আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয়।

তৃতীয়তঃ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মহাকর্ষ ক্রিয়াশীল আছে। একটি বস্তু থেকে অপরটির দূরত্ব যেটাই হোক- এর মধ্যে একটি মাধ্যাকার্ষণ শক্তি অতি অল্প হলেও সর্বদাই বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থতঃ মহাকর্ষ চারটি মৌলিক ফোর্সের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল শক্তি। অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে এই ফোর্স এত কম যে তা মাপাই কঠিন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বভাবের অপর একটি ফোর্স ইলেকট্রমেগন্যাটিক এর কথা বলা যায় (এই ফোর্সের কথা একটু পরই বর্ণিত হয়েছে)। অণুর নিউক্লিয়াসের প্রটোন ও ইলেকট্রনের মধ্যে এই ফোর্সের ক্রিয়া একই

দূরত্বে স্থাপিত বস্তুর মধ্যকার মহাকর্ষের তুলনায় ১০ এর সঙ্গে ৪০টি শূন্য মিলিয়ে যে বিরাট সংখ্যা হয় সে পরিমাণ বেশী। কিন্তু এত দুর্বল হলেও এই শক্তিটি যেহেতু সর্বত্র বিদ্যমান তাই এটা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী একটি ফোর্স।

গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ আসলে কি, এ প্রশ্নের জবাব দিতে ঐতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ চেষ্টা করে আসছে। গ্রীক বিজ্ঞানীরা প্রথমে এই ফোর্স নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। এরপর ইসলামিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বহু চেষ্টা হয়েছে। আধুনিক যুগের শুরুতে গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাও মহাকর্ষের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। নিউটনের থিওরী প্রায় ৪০০ বছর পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিলো। বিংশ শতাব্দির শুরুতে আলবার্ট আইনস্টাইন নতুন মহাকর্ষের থিওরী প্রকাশ করেন। বর্তমানে তাঁর এই থিওরীই হচ্ছে মডার্ণ থিওরী।

মহাকর্ষের আধুনিক থিওরী

আইনস্টাইনের থিওরীর মূলে আপেক্ষিকতাবাদ বিদ্যমান। এই মতবাদের মাধ্যমে তিনি দেখিছেছেন যে, মহাকর্ষ মূলত স্পেইস-টাইম কন্টিনিউয়াম (স্থান-কাল ধারাবাহিকতা)-এর একটি অংশ। এর মাধ্যমে তিনি জ্যামিতিক উপায়ে মহাকর্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই থিওরী মতে মহাকর্ষ সকল বস্তু ও এনার্জির উপর ক্রিয়াশীল হয় যা স্থান-কালের উপর গতিশীল। অর্থাৎ বাস্তবে মহাকর্ষ এমন একটি শক্তি যার প্রভাবে বস্তুর চতুর্পার্শ্বের স্থান ও কাল ঘোমরা হয়ে যায়। তবে এর প্রতিক্রিয়া সাধরণভাবে বুঝা যায় না। একটি বড় বস্তু যেমন সূর্যের চতুর্পার্শ্বের উপর এর ক্রিয়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই বক্রকরণ প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইন তাঁর থিওরী দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সূর্যের নিকট দিয়ে ভ্রমণকারী আলোক রশ্মি বক্র হবে। এই ধারণা ১৯১৯ সালে সংঘটিত একটি সূর্যগ্রহণের সময় প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন, যে অবস্থানে একটি দূরের তারা মহাকাশে থাকার কথা তা এই ঘোমরাকরণের ফলে অপর একটি অবস্থানে দেখা গেছে। অর্থাৎ তারা থেকে আগত আলোক রশ্মিটি বাঁকা হয়ে গেছে। আইনস্টাইন আরও বলেছেন, শক্তিশালী

মহাকর্ষের ফিল্ড সময়কেও ধীরগতিসম্পন্ন করে দেয়। এটাও ১৯৬৪ সালে পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। দেখাগেছে, সূর্যের নিকটে যেয়ে একটি সিগন্যাল ধীরগতিসম্পন্ন হয়েছে।

সুতরাং আইনস্টাইনের থিওরী অনুযায়ী মহাকর্ষ হচ্ছে স্থান-কালেরই একটি অঙ্গ। বস্তুর ওজন বা ম্যাস যতো বেশী হবে সে তার চতুর্দিকের স্থান কালের গতিকে ততবেশী বাঁকা (বেন্ড) করে দেবে। এই বাঁকাকরণের ফলেই বস্তুর দিকে ছোট ছোট বস্তু আকর্ষিত হয়। যেমন সূর্য তার মাহকর্ষের ফিল্ডের মধ্যে সবকটি গ্রহ-উপগ্রহকে ধরে রেখেছে। এগুলো বাস্তবে সূর্যের দিকে পতিত হচ্ছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঘুর্ননের ফলে আরেকটি ফোর্স (আঙ্গুলার মমেন্টাম) সৃষ্টি করে নিজেদেরকে রক্ষা করছে। অর্থাৎ মহাকর্ষের আকর্ষণ ও বাইরের দিকের আঙ্গুলার ফোর্সের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি ব্যালান্স। সুতরাং গ্রহগুলোর মধ্যে প্রদক্ষিণ গতি না থাকলে এগুলো কিছুতেই টিকে থাকতে পারতো না, সূর্যের উপর পতিত হয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

মাধ্যাকর্ষণের গুরুত্ব শুধু এই সৌরজগতেই বিদ্যমান নয়- বাস্তবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই শক্তিটি সবকিছুকে ধরে রেখেছে। বস্তুগুলো নিজস্ব গতির মাধ্যমে ব্যালান্স তৈরী করে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আমাদের সৌরজগতসহ কোটি কোটি সৌরজগত ও তারা নিয়ে একটি বিরাট তারকাজগত আছে। এটিকে বলে গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সির অস্তিত্বও মহাকর্ষ ও তারাগুলোর প্রদক্ষিণের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি তারা ও তার সৌরজগত নিয়ে গ্যালাক্সির বিরাট কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। যদি করতো না তবে কেন্দ্রে পতিত হয়ে সমগ্র তারাজগতটিই ধ্বংস হয়ে যেত। আমাদের সূর্যও তার পরিবার-পরিবর্গ (আমাদের পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহগুলো) নিয়ে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে।

এই মহাকর্ষের ও বস্তুর মধ্যে ঘুর্নন গতির কারণে বাস্তবে সমগ্র বিশ্বটাই একটি ব্যালান্সের মধ্যে থেকে অস্তিত্বশীল বজায় রাখছে। এই ব্যালান্স না থাকলে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত।

দুর্বল আনবিক শক্তি (উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স)

বস্তু জগতে এটমিক পর্যায়ে দ্বিতীয় মৌলিক শক্তিটি ক্রিয়াশীল আছে- যাকে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা দুর্বল আনবিক শক্তি বলে। মূলত বস্তুর ক্ষয় হওয়ার জন্য এ শক্তিটি দায়ী। এটমের কেন্দ্রে যে নিউট্রন নামে একটি পর্টিকেল আছে, এটি দুর্বল আনবিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয় হয়ে যায়। এ শক্তি, ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ও বৈদ্যুতিক-আনবিক শক্তির সমন্বয়ে কিছু এনার্জির সৃষ্টি করে। এসব এনার্জিকে রেডিওএ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা বলে।



প্রাকৃতিক চার শক্তি: এ চিত্রে স্বভাবের মৌলিক চার শক্তির ক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে।

সবল আনবিক শক্তি (ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স)

প্রাকৃতিক তৃতীয় মৌলিক শক্তিটি হচ্ছে সবল আনবিক শক্তি বা ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স। এ শক্তিটি প্রতিটি বস্তুতে আনবিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি এটমের কেন্দ্রকে এ শক্তিই বেধে রাখে। কেন্দ্রের মধ্যে যে নিউট্রন ও প্রটোন নামক দুটি কণা আছে, এগুলো এ শক্তি থাকার ফলে একে অন্যকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে রাখে। আনবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে যে বিশাল এনার্জি বা উদ্যম বেরিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধ্বংসলীলা ঘটায়, তা এই প্রভাবশালী আনবিক শক্তির ফলেই হয়। মানুষ এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে আনবিক চুল্লীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করছে। নিউক্লিয়ার এনার্জির মূলে এ মৌলিক শক্তিই ক্রিয়াশীল আছে। এ শক্তির ফলে যেমনি বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষা পাচ্ছে, তেমনি এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের বিরাট উপকারও হচ্ছে।

এ শক্তির ফলেই সূর্য ও তারাগুলো জ্বলন্ত আছে। সূর্যের কেন্দ্রে আনবিক স্কেলে বিস্ফোরণ হচ্ছে। সূর্যের কেন্দ্র একটি জ্যান্ত হাইড্রোজেন বোমা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভীষণ তাপমাত্রার ফলে হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং এ রিয়েকশনের ফলস্বরূপ সূর্য আলো ও তাপসহ অনেক ধরনের এনার্জি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ এনার্জি থেকে পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা উপকৃত হচ্ছে। সূর্যের তাপ ও আলো ছাড়া এ গ্রহে প্রচলিত প্রাকৃতিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে কোন প্রাণী জ্যান্ত থাকতে পারতো না।

বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি (ইলেকট্রমেগন্যাটিক ফোর্স)

এ শক্তিটিও বিশ্বজগতের সর্বত্র ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি বস্তুতে ইলেকট্রিক ও চুম্বকীয় শক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। কেমিষ্ট্রি ও বায়েলোজলিতে যেসব প্রতিক্রিয়া বা রিয়েকশন হয় তা এ শক্তির ফলেই হয়। ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশন যেমন টিভি, রেডিও, এক্স-রে, ইনফ্রারেড, আলট্রাভাইলোট প্রভৃতি সিগন্যালও এ শক্তির ফলে সংঘটিত হয়। আলোও এ শক্তির ফলাফল। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্রিয়ার

মাধ্যমে এনার্জি, বিকিরণ (রেডিয়েশন) ও আলো নির্গত হয়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। যদিও মহাকর্ষ সম্পর্কে মানুষ অনেক আগে থেকেই জানতো, কিন্তু ইলেকট্রোমেগন্যাটিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র শতাধিক বছর আগে।

মহাবিশ্ব

উপরোক্ত চারটি মৌলিক শক্তি বা স্বাবাভিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল আছে। দৃশ্যমান এই জগত যেভাতে আছে ঠিক সেভাবে থাকার কারণও হচ্ছে এই চারটি ফোর্স। মহাকর্ষের একটি বড় গুণ হচ্ছে সব বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করা। এর ফলে জগতের প্রতিটি বড় আয়তনের মাহশূন্যে ভাসমান বস্তুই মূলত গোলক আকারে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রহ, উপগ্রহ থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান অসংখ্য তারা সবই মৌলিকভাবে একেকটি গোলক।

মহাকর্ষ ছোট বড় সব বস্তু-খণ্ডকেও তার প্রভাবে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতিতে ছাটাই করে রেখেছে। অর্থাৎ কিছু বিশেষ উপায়ে ব্যালান্স তৈরী করে করেছে। অণু-পরমাণু যেভাবে একেকটি সৌরজগত তেমনি একেকটি তারকাজগত এবং ক্লাস্টার (এ ব্যাপারে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে) সম্বলিত তারাজগতকেও সৌরজগতের মতো সিস্টেমের মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

স্বভাবের উপরোক্ত চারটি মৌলিক শক্তি না থাকলে এ বস্তুজগত টিকে থাকতে পারতো না। এই চার শক্তিই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমানে এই চার ফোর্স সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অবগত হয়েছেন যেগুলোর বিশেষ গুণাবলী দ্বারা বস্তুজগত পরিচালিত হচ্ছে। আর এই পরিচালনা একটি পদ্ধতি মাত্র- এরূপ না হয়ে অন্যভাবেও হতে পারতো। কিন্তু যেহেতু তা হয় নি তাই আর অতিরিক্ত বলার প্রয়োজন নেই। দ্বীন ও বিজ্ঞান খণ্ডে আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

"আল্লাহর মহিমায় এরূপই রয়েছে কতো নিদর্শন পৃথিবী ও মহাকাশে যার উপর দিয়ে গত হয়ে যাচ্ছে (অবিশ্বাসীরা) অথচ তারা কিছুই পরওয়া করে না"
[সূরা ইউসূফ ঃ ১০৫]।

পরিচ্ছেদ ৪

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব

এ পর্যন্ত আমরা বস্তুজগত সম্পর্কে যাকিছু জানতে পেরেছি তার সারমর্ম হলো- বস্তু মূলত অণুর সমন্বয়ে গঠিত মলিকিউল থেকে সৃষ্ট। মৌলিক চারটি শক্তির মাধ্যমে সবকিছু নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক অস্তিত্বশীল আছে। এবার আষ্ট্রনোমি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে জগতের গঠনপ্রণালী ও ষ্ট্রাকচার সম্পর্কে জানবো। এরপর জগত কিভাবে (বিজ্ঞানের মতে) অস্বিত্বশীল হয়েছে, এর বর্তমান মতিগতি ও ভবিষ্যৎ কি সেসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে। জগত সর্ম্পকে এসব মৌলিক প্রশ্নাবলী নিয়ে যে বিজ্ঞান গবেষণা চালাচ্ছে তার নাম হলো কজমোলজি বা বিশ্বতত্ত্ব।

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা পুরাতন শাখা। এর পেছনে একটা বিশেষ কারণ নিহিত আছে- আর তা হলো, মানুষের স্বভাবতঃ অনুসন্ধিৎসু মন। আপনি যদি একটি মেঘশূন্য রাতে শহরের বাতিগুলো থেকে দূরে কোন গ্রামে থেকে একবার আকাশের দিকে মনোযোগ সহকারে তাকান তাহলে এটা অনিবার্য যে, সমগ্র আকাশজুড়ে লাখ লাখ তারাগুলো আসলে কি, এগুলো কত দূরে, কিভাবে এগুলোর জন্ম হয়েছে প্রভৃতি প্রশ্নাবলী আপনার মনে জাগ্রত হবে। মানুষের এই "জগৎ সম্বন্ধে জানার স্পৃহা" থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞানের এই শাখা সর্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক। আমি অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে এখানে আলোচনা করবো না। বর্তমানে এ বিজ্ঞান মানুষকে কি বলছে এবং শিক্ষা দিচ্ছে এগুলোই হবে এ পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু। পাঠকরা একথা জেনে রাখুন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি বিষয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে জ্যোতিষীরা

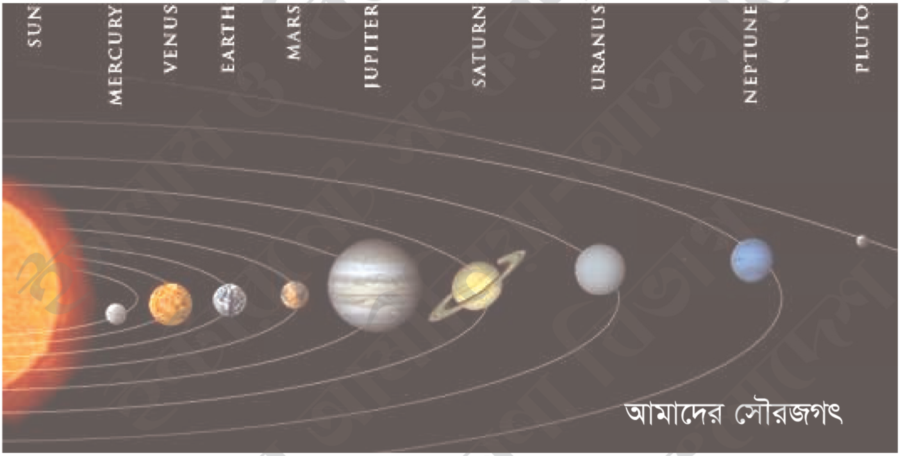
আকাশের তারা ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করে মানুষের ভাগ্য বা রাশিফল বলে থাকেন। আকাশের তারার সাথে মানুষের ভাগ্যের কোন মিল যদি থেকে থাকে তবে তা বিজ্ঞানের আওতাভূক্ত নয়। প্রচীনকালে মানুষ মহাকাশে তারার মধ্যে একটা আরেকটার সাথে সামঞ্জস্য গড়ে তুলতে কাল্পনিক রেখা টেনে জীব-জন্তু প্রভৃতির ছবি এঁকেছে। সৃষ্টি করেছে তথাকথিত কন্সটেলেশন বা রাশিচক্র। অথচ যেসকল তারার সমন্বয়ে এসব রাশিচক্র হয়েছে এগুলোর মধ্যে বাস্তবে কোন মিল নেই। এমনকি একটা থেকে আরেকটার দূরত্বও কোন কোন ক্ষেত্রে হাজার হাজার থেকে লাখো-কোটি আলোক বৎসরের তফাৎ।

আমাদের সৌরজগৎ

মহাবিশ্বের যে অংশে আমাদের নিবাস, তা হলো এই সৌরজগৎ, তবে মহাকাশে আরও অগণিত তারকাপুঞ্জ ও গ্রহ-উপগ্রহ আছে। আমাদের নিকটতম তারা হলো সূর্য। নয়টি গ্রহ (এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত- ভবিষ্যতে আরও একাধিক গ্রহের সন্ধান মিলতে পারে), অনেকগুলো উপগ্রহ, এ্যাস্টারয়েড ও অসংখ্য উল্কার সমন্বয়ে এ সৌরজগৎ গঠিত হয়েছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বস্তু মহাশূন্যে ঘূর্ণমান অবস্থায় আছে। নয়টি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীই প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন একটি গ্রহ। কোন না কোন ধরণের জীবি এ পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর যাবৎ জীবিত থাকলেও, এখানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবী- মানুষ, মাত্র কটি সাল পূর্বে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৭ সালে রাশিয়া স্ফুটনিক নামক একটি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে সর্বপ্রথম প্রেরণ করে। এরপর ১৯৬২ সালে শুরু হয় মানুষসহ পৃথিবীর নিকঠ-মহাশূন্যে ভ্রমণ।

আমাদের সৌরজগৎ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি নামক একটি বিরাট তারকাপুঞ্জের একটি বিশেষ অংশে অবস্থান করছে। এ তারকাপুঞ্জে আনুমানিক একশত কোটি সূর্যের মতো ছোট-বড়ো তারা আছে। গ্যালাক্সির আয়তন প্রায় এক লক্ষ আলোক-বৎসর। অনেকের ধারণা আমাদের সৌরজগতের মত বহুসংখ্যক তারার সাথে এরকম গ্রহ উপগ্রহবিশিষ্ট সৌরজগৎ আছে। ইতোমধ্যে এরূপ দু'একটা সিস্টেমের সন্ধানও পাওয়া গেছে বলে কেউ কেউ দাবী করেছেন। আমাদের সৌরজগতের মধ্যে কয়েক ধরণের

বস্তু আছে। তুষার দ্বারা গঠিত ছোট্ট গ্রহ থেকে বিরাট বয়ূবীয় গ্রহ যার আয়তন পৃথিবীর **১১** গুণ বেশী, এমনও বস্তু এ সৌরজগতে বাস করে। প্রতিটি গ্রহই সূর্যকে একই দিকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহগুলোর কক্ষপথও প্রায় একই সমপৃষ্ঠে বর্তমান। মোটামুটিভাবে এই ভ্রাম্যমাণ সমপৃষ্ঠ সূর্যের আহ্নিক গতির সাথে (ইকুইটরিয়্যাল প্লেইন) সামঞ্জস্য হয়ে আছে। সূর্যের আহ্নিক গতির সমপৃষ্ঠের সাথে গ্রহগুলোর আহ্নিক গতিও প্রায় একই প্লেইনে অবস্থান করছে, তবে ইউরেনাস ও প্লুটোর আহ্নিক গতি কিছুটা ভিন্ন প্লেইনে আছে।



আমাদের সৌরজগৎ

সূর্য

আমাদের সূর্য হলো মধ্যম বয়সী একটি হলুদ নক্ষত্র, যার বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। এটা বাস্তবে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড, যেখানে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন বিস্ফোরণ ঘটছে আনবিক ক্ষেত্রে। এই আনবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে সূর্যের মধ্যবর্তী সর্বাপেক্ষা বেশী পদার্থ- হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে, যার ফলে সূর্য মোটা অংকের উত্তপ্ত উদ্যম (এনার্জি) চতুর্দিকে মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে। এই উদ্যম বা এনার্জি আলো ও তাপ আকারে বিকিরণ হয়। আমরা পৃথিবীতে বসে এই এনার্জিই উপভোগ করি। সূর্যের এই এনার্জি ক্ষয়ের কারণে তা একদা নিস্প্রভ হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভাবনার কোন কারণ নেই, সূর্যের মধ্যে এতো বেশী হাইড্রোজেন আছে যে, তা জ্বলে শেষ হতে অন্তু আরও ৫০০ কোটি বছর সময় লাগবে।

সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল হলো সূর্য। যাবতীয় বস্তুই তাকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের মধ্যে জড়ের পরিমাণ (বস্তুর ওজন) হলো ১৯৯২৮ কেজি। অর্থাৎ- ১৯৯ পরে ২৮টি শূন্য লিখলে যে সংখ্যা হয়- তাই। বলাই বাহুল্য সমগ্র সৌরজগতের মোট জড় পদার্থের শতকরা ৯৯ অংশই সূর্যের মধ্যে নিহিত। এ কারণেই সবকিছু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। সূর্যের আয়তন হলো ১৩,৯২,০০০ কিলোমিটার। আমরা যদি ১০৯টা পৃথিবী কাতার করে সূর্যের নিকটে খাড়া করি তবেই সূর্যের আয়তনের সমান হবে। গ্রহগুলোর তুলনায় সূর্যের আয়তন ও জড় এতো বেশী হওয়ায় তার মাধ্যাকার্ষণ ফিল্ডে সবাই আটকে আছে। এ মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী যে প্রায় ৫৯১ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নবম গ্রহ প্লুটোও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তার বহির্ভাগের তাপমাত্রা সাড়ে পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সূর্যের উপর থেকে মুক্ত হতে হলে ৬১৭.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড- এরূপ উচ্চ গতির প্রয়োজন হবে। এ গতিকে 'এস্কেপ ভেলোসিটি' বা মুক্তগতি বলা হয়। মুক্তগতি বস্তুর মধ্যবর্তী জড়ের উপর নির্ভরশীল। জড় পদার্থ যতো বেশী হবে মুক্তগতির মাত্রাও ততো বেশী হবে।

কাল্পনিক স্পেইসশীপে মহাবিশ্ব ভ্রমণে

পাঠকরা এবার সূর্য সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা করতে পারছেন নিশ্চয়ই। এবার আসুন আমরা একটা কাল্পনিক মহাশূন্য যান বা স্পেইসশীপে চড়ে সমগ্র সৌরজগৎটা ঘুরে দেখি। এভাবে লিখলে বুঝতে বেশ সহজ হবে বলে মনে করি। এ কাল্পনিক ভ্রমণে আমাদের আরম্ভস্থল হবে সূর্যের উপরিভাগ। অবশ্য সাধারণতঃ ওখানে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, উচ্চ তাপে যে কোন বস্তুই সাথে সাথে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তবে আমাদের ভাবনা নেই, কারণ আমাদের নভোযানটি ঠাণ্ডা-গরম সবকিছুর ঊর্ধ্বে, এবং এটা শক্ত ও অবিনশ্বর।

প্রথমেই আমরা সূর্য থেকে অন্তত ১০ কোটি মাইল দূরে এসে সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে এর আহ্নিক গতি আমাদের যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করে দেখলাম যে, উহার মাত্রা প্রায় ৬৫৫ ঘণ্টা। অর্থাৎ ২৭ দিনে সূর্যটি নিজ মেরুরেখার উপর ভিত্তি করে একবার

ঘুরে আসে। আমাদের যন্ত্রপাতি আরও বলে দিলো যে, সূর্য তার পরিবারবর্গ- অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহসহ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে বাইশ কোটি পঁচিশ লক্ষ বৎসরে একবার ঘুরে আসে। সূর্যের উপর মাধ্যাকার্ষণও পৃথিবীর তুলনায় ২৮ গুণ বেশী; যার ফলে পৃথিবীতে ১ কেজি ওজনের একটি বস্তু সূর্যের উপর ২৮ কেজি ওজনবিশিষ্ট হবে।

সূর্য সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য হলো: সূর্যের আয়তন হচ্ছে, ৮ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল। পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব ৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল। এটা মূলত হাইড্রোজেন গ্যাসের তৈরী (৯৫%), এছাড়া আছে ৫% হিলিয়াম ও অন্যান্য বস্তু- যা এটম হিসেবে অস্থিত্বশীল। সূর্যের ম্যাস বা বস্তুর পরিমাণ হলো, ১৯৯ ঢ ১০৩৪ গ্রাম (১৯৯ এর সঙ্গে ৩৪টি শূন্য থাকলে যে বিরাট নাম্বার হয়)। এর ভেতরে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। কোটি কোটি বছর যাবৎ সূর্যটি এভাবে জ্বলন্ত আছে। এই বিরাট তারাটি কিন্তু বিশ্বের কিছু সত্যিকার জায়ান্ট তারার তুলনায় বেশ ছোট্ট। বিজ্ঞানীরা সূর্যকে একটি মধ্যম সাইজের 'জি-২ ডোয়ার্ফ' [তরা ক্যাটালগের একটি হিসেব] তারা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূর্যের বয়স ৫ বিলিয়ন (৫০০ কোটি) বছর বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যের মধ্যে কয়েকটি আলাদা নির্দিষ্ট স্তর আছে। এগুলো হলো: ভেতরের কোর বা কেন্দ্রগোলক, কনভেকশন জোন ও ফটোস্ফিয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার ও করোনা (বাইরের গোলক)।

ভেতরের কোর: সূর্যের বাইরের স্তরের বিরাট ওজনসম্পন্ন গ্যাস ভেতরের কোরের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। এর ফলে ভেতরের স্তরের ঘনত্ব পানি থেকে ১০০ গুণ বেশী হয়েছে। এছাড়া এই চাপ থেকে সেখানের তাপমাত্রা হয়েছে ২৭ মিলিয়ন ডিগ্রী ফারেনহাইট। এই মহা তাপমাত্রায় বাস্তবে ভেতরের অংশটির বস্তু প্লাজমা অবস্থায় বিরাজ করছে। এই ভেতরের স্তরটিই হচ্ছে সূর্যের এনার্জি সৃষ্টির কারখানা। এখানে নিউক্লিয়ার রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হচ্ছে, আর এ পরিবর্তনের সময় এটমগুলো ছেড়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ধরণের এনার্জি বা উদ্যম। তবে প্রশ্ন জাগতে পারে এই রিয়েকশন কতদিন চলবে? কোন

একদিন নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ হবে। তবে আগেই বলেছি, আমাদেরকে এব্যাপারে এখনই দুর্ভাবনার সময় আসে নি কারণ, সূর্যের মধ্যে এত বিরটা পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে যে, বর্তমান রেইটে তা জ্বলতে থাকলে আরও ৫ বিলিয়ন বছর পুড়ার পর শেষ হবে।


সূর্যের এক্স-রে ছবি

কনভেকশন জোন ও ফটোস্ফিয়ারঃ সূর্যের দৃশ্যমান উপরিভাগের কাছে বস্তুর ওজনের চাপ অনেকটা কম। এরফলে তাপমাত্রাও ভেতরের তুলনায় অল্প। কেন্দ্র থেকে বাইর পর্যন্ত মোট দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ বাইরের দিকের দূরত্বে এসে তাপমাত্র ১ মিলিয়ন কেলভিনে নেমে এসেছে। এই অংশে এটমগুলো আর প্লাজমা অবস্থায় নেই। এই জোনটি তাই বেশ ক্রিয়াশীল। ভেতরের তাপ ও অন্যান্য এনার্জি এই জোন বাইরের দিকে নিয়ে আসে। সুতরাং এই জোন বা স্তরটি সূর্যের ভেতরের এনার্জি ট্রান্সপোর্ট করার দায়িত্ব পালন করছে।

ক্রোমোস্ফিয়ার: ফটোস্ফিয়ারের উপরে এ গোলকটি স্থাপিত। এখানের তাপমাত্রা ৪,৫০০ কেলভিন থেকে উপরের দিকে ১৫,০০০ কেলভিন পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

করোনা: পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় কয়েক মিলিয়ন মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত একটি উজ্জ্বল গোলক দেখাতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন করোনা। সূর্যের মূল গোলকের তুলনায় এই করোনার ঔজ্জ্বল্য এক মিলিয়ন গুণ কম। এই করোনা সম্পর্কে অনেক তথ্য এখনও জানা যায়নি। তবে এটা যে একটি গরম গ্যাস দ্বারা তৈরী তা জানা গেছে।

সূর্যের মধ্য থেকে আরেক ধরণের এনার্জি চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়ছে যাকে বলে সোলার উইন্ড বা 'সৌরবাতাস'। এই বাতাস সমগ্র সৌরজগতের সর্বত্র বিদ্যমান। পাইওনিয়ার-১০ নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যখন সৌরজগত ছেড়ে তারকাজগতের দিকে পাড়ি জমায়, তখন এই উইন্ড সেই বাইর সৌরজগতেও বিদ্যমান আছে বলে প্রমাণ মিলে। সোলার উইন্ডের গতি হচ্ছে ১৮৫ থেকে ৪৩৫ মাইল প্রতি সেকেন্ড। তবে এই উইন্ডের মধ্যে বস্তুর মাত্রা বা ঘনত্ব অত্যল্প। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও পরিলক্ষিত হয়। অরোরা নামক যে আলোর খেলা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর আকাশে দেখতে পাওয়া যায়, তা এই উইন্ডের কারণে হয়।

সূর্য সম্পর্কে মানুষ এখও অনেককিছু জানতে পারেনি। যেহেতু সূর্যের কাছে যাওয়া অসম্ভব তাই এটাকে নিয়ে গভীর গবেষণাও কঠিন ব্যাপার। তবে বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। সর্বদাই সূর্য সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে আমাদের নিকটতম এই তারাটি সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আমরা জানতে পারবো।

বুধ

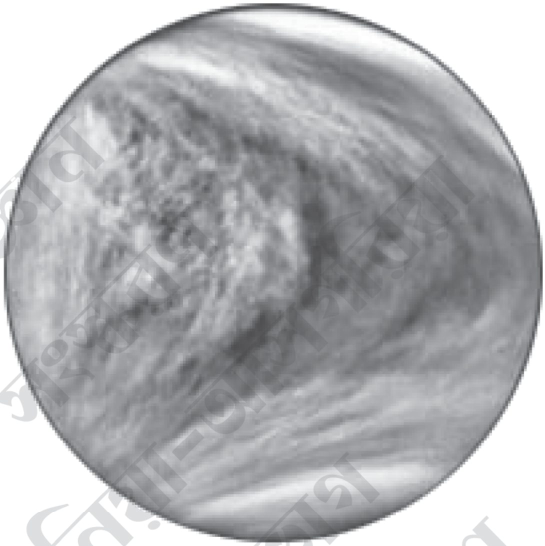
আমাদের নভোযানটি এবার সূর্যের নিকঠতম গ্রহ বুধের দিকে অগ্রসর হলো। এর কাছে পৌছে আমরা এই গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে সক্ষম হলাম।

বুধ বা মারকারী সূর্য থেকে গড়ে ৪,৩২,৮৩,০০০ (চার কোটি বত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার) মাইল দূরে অবস্থান করে কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে। সূর্যের এতো নিকটে হওয়ার ফলে বুধের কক্ষপথে চলার গতিও বেশী, একবার প্রদক্ষিণ করতে মাত্র ৮৮ দিন লাগে। এর দিবাভাগের তাপমাত্রা হলো ৪৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর রাতের তাপমাত্রা মাইনাস ১৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বুধের আয়তন হলো ৪,৮৭৮ কিলোমিটার। তার মুক্তগতি (এস্কেপ ভেলোসিটিঃ যে কোন আষ্ট্রনোমিক্যাল বডির উপর থেকে মহাকর্ষের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে মহাশূন্যে উঠে যেতে যে গতির প্রয়োজন, তার নাম এস্ক্রেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি।) ৪.২৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। এক কেজি ওজনের বস্তু বুধের উপর মাত্র ০.৩৮ কেজি হবে। এ গ্রহটি সম্পর্কে আমরা আরও জানতে পারলাম যে, এটা একটি শক্ত মাটির তৈরী গ্রহ তবে আয়তনে ছোট ও ওজনে কম হওয়ায় তার চতুর্দিকে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। সুতরাং বুধের মধ্যে কোন ধরনের প্রাণী যে নেই তা প্রায় নিশ্চিত।


বুধের একাংশ

বুধের উপরিভাগ বা সারফেসে অসংখ্য ইমপেক্ট ক্রেটার বা বস্তু পতিত হওয়া থেকে সৃষ্ট গর্ত দেখতে পাওয়া যায়। বুধ সম্পর্কে আরও যা কিছু জানা গেছে তাহলোঃ বুধের বার্ষিক গতি হচ্ছে ৮৮ দিন, অর্থাৎ ৮৮ দিনে একবার সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। এর আহ্নিক গতি ৫৮.৬ দিন। পৃথিবীর তুলনায় বুধের ব্যাস (ডায়ামিটারঃ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব) হলো ৪০% মাত্র। এর ওজন পৃথিবীর তুলনায় ৬%। ধারণা করা হয় গ্রহটির ভেতরে একটি বড় আয়তনের লোহার তৈরী কেন্দ্র আছে।

শুক্র



সূর্য থেকে ৬,০৭,০০,০০০ (ছয় কোটি ৭ লক্ষ) মাইল দূরে অবস্থান করে, শুক্র বা ভিনাস গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর ব্যাস হচ্ছে ৭,৫২০ মাইল এবং ওজন (ম্যাস) পৃথিবীর ৮১ শতাংশ। ভিনাসের ঘনত্ব পৃথিবীর ৯০ শতাংশ। এর বার্ষিক গতি হলো ২২৪.৭ দিন। শুক্রের ব্যাপারে একটি অদ্ভুত কথা হলো, তার আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি প্রায় সমান, যার ফলে এক অংশ সর্বদা সূর্যের দিকে থাকে। শুক্রের তাই অর্ধাংশ স্থায়ীভাবে দিবালোকে ভাসমান আর অন্য অর্ধাংশ সর্বদা রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এছাড়া এর আহ্নিক গতিপথ বা চলার ডাইরেকশনও আলাদা। অন্যান্য গ্রহের গতিপথ যেদিকে শুক্রের গতিপথ এর ঠিক উল্টোদিকে।

শুক্র গ্রহকে পৃথিবীর সহোদরা বলা হয়ে থাকে, কারণ এর আয়তন ও স্বভাব অনেকটা পৃথিবীর মতোই। তার চতুর্দিকে বেশ বড়ো ঘন বায়ুমণ্ডল আছে। শুক্র গ্রহ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে আসতে পারে অন্যান্য গ্রহের তুলনায়। রাতের আকাশে এটা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। যার কারণে এটাকে সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। শুক্র গ্রহের ঘন বায়ুমণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্বারা গঠিত। গ্রীন হাউসের প্রভাবে এর উপরিভাগের তাপমাত্রা ৪৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই উচ্চ তাপমাত্রা থাকায় শুক্র গ্রহে কোন প্রাণী থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

শুক্র গ্রহের উপরিভাগ বা ভূমি অনেকটা পৃথিবীর মতোই। বড় বড় পাহাড়, পর্বত, সাগর, সমতলভূমি, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি সবই আছে। আফ্রিকা মহাদেশের সমান একটি উঁচু ভূখণ্ড আছে। বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন, "আফ্রদিতি টেরা।" সর্বোচ্চ পাহাড়ের নাম ম্যাক্সওয়েল, এর উচ্চতা হচ্ছে ৭ মাইল। উল্লেখ্য, ম্যাক্সওয়েল নামকরণ স্কটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল-এর নামানুসারে করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা এই বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

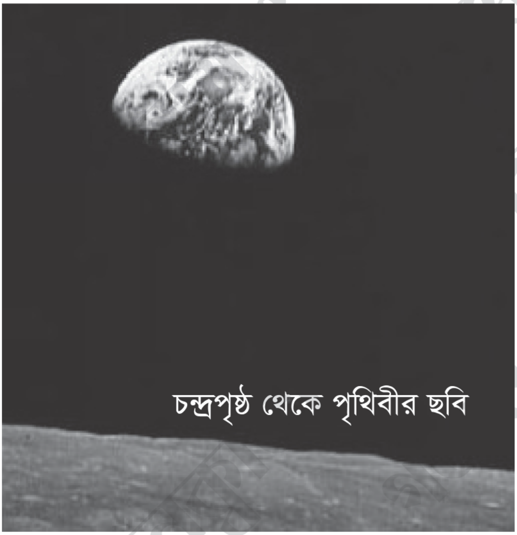
পৃথিবী ও চন্দ্র

আমাদের কাল্পনিক নভোযানটি সূর্য থেকে তৃতীয় স্থানে অবস্থিত সুন্দর নীল গ্রহ পৃথিবীতে পৌঁছুল। সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেটিতে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বেঁচে থাকতে সমর্থ। আমাদের এ পৃথিবীতে আছে বড়ো বড়ো কয়েকটি মহাদেশ, চার ভাগের তিন ভাগে পানি- আর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সম্বলিত বায়ুমণ্ডল।

সূর্য থেকে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে পৃথিবী ১ বৎসরে একবার একে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি হলো ২৪ ঘণ্টা বা একদিন। এর ব্যাস হলো ১২,৪০০ কিলোমিটার (৭,৯০০ মাইল)। পৃথিবী থেকে মুক্ত হতে হলে ১১.১৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড- এ মুক্তগতির প্রয়োজন। এখানে দিনেরবেলা গড়ে ২২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হয়ে থাকে। নিম্নতম তাপমাত্রা মাইনাস ৮৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে আসতে পারে দুটি মেরুতে। পৃথিবীর একটিমাত্র স্বাভাবিক উপগ্রহ আছে, যেটি হলো চাঁদ। পৃথিবী থেকে গড়ে ৩৮৪,৪০০ কিলোমিটার (২,৩৮,৯০০ মাইল) দূরে অবস্থান করে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের উপর তাপমাত্রা পৃথিবীর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর বিশেষ কারণ হলো বায়ুমণ্ডল না থাকা। রাতের বেলা অর্থাৎ অন্ধকার সাইডে তাপমাত্রা মাইনাস ১৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। কিন্তু দিনের বেলা তা বেড়ে ১৩০ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছে।

চন্দ্রের দুধরণের আহ্নিক (মাসিক) গতি আছে। প্রথমত: যে সময়ের মধ্যে সে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আকাশের একই অবস্থানে ফিরে আসে তাকে বলে, "সাইডারিয়েল মাস"। সাইডারিয়েল মাসের পরিমাণ হলো, ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩

মিনিট ও ১১.৬ সেকেন্ড। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে চন্দ্রকে নিয়ে একই দিকে প্রদক্ষিণ করছে তাই চন্দ্রকে তার ফেইজে (দৃশ্যমান পর্যায়ে) ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে বলে, "সাইনোডিক মাস"। এক সাইনোডিক মাস হচ্ছে, ২৯ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট ও ২.৮ সেকেন্ড। উল্লেখ্য, এই সাইনোডিক মাসই ইসলামী ক্যালেণ্ডারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চন্দ্রের আহ্নিক গতি (নিজস্ব মধ্যশলার উপর ভিত্তিকরে ঘুর্নন গতি) সাইডারিয়েল গতির প্রায় সমান থাকায় এর অর্ধাংশ সর্বদাই পৃথিবীর দিকে থাকে। চন্দ্রের ব্যাস হলো ৩,৪৭৬ কিলোমিটার (২,১৬০ মাইল) এবং মুক্তগতি ২.৩৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। চন্দ্রের মাধ্যাকার্ষণ ক্ষমতা পৃথিবীর ০.১৬৫৩ গুণ মাত্র। চন্দ্রের মধ্যে বস্তুর (ম্যাসের) স্বল্পতার কারণে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। কারণ বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন দাঁড়ায় পর্যাপ্ত মহাকর্ষ। ১৯৬৯ সনে মানুষ প্রথমে চন্দ্রের উপর অবতরণ করতে সক্ষম হয়। কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রের অভ্যন্তরে বরফ আকারে পানি আছে বলে সন্ধান পাওয়া গেছে।


চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর ছবি

চন্দ্রের শুষ্ক পৃষ্ঠভাগের স্বরূপ মূলতঃ দুধরনের। এর একাংশ হচ্ছে পহাড়, পর্বত ও মিটিওরাইট (মহাকাশের প্রস্তরখ) পতনের গর্তে পরিপূর্ণ আর অপর অংশ অনেকটা সমতলভূমি। মিটিওরাইট গর্তের আয়তন বিভিন্ন মাপের দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের অপর দিকে (অন্ধকার সাইডে) একটি গর্ত আছে যার ব্যাস ১,৫৫০ মাইলের অধিক। ধারণা করা হয় মিটিওরাইট মহাকাশ থেকে সুদূর অতীতে চন্দ্রের উপর পতিত হয়ে এসব গর্ত তৈরী করেছে।

মঙ্গল

মঙ্গল হলো সৌরজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রোমান্টিক একটি গ্রহ। এখানে প্রাচীনকাল থেকে প্রাণী আছে বলে মানুষ ধারণা করে আসছে। অনেকে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী থাকার কল্পনাও করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক লেখকদের জন্য এ গ্রহ ও এর মধ্যে জীবিত প্রাণীরা ছিলো তাঁদের কল্পনার খোরাক। প্রখ্যাত লেখক এইচ. জি. ওয়েল্স তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস, ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্লডস্ বইয়ে, মার্স বা মঙ্গল থেকে আগত প্রাণীদের সাথে পৃথিবীবাসিদের যুদ্ধের কাহিনী লিখেছিলেন। যাহোক, মঙ্গলে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের বাস দূরে থাক, বেকটেরিয়া জাতীয় ক্ষুদ্রকায় কোন প্রাণী আছে কি না সে ব্যাপারেই নিশ্চিত কিছু বলা যায় নি। আমেরিকার মহাশূন্য সংস্থা নাসা, এ পর্যন্ত একাদিক কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গল গ্রহে প্রেরণ করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন ফলাফল অর্জন করতে পারেনি। যদিও কিছুদিন পূর্বে মঙ্গলে প্রাণী আছে বলে যে প্রচার করা হয়েছিলো, তা শেষ পর্যন্ত ভুলের ছিলো বলে আবার ঘোষণা করা হয়েছে। এবার দেখা যাক মঙ্গল সম্পর্কে আমাদের নভোযানের যন্ত্রপাতি কি কি তথ্য দিয়েছে।



মঙ্গল গড়ে ১৪ কোটি মাইল দূরে থেকে প্রতি ১.৮৮ (৬৮৭ দিন) বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সে প্রতি সেকেন্ডে ২৪ কিলোমিটার (১৫ মাইল) বেগে সূর্যকে কেন্দ্র করে তার প্রদক্ষিণপথে ছুটে চলছে। মঙ্গলের আহ্নিক গতি প্রায় পৃথিবীর সমান

গতিসম্পন্ন (২৪ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিট, ২৩ সেকেন্ড), এর ব্যাস কিন্তু অনেক কম- প্রায় ৬,৭৯৪ কিলোমিটার (৪,২২২ মাইল)। গ্রহটির উপরিভাগের তাপমাত্রা মাইনাস ২৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী হয়না। এর মুক্তগতি ৫.০৩ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের মাধ্যাকার্ষণ ০.৩৮ গুণ। মঙ্গলের মাটির রং লাল, এবং তার চতুর্দিকে পাতলা বায়ুমণ্ডলও আছে। মঙ্গল গ্রহের ফোবস ও ডেইমস নামে নিজস্ব দুটি উপগ্রহ (চাঁদ) আছে। মঙ্গলে তাই রাতের বেলা একই সাথে দুটি চাঁদ দেখতে পাওয়া যাবে। এই চাঁদগুলো আয়তনে বেশ ছোট। ফোবসের ব্যাস হলো ২২ কিলোমিটার, আর ডেইমসের ১২ কিলোমিটার। এ উপগ্রহগুলো মঙ্গলকে চন্দ্রের মতো প্রদক্ষিণ করে।

মঙ্গলের বায়ূমণ্ডল মূলত কার্বন-ডাইওক্সাইড (৯৫.৩%) দ্বারাই গঠিত। এছাড়া এতে আছে নাইট্রোজেন (২.৭%) এবং আরগোন (১.৬%)। বাদবাকী অত্যল্প অক্সিজেন, কার্বন মনোক্সাইড, ওটার ভেপার (জলীয় বাষ্প) প্রভৃতি গ্যাসও আছে বলে জানা যায়।

লাল গ্রহ নামে খ্যাত মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠের রং সত্যিই গাঢ় লাল থেকে বাদামী রংয়ের বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মনুষ্যবিহীন কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবি এ তথ্যটি প্রমাণ করেছে। এছাড়া সমতল ভূমিতে সর্বত্র ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়।

মঙ্গলে অত্যন্ত উঁচু আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্ট পাহাড় আছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হচ্ছে, ওলিমপাস মনস (মাউন্ট ওলিমপাস - ওলিমপাস পর্বত) যার উচ্চতা ৫২,০০০ হাজার ফুট (এভারেষ্ট পর্বতের প্রায় দ্বিগুণ)। এর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ৩৭০ মাইল।

মঙ্গল গ্রহের উপর গবেষণা পুরোদমে চলছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষ এই গ্রহেই কোন একদিন কলোনী তৈরী করে বসবাস করবে। তবে প্রথমে সেখানে মানুষ পাঠানোর চিন্তাভাবনা নিয়েই বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত আছেন। হয়তো ১০-১৫ বছরের মধ্যে প্রথম মানুষ মঙ্গলে অবতরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

এ্যাস্টারয়েড বেল্ট বা গ্রহাণুপুঞ্জ

আমাদের স্পেইস শীপটি মঙ্গল থেকে দ্রুতবেগে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু অর্ধপথে পৌছার পরই যানটি গতিরোধ করে রিপোর্ট করলো যে, সামনেই অসংখ্য ছোট-বড় শিলাবৎ শক্ত বস্তু মহাশূণ্যে ভাসমান আছে। আমরা বাস্তবে এ্যাস্টারয়েড বেল্টে এসে পৌঁছেছি।

এ্যাস্টারয়েডগুলো হলো সৌরজগতে ভাসমান ছোট আকারের শিলাবৎ অসংখ্য শক্ত বস্তু বা গ্রহাণু। সর্বাপেক্ষা বড় এ্যাস্টারয়েড এর নাম হচ্ছে সেরেস, যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত প্রায় ৬০০ মাইলের পথ। কয়েক হাজার এ্যাস্টারয়েড আলাদাভাবে সনাক্ত করা হয়েছে, তবে ১ মাইল অথবা বেশী আয়তনবিশিষ্ট এ্যাস্টারয়েডের সংখ্যা অন্তত ৫ লক্ষ হবে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু সবগুলো মিলেও পৃথিবীর জড়ের তুলনায় মাত্র ১০০০ ভাগের ১ ভাগ হবে। বেশীরভাগ এ্যাস্টারয়েড মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে অবস্থান করছে। এগুলো সূর্য থেকে ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল হতে ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে মহাকাশে অবস্থান করে প্রদক্ষিণ করছে। এ্যাস্টারয়েড সাধারণতঃ শতকরা ৭৫ ভাগ কার্বনের তৈরী কৃষ্ণকায়, ১৫ ভাগ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট সিলিকনে তৈরী (পাথরের মত) এবং ১০ ভাগ ধাতুর তৈরী বলে জানা গেছে। বার্ষিক ছাড়াও প্রতিটি এ্যাস্টারয়েডেরই আহ্নিক গতি আছে। এ্যাস্টারয়েড আয়তনে যতো ছোট হবে, এর আহ্নিক গতিও ততো বেশী হবে। বেশীরভাগ এ্যাস্টারয়েড দেখতে অনেকটা আলুর মতো।


এ্যাস্টারইড ব্রেইলির নিকট কৃত্রিম মহাকাশযান

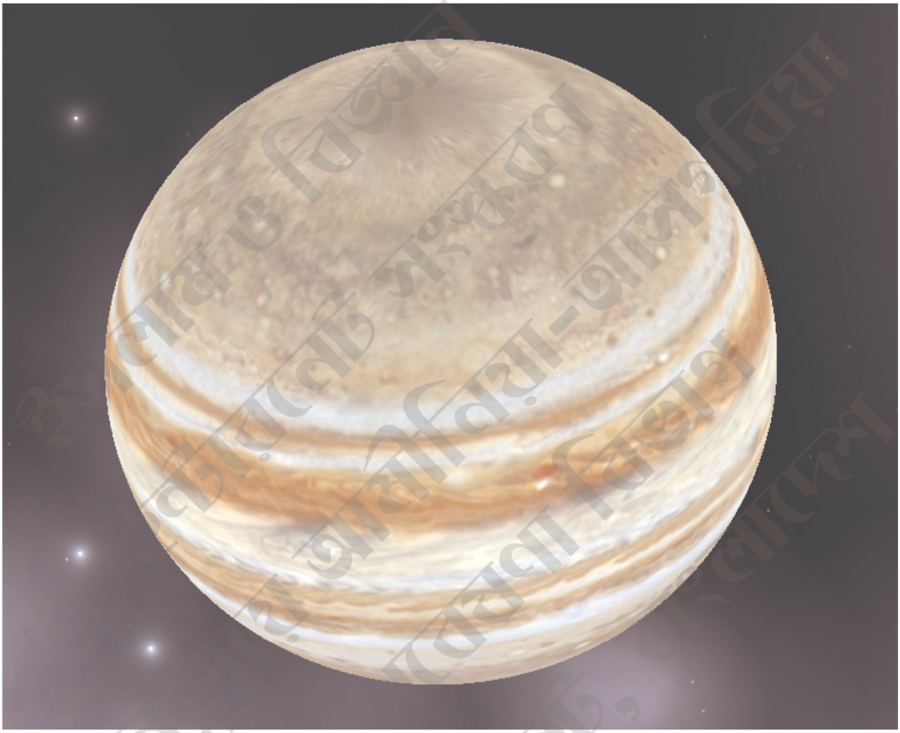
বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ্যাস্টারয়েড সৌরজগৎ সৃষ্টির সময়েই সৃষ্ট হয়, তবে এগুলো কোন গ্রহ ভেঙ্গেও হতে পারে, এরূপ মন্তব্যও কেউ কেউ করে থাকেন।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমাদের নভোযানটি এ্যাস্টারয়েড বেল্ট পেরিয়ে আন্তঃগ্রহ মহাশূন্যে দ্রুতগতিতে সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ, বৃহস্পতি বা জুপিটারের দিকে অগ্রসর হলো।

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি হচ্ছে বিরাট গ্যাসীয় একটি গ্রহ যার আয়তন পৃথিবীর দশগুণ বেশী। এর ওজন (ম্যাস) পৃথিবী থেকে ৩১৮ গুণ বেশী হলেও সূর্যের তুলনায় এর মধ্যে জড়বস্তু হলো মাত্র ০.১ ভাগ। বৃহস্পতির মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এই দুই ধরনের গ্যাস বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এর উপরিভাগে কোন শক্ত মাটি বা শিলাবৎ জড় নেই তবে তরল পদার্থ আছে যা গ্রহের ভেতরে গিয়ে ধাতুর আকার ধারণ করেছে। বৃহস্পতির কেন্দ্রে হয়ত ছোট আয়তনবিশিষ্ট শিলাবৎ বা কঠিন বরফের তৈরী অন্তস্থল (কৌর) থাকতে পারে। বৃহস্পতি প্রতি ১১.৯ বৎসরে সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘূরে আসে এবং তার দূরত্ব সূর্য থেকে প্রায় ৪৯ কোটি মাইল (পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ৫.২ গুণ)। বৃহস্পতির ব্যাস ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার (৮৮,৭০০ মাইল)। ১ কেজি কোন বস্তুর ওজন বৃহস্পতির উপরে ২.৬৪ কেজি হবে এবং তার মুক্তগতির পরিমাণ হলো ৬০.২২ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। বৃহস্পতির আহ্নিক গতি মাত্র ০.৪১৪ দিন (৯ ঘণ্টা ৫৫.৫ সেকেন্ডে সে একবার তার মধ্যশলাকার উপর ঘুরে আসে)। এই উচ্চ আহ্নিক গতির ফলে তার উপরিভাগে নানা রংগের উজ্জ্বল ও অন্ধকার বেল্ট এর সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা পৃথিবী থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তবে বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে যে বস্তু প্রখ্যাত, তা হলো তার লাল দাগ। এ দাগের আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। বিগত ৩০০ বছর যাবৎ এ লাল দাগটি পরিলক্ষিত হয়ে আসছে, তবে এটির কারণ এখনো জানা যায়নি।

বৃহস্পতি গ্রহের সর্বমোট **১৬**টি নিজস্ব উপগ্রহ (চন্দ্র) আছে। বলা যায় বৃহস্পতি সিস্টেম সৌরজগতের মধ্যে আরেকটি সৌরজগৎ, কারণ এই প্রতিটি উপগ্রহই বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে যেমনটি করে সূর্যকে সৌরজগতের নয়টি গ্রহ। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোকে চারটি আলাদা ভাগে বিভক্ত করে দেখা হয়ে থাকে।



প্রথমতঃ ছোট আয়তনের চারটি আভ্যন্তরীণ উপগ্রহ আছে যাদের নাম হলো যথাক্রমে, মিটিস, এড্রাসট্টিয়া, মালথিয়া ও থিবী। দ্বিতীয়তঃ বড় আকারের চারটি গ্যালিলিয়ান (বিজ্ঞানী গ্যালিলীও দ্বারা আবিষ্কৃত) উপগ্রহ আছে, যেগুলোর নাম হলো, ইও, ইউরোপা, জানেমিড ও ইলারা। এ দুই দলের আটটি উপগ্রহ বৃহস্পতির অরবিট্যাল প্লেইনের (অরবিট্যাল প্লেইন: গ্রহগুলো মহাকাশে যে অবস্থানে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তার নাম হচ্ছে অরবিট্যাল প্লেইন। কে বা কারা এটিকে বাংলায় অনুবাদ করতে যেয়ে 'নিরক্ষবৃত্তের সমপৃষ্ঠ' লিখেছে। এতো কঠিন শব্দব্যবহার কি কারো কাম্য হতে

পারে? আমার মতে 'প্রদক্ষিণপথ' বলাই যথেষ্ট অর্থবোধক।) উপর ভিত্তি করে, প্রায় বৃত্তাকারে গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। তৃতীয় দলে লিদা, হিমালিয়া, লাইসিতিয়া ও আইলারা নামে চারটি ছোট্ট উপগ্রহ আছে, যাদের কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকারের ও এগুলোর অবস্থান বৃহস্পতি থেকে ১.১ কোটি থেকে ১.২ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। এগুলো বৃহস্পতির প্রদক্ষিণপথ থেকে ২৫ হতে ২৯ ডিগ্রি পর্যন্ত উপরে বা নীচে স্থাপিত আছে। বাইরের দিকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করছে চতুর্থ দলের নানকি, কারমি, পাসিপায়ি ও সাইনোপি নামে আরও চারটি উপগ্রহ। এগুলো অন্যদের তুলনায় উল্টো দিকে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে, এবং এদের দূরত্ব বৃহস্পতি থেকে ২.১ কোটি হতে ২.৪ কোটি মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এ চার দলের মধ্যে প্রথমটির চারটি উপগ্রহই পৃথিবী থেকে ছোট টেলিস্কোপ বা দূর্বিক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমেই দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের কাল্পনিক স্পেইস শীপটি আমাদেরকে সূর্য থেকে ৫২ কোটি মাইল দূরে বৃহস্পতির নিকটে পৌছে দিয়েছে, কিন্তু সৌরজগতের বাইরের দিকে আরও বহু কোটি মাইলের পথ বাকী আছে। এবার আমরা আরও দ্রুত গতিতে সৌরজগতের সর্বাপেক্ষা সুন্দর রিং-সংযুক্ত ষষ্ঠ গ্রহ শনির দিকে যাত্রা করবো।

শনিগ্রহ

শনিগ্রহ বা সোটার্ন সৌরজগতের চারটি গ্যাসীয় দৈত্যদের মধ্যে একটি, যার আয়তন দ্বিতীয় স্থানে; বৃহস্পতির পরই। এর নিরক্ষবৃত্তের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় ৯.৪ গুণ বেশী আর জড় পদার্থের পরিমাণ ৯৫ গুণ অধিক। তবে শনির ঘনত্ব গড়ে পানির তুলনায় মাত্র ০.৭ গুণ। বৃহস্পতির মতো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসই শনিতে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এর কেন্দ্রস্থলে পৃথিবীর জড়ের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ গুণ বেশী জড় সম্বলিত একটি আভ্যন্তরিণ কৌর বা অন্তস্থল আছে। এ অন্তস্থল শিলাবৎ বা শক্ত তুষারের তৈরী হতে পারে। শনির সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বস্তু হলো তার রিং সিস্টেম। এ রিং গ্রহটির অরবিট্যাল প্লেইন থেকে কিছু দূরে অবস্থান করে শনিকে প্রদক্ষিণ করে।

ভয়েজার নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ শনিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। ভয়েজার থেকে পাঠানো ছবি থেকে বুঝা যায় যে, বাস্তবে কয়েক হাজার ছোট ছোট রিং এর সমন্বয়ে রিং সিস্টেম গঠিত হয়েছে। এসব রিং এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মাত্র এক কিলোমিটার বিস্তৃত। এবং এগুলো আলাদা শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

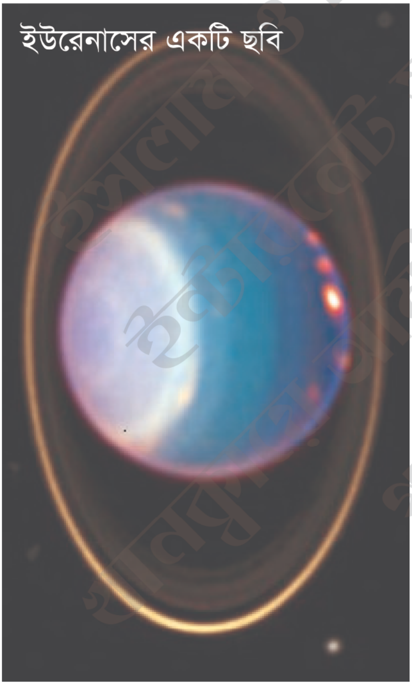


১৯৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত শনি গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা দশটি পর্যন্ত জানা ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে আরও কয়েকটা উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৮টা উপগ্রহের সন্ধান মিলেছে, ভবিষ্যতে আরও আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শনি ৮৭ কোটি মাইল দূরে অবস্থান করে সূর্যকে প্রতি ২৯.৭৫ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। সে নিজ মেরুরেখার উপর ভিত্তি করে প্রতি ১০ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে একবার ঘুরে আসে। অর্থাৎ- মাত্র ১০ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে শনির একদিন হয়। পৃথিবীর তুলনায় এর মহাকর্ষ হলো ১.১৬ গুণ বেশী। শনির মুক্তগতি ৩২.২৬ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। রিং ছাড়াও তার ব্যাস হলো ১,২০,৫৩৬ কিলোমিটার।

ইউরেনাস

পাঠকরা! আমরা সূর্য থেকে বহু দূরে এসে পড়েছি। শনি থেকে সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে এটাকে বেশ ছোট্ট দেখাচ্ছে। যখন সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের নিকটে আসলাম তখন, আমরা সূর্য থেকে প্রায় ১৭৯ কোটি মাইল দূরে এসে পড়েছি।



ইউরেনাসের একটি ছবি

ইউরেনাসও একটি বিরাট আকারের গ্রহ। উইলিয়াম হার্সেল নামক একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলেন এ গ্রহের আবিষ্কারক। তিনি ১৭৮১ সালের ১৩ মার্চ এটি তাঁর টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখতে পান। পৃথিবীর উপর থেকে সর্বাপেক্ষা বড় টেলিস্কোপের মাধ্যমেও ইউরেনাসকে ঈষৎ সবুজ বর্ণের একটা বৃত্তের মতো দেখতে পাওয়া যায় মাত্র। ১৯৮৬ সালে ভয়েজার-২ নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ইউরেনাসের নিকটে আসে, এতে এ গ্রহটি ও তার উপগ্রহগুলো সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে সক্ষম হয়েছি। ভয়েজার-২ দশটা অজানা উপগ্রহ আবিষ্কার করে, যদিও ইতোমধ্যে আরও পাঁচটির খবর জানা ছিলো। এই পাঁচটির নাম হলোঃ মিরাণ্ডা (জেরার্ড কাইপার নাকম একব্যক্তি ১৯৪৮ সালে এটি আবিষ্কার করেন), এরিয়েল, আমেব্রল (এ দুটি ১৮৫১ সালে উইলিয়াম রাসেল আবিষ্কার করেছিলেন), টিটানিয়া এবং অবেরন (এগুলো উইলিয়াম হার্সেল ১৭৮৭ সালে আবিষ্কার করেন)।

ইউরেনাসও একটি মোটা আয়তনের গ্যাসীয় গ্রহ, যার ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় চারগুণ বেশী ও ম্যাস পনেরগুণ বেশী জড়বিশিষ্ট। এটি হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী। বিজ্ঞানীদের ধারণা ইউরেনাসের কেন্দ্রস্থলে ছোট্ট আয়তনের শিলাবৎ একটি কৌর আছে যার চতুর্দিকে কঠিন বরফ, মিথেইন ও এ্যামোনিয়ার তৈরী গাঢ় আরেকটি গোলক নিহিত আছে।

ইউরেনাস সূর্য থেকে প্রায় ১৭৯ কোটি মাইল দূরে মহাশূন্যে অবস্থান করে প্রতি ৮৪.০১৩ বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। তার আহ্নিক গতি হলো মাত্র ১৭ ঘণ্টা ২৪ মিনিট। ইউরেনাসের ব্যাস (মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত) ৫১,১০০ কিলোমিটার (৩১,৭৫০ মাইল)। এর ওজন পৃথিবীর তুলনায় ১৫ গুণ বেশী। তার মহাকর্ষ পৃথিবীর ১.১৭ গুণ বেশী এবং মুক্তগতি ২২.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড।

ভয়েজার-২ কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ইনফ্রা-রেড (ইনফ্রা-রেড রেডিয়েশন: একটি বিশেষ ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা বস্তু থেকে বিকিরণ হয়ে থাকে। আলো যেভাবে দেখা যায় সাধারণত এ তরঙ্গ খালি চোখে দেখা যায় না। বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা যা দিয়ে ছবি তোলা যায়।) ছবি থেকে ইউরেনাসের উপরিভাগের তাপমাত্রা মাইনাস ২১৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বলে বিজ্ঞানীরা সাব্যস্ত করেছেন। এই গ্রহেরও চতুর্দিকে শনির মতো রিং সিস্টেম আছে। উল্লেখ্য এই রিং সিস্টেম সম্পর্কে আগে কারো জানা ছিলো না। ভয়েজার-২, ১৯৭৭ সালের ১০ মার্চ এটা আবিষ্কার করে।

নেপচুন

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে নেপচুনের স্থান অষ্টম পর্যায়ে, যদিও সময় সময় প্লুটো নেপচুন থেকেও নিকটে থাকে। নেপচুনকে পৃথিবী থেকে খালি চক্ষে দেখতে পাওয়া যায়না। বড় টেলিস্কোপের মাধ্যমে একে একটা অনুজ্জ্বল ঈষৎ নীল বর্ণের বৃত্তের মত দেখতে পাওয়া যায়। এ নীল রংয়ের কারণ হলো তার চতুর্দিকে উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলে মিথেইন গ্যাস আছে।

ভয়েজার-২ নভোযানের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে নেপচুনের কিছু ছবি তুলা হয়। এতে দেখা গেছে, এ গ্রহটি অনেকটা ইউরেনাসের মতোই। যদিও নেপচুনে একটি বৃহৎ অন্ধকার দাগ আছে যা অনেকটা বৃহস্পতি গ্রহের বৃহৎ লাল দাগের মতোই। নেপচুনের সর্বমোট ৮টা উপগ্রহ আছে।

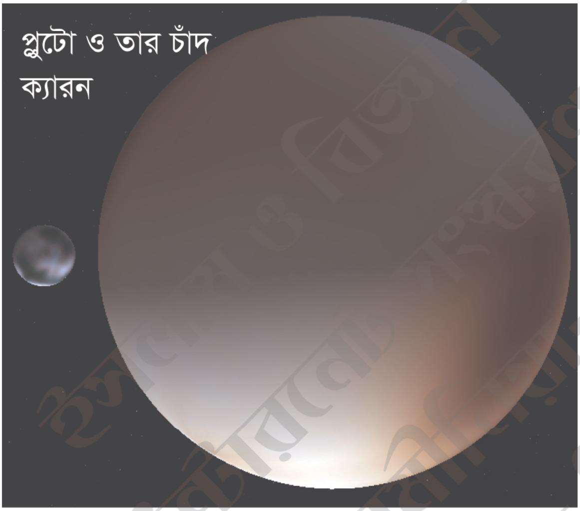


সূর্য থেকে ২৮০ কোটি মাইল দূরে নেপচুনের অবস্থান। প্রতি ১৬৪.৭৯৩ বৎসরে এটা সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। নেপচুনের নিজস্ব আহ্নিক গতির পরিমাণ হলো ১৬ ঘণ্টা ৮ মিনিট। নেপচুনের ব্যাস ৪৯,৫০০ কিলোমিটার (৩০,৭৫০ মাইল), এর মুক্তগতি ২৩.৯ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড ও তার উপরে ১ কেজি ওজনের বস্তু ১.২ কেজি ওজনবিশিষ্ট হবে। নেপচুনের উপরিভাগের তাপমাত্রা মাত্র মাইনাস ২১৮ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্রহটির সর্বাপেক্ষা বড় উপগ্রহের নাম হলো ট্রাইটন। এটার ব্যাস ১৬৮০ মাইল যা চন্দ্রের থেকে সামান্য ছোট। এছাড়া নিরেইড নামক এর আরেকটি উপগ্রহ আছে যার ব্যাস ২১৩ মাইল। ভয়েজার-২ কৃত্রিম উপগ্রহ আরও ছয়টি নতুন উপগ্রহ আবিষ্কার করে। ভয়েজার-২ থেকে প্রাপ্ত ছবি থেকে এই গ্রহেরও রিং থাকার প্রমাণ মিলেছে। নেপচুনের মোট ৫টি রিং আছে।

প্লুটো

আমাদের কাল্পনিক স্পেইস শীপটা অনেক দূরে সৌরজগতের শেষ ও নবম গ্রহ প্লুটোর কাছে এসে পৌঁছেছে। এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহটিকে পরীক্ষা করেই আমরা সৌরজগৎ ছেড়ে আন্তঃতারা মহাশূন্যে চলে যাবো। পাঠকরা! ধৈর্য সহকারে নভোযানটিতে বসে থাকুন!

১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কৃত হয়। সূর্য থেকে এ গ্রহের দূরত্ব ২৭৯ কোটি হতে ৪৬৫ কোটি মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন কোন সময় প্লুটো নেপচুন গ্রহ থেকে কাছে আসতে পারে। প্লুটোর ক্যারন নামক একটি উপগ্রহও আছে, যার ফলে প্লুটো সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।


প্লুটো ও তার চাঁদ ক্যারন

প্লুটোর ব্যাস হলো ২,২৮৪ কিলোমিটার (১,৪১৪ মাইল), এটা প্রতি ২৪৮.৪ বছরে সূর্যের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। প্লুটোর নিজস্ব আহ্নিক গতি হলো ১৫৩ ঘণ্টা। এ গ্রহের উপর ১ কেজি ওজনের কোন বস্তুর ওজন হবে ২.০৩ কেজি, আর তার মুক্তগতি হলো ১.১৮ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। বলাই বাহুল্য, সূর্য থেকে এতো দূরে হওয়ার ফলে প্লুটো অত্যন্ত ঠাণ্ডা একটি গ্রহ হিসেবে অস্তিত্বশীল আছে। এর তাপমাত্রা মাইনাস ২২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশী হয়না।

ধূমকেতু বা কমেট

সৌরজগতের মধ্যে আমাদের এ সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শেষ হয়েছে। আমরা এবার তারকাজগতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবো। প্রথমেই আমরা নিকটতম তারা প্রক্সিমা সেনসরীর দিকে ছুটে যাবো।

প্লুটোর কক্ষপথ থেকে আমাদের এ আন্তঃতারা ভ্রমণের শুরু হচ্ছে। কিছুদূর চলার পরই কিন্তু মহাশূণ্যে এক অদ্ভুত লেজযুক্ত একটি বস্তুর সম্মুখীন হলাম আমরা। এ বস্তুটি কিন্তু আমাদের সৌরজগতেই বাস করে, যার নাম হলো ধূমকেতু বা কমেট। প্লু

সূর্যকে অসংখ্য ধূমকেতু প্রদক্ষিণ করে থাকে। সাধারণতঃ ধূমকেতুরা হলো বরফের তৈরী ক্ষুদ্রকায় বস্তু। এগুলো সূর্যের নিকটবর্তী হলে তাপমাত্রার তীব্রতায় এর কিছু অংশ গলে বাষ্পে পরিণত হয়, যার ফলে বস্তুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং ধূমকেতুটির পেছনে কোটি কোটি মাইল লম্বা লেজ এর সৃষ্টি হয়। নিশ্চয়ই অনেকে লেজবিশিষ্ট এরূপ কমেট রাতের আকাশে দেখে থাকবেন। ধূমকেতুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত যেটি, তার নাম হলো 'হ্যালিজ কমেট'। এ ধূমকেতু প্রতি ৭৬ বৎসর পরপর আমাদের আকাশে ফিরে আসে। ২,২০০ বছর ধরে এটি পৃথিবীর মানুষ অবলোকন করে আসছে। ১৯৮৬ ইংরেজীতে এ ধূমকেতু ফিরে এসেছিলো এবং ২০৬২ সালে আবার আসবে।


একটি ধূমকেতুর ছবি

কোন কোন সময় ধূমকেতু ও এ্যাস্টারইড বিভিন্ন গ্রহের বেশ কাছে এসে এর মহাকর্ষে আটকা পড়ে অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে পতিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। এরূপ বিস্ফোরণের ফলে গ্রহের মধ্যবর্তী যাবতীয় জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জীবন নির্মূল হয়ে যেতে পারে।

আজ থেকে ৬ কোটি বছর পূর্বে ডাইনাসোররা এরূপ একটি বিস্ফোরণ হেতু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো বলে অনেক বিজ্ঞানী ধারণা করেন।

কমেটগুলো যেহেতু সৌরজগতেরই সদস্য তাই তাদেরও অন্যান্য গ্রহের মতো প্রদক্ষিণপথ আছে। তবে এগুলোর প্রদক্ষিণপথ খুব বেশী ডিম্বাকৃতির (এলিপটিক্যাল) বলে জানা যায়। অর্থাৎ এগুলো সূর্যের বহু বহু দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে। কিন্তু সূর্যের কাছে এসে খুব দ্রুত তাকে প্রদক্ষিণ করে আবার দীর্ঘ ভ্রমণে চয়ে যায়। কিছু কিছু স্বল্প প্রদক্ষিণসম্পন্ন কমেট আছে যারা প্রতি ২০০ বছরে একবার সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে আসে। অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদী কোন কোনটি কয়েক হাজার বছরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, এমনও কিছু কমেট আছে যেগুলো একবার মাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সুযোগ পায়। এসব কমেট আসলে সৌরজগতের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। এরা হচ্ছে তারায় তারায় ভ্রমণকারী বস্তু। তবে এরূপ যাযাবর কমেটের সন্ধান এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি।

আন্তঃতারা মহাশূন্য

আমাদের নভোযানটির কম্পিউটার চালক- নাভিগেটর, শীপটিকে সৌরজগতের মহাকর্ষ থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিল। এর ফলে নভোযানের গতি ৬১৭.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে গিয়ে দাঁড়ালো। যানটি এবার ধীরে ধীরে আলোকের কাছাকাছি গতিতে সৌরজগতের মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে অন্ধকার আন্তঃতারা মহাশূন্যের উপর দ্রুত ছুটে চলছে। আমরা একবার সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে একে সত্যিকার একটি ছোট্ট আকারের তারা হিসেবে মহাকাশে মিটুমিটু করছে দেখতে পেলাম। নয়টা গ্রহ যে এটাকে প্রদক্ষিণ করছে তা নগ্নচোখে দেখা মোটেই আর সম্ভব ছিলো না।

৪.২ আলোক বৎসরের পথ অতিক্রম করার পর নাভিগেটর এলান করলো, "আমরা সূর্যের নিকটতম তারকা প্রক্সিমা সেন্টরীর কাছে এসে পৌছেছি"। এ তারাটা আসলে দুটি তারা সিস্টেমের মধ্যে একটি, যাকে সাধারণতঃ বাইনারী বা জোড়া-তারা বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের মধ্যে এরূপ জোড়া-তারা বেশী দেখতে পাওয়া যায়। প্রক্সিমা

সেন্টরীর সাথী অন্য তারাটির নাম হলো আলফা সেন্টরী। এদের মধ্যে একে অন্যের দূরত্ব ০.১১ আলোক বৎসর।

প্রক্সিমা সেন্টরী আলফা সেন্টরীকে প্রতি ১০ লক্ষ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করে। এ বাইনারী তারা সিস্টেম সেনটোরাস নামক একটি কন্সটেলেশন বা রাশিচক্রের অংশ।

প্রক্সিমা সেন্টরী এবং আরও দু-চারটা তারা সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা আমাদের এ মিল্কিওয়ে তারাজগৎ নিয়ে কথা বলবো।


কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টরী

টোরাস রাশিচক্রের একটি তারা হচ্ছে যার নাম হলো আলদেবারান। এ তারাটা পৃথিবী থেকে ৬৭.৯ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত। তারাটি টোরাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল একটি তারা। তবে আলদেবারানের ৬টা সাথী-তারাও আছে।

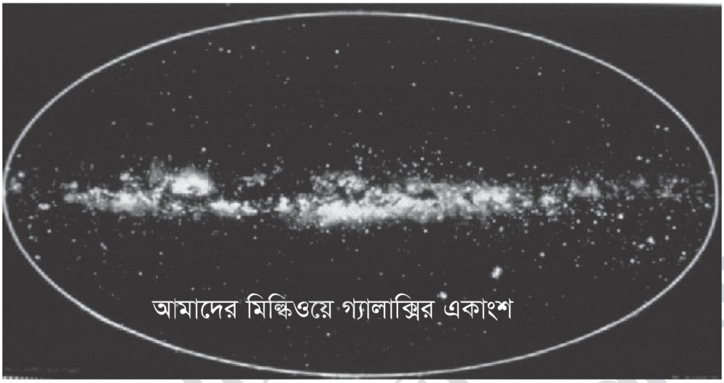
এরপর আমরা সিরিয়াস নামে আরেকটি তারার কথা বলবো। এ তারাটি পৃথিবী থেকে ৮.৭ আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করে। রাতের আকাশে সিরিয়াস হলো সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারা। সিরিয়াসের চারটা সাথী আছে। দূরত্বের দিক থেকে এ তারা সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে। অবশেষে যে তারার কথা বলবো সেটির নাম হলো ভেগা। পৃথিবী থেকে ২৬.৫ আলোক বৎসর দূরে ভেগার অবস্থান। সৌরজগৎ ছেড়ে মানব তৈরী প্রথম আন্তঃতারা উপগ্রহ ভয়েজার-১ এই ভেগা তারার দিকেই ছুটে চলছে। তবে ঘণ্টায় মাত্র ৪০,০০০ মাইল গতিসম্পন্ন এ উপগ্রহ ৪০,০০০ বছর ভ্রমণ করার পরই ভেগার নিকটে পৌঁছবে!

আন্তঃগ্যালাকটিক মহাশূন্য

আন্তঃতারা মহাশূন্য অতিক্রম করে আমাদের স্পেইস শীপ এবার আন্তঃগ্যালাকটিক (এক গ্যালাক্সি হতে অন্য গ্যালাক্সি) মহাশূণ্যে ছুটে চললো। নাভিগেটর রিপোর্ট করলো, আমাদের গ্যালাক্সির দুটি স্যাটেলাইট বা উপগ্যালাক্সি আছে। এগুলোর উদ্দেশ্যে আমরা এবার ভ্রমণ করছি। তবে আমাদেরকে যেহেতু বহুদূর যেতে হবে, তাই আমরা আমাদের নিজস্ব তারাজগত 'মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি'র দিকে ফিরে তাকিয়ে এটা সম্পর্কে যা কিছু জানা গেছে, সে ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করবো।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

আমাদের এ গ্যালাক্সি হলো একটি বিশেষ ধরনের তারকাজগত, যাকে বিজ্ঞানীরা স্পাইরেল (পেঁচানো) বলে খ্যায়ীত করেছেন। এর অর্থ হলো গ্যালাক্সির মধ্যে চক্রাকার একাধিক শাখা (আর্মস্) নিহিত আছে। গ্যালাক্সির আয়তন হলো ১ লক্ষ আলোক বৎসর ও এর মধ্যে অন্তত ২,০০০ কোটি তারা আছে। প্রতিটি আর্মসের মধ্যেই বেশী তারা অবস্থান করছে, আর এখানে আন্তঃতারা বস্তুও আছে যার মাধ্যমে নতুন তারা জন্মলাভ করে। গ্যালাক্সির নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রায় বৃত্তাকার যে এলাকা আছে, তার ব্যাস হলো ৫০,০০০ আলোক বৎসর। এই কেন্দ্রীয় এলাকায় সাধারণতঃ গ্যালাক্সির পুরাতন তারকাদের নিবাস।



আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একাংশ

সাগিটারিয়াস রাশিচক্রের দিকে অবস্থান করছে আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল। কেন্দ্রের মধ্যে সূর্যের একশত গুণ ওজনবিশিষ্ট একটি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ-ছিদ্র আছে বলে অনেকে ধারণা করছেন। মহাকাশে কৃষ্ণ-ছিদ্র বলতে যা বুঝায় তা-হলো, কোন কোন বিরাট আকারের তারা যখন বিস্ফোরিত হয় তাদের জীবন শেষে, তখন নিজ মহাকর্ষে এটা কলাপ্‌স হয়ে আয়তনে ছোট হতে থাকে। আয়তনে যতো বেশী ছোট হয়, এর মধ্যকার মহাকর্ষের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তারকাটি আরও কলাপ্‌স হতে থাকে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে শেষ পর্যন্ত তারাটির ওজন এবং মহাকর্ষ এতো বেশী হয়ে যায় যে, এর উপর থেকে আর কোন বস্তুই মুক্ত হতে পারে না, এমনকি আলোও না। এ কারণেই এরূপ বস্তুকে ব্ল্যাক হোল বলা হয়। এসব বস্তুকে মহাকাশের শ্মশানক্ষেত্র বলা চলে। কোন বস্তু- এমনকি একটি তারা ব্ল্যাক হোলের নিকটবর্তী হলে আর রক্ষা নেই, বস্তুটিকে তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। অনেকের মতে প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এ ধরনের একেকটি ব্ল্যাক হোল আছে।

যা হোক, আমাদের সূর্য আপাতত এ শ্মশান থেকে বহুদূরে নিরাপদে আছে! বাস্তবে সূর্য গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে ২৮,০০০ আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করছে। সমগ্র গ্যালাক্সি স্বভাবের সচরাচর নিয়মানুযায়ী মহাশূন্যে ঘূর্ণমান অবস্থায় আ'ছে, তবে একটা শক্ত অখণ্ডিত বস্তু হিসেবে নয়, অর্থাৎ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের নিকটতম তারাগুলো বাইরের দিকে অবস্থিত তারাদের তুলনায় দ্রুত প্রদক্ষিণ করে। আমাদের সূর্য ও সৌরজগতের যাবতীয় বস্তু ২২৫ কোটি বছরে গ্যালাক্সির চতুর্দিকে একবার ঘূরে আসে।

প্রিয় নভোচারী পাঠক! আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর এ কাহিনীর শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আমাদের গ্যালাক্সির দুটি উপগ্যালাক্সি বা স্যাটেলাইট (চাঁদ-গ্যালাক্সি), তারা কাষ্টার প্রভৃতি নিয়ে এবার সামান্য আলাপ করে বর্তমানে এ বিশ্ব সম্পর্কে মানুষ যেটুকু জানতে পেরেছে, আমরা সে ব্যাপারে কথা বলবো।

মেজেলানিক ক্লাউড্স

বড় ও ছোট মেজেলানিক ক্লাউড নামে দুটি উপগ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সির চতুর্দিকে ঘূর্ণমান অবস্থায় আছে। ফারদিন্যান্দ মেজেলান নামে এক-ব্যক্তি এগুলো আবিষ্কার করেছিলেন বলে তাঁর নামানুসারে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। বড় মেজেলানিক ক্লাউডের অবস্থান হলো টিউকানা নামক রাশিচক্রে। এর দূরত্ব ১,৫০,০০০ আলোক বৎসর। ছোট মেজেলানিক ক্লাউড ডরেডো নামক রাশিচক্রে অবস্থান করছে এবং পৃথিবী থেকে এটির দূরত্ব প্রায় ১,৭৩,০০০ আলোক বৎসর।



বড় মেজেলানিক ক্লাউড

এ দুটিকে ক্লাউড বললেও এগুলো মোটেই আকাশের মেঘ নয়- বাস্তবে একেকটি তারাজগত। বড় ক্লাউডের ব্যাস ৩১,০০০ আলোক বৎসর। অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলো যেতেই ৩১ হাজার বছর অতিবাহিত হয়। ছোট্ট ক্লাউডের ব্যাস (ডায়ামিটার) হলো ২৪,০০০ আলোক বৎসর। দুটি তারা সিস্টেমই আমাদের লকেল গ্রুপের সদস্য।



লকেল গ্রুপ বা আমাদের নিজস্ব স্থানীয় গুচ্ছ

আমাদের গ্যালাক্সিসহ কয়েকটি ছোট বড় গ্যালাক্সি নিয়ে একটি বিরাট তারাজগত আছে যাকে বলে লকেল গ্রুপ। এ গ্রুপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গ্যালাক্সির নাম হলো, আন্‌দ্রমেডা গ্যালাক্সি। তবে দ্বিতীয় স্থানে আছে আমাদের নিজস্ব মিল্কিওয়ে সিস্টেম। আমাদের এ লকেল গ্রুপে মোট কয়টি গ্যালাক্সি আছে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, তবে এটা যেটুকু মহাশূণ্য দখল করে আছে তার ব্যাসার্ধ হলো প্রায় ত্রিশ কোটি দুই লক্ষ ষাট হাজার আলোক বৎসর। এই গ্রুপে এ পর্যন্ত ২৯টি সদস্য আবিষ্কৃত (গ্যালাক্সি) হয়েছে। লকেল গ্রুপের ভেতর আবার দুটি সাব-গ্রুপ আছে। এর একটি হচ্ছে মিল্কিওয়ে ও অপরটি এম-৩১ (আন্‌দ্রমেডা) সাব-গ্রুপ। মিল্কিওয়ে সাব-গ্রুপের সদস্যসংখ্যা ১৪ এবং এম-৩১-এর সদস্যসংখ্যা আছে ৯টি। আমাদের এ গ্রুপের পরের গ্রুপ প্রায় দুই থেকে তিন গুণ দূরে অবস্থান করছে।

ভারগো গ্রুপ

এ গ্রুপের দূরত্ব ৫০ থেকে ৬০ কোটি আলোক বৎসর হবে। এটা একটি বিরাট আয়তনের গ্যালাক্সি-দল, এবং এতে হাজার হাজার আলাদা সদস্য আছে। ২,৫০০ সদস্য এ পর্যন্ত সনাক্ত করা হয়েছে। ভারগো গ্রুপ আসলে আমাদের লকেল সুপারগ্রুপের কেন্দ্রস্থল। গ্যালাক্সিগুলো শুধু গ্রুপ হিসেবে অবস্থান করছে না, এগুলো সুপারগ্রুপের অন্তর্গতও আছে। এ ব্যাপারে পরে আরও আলোচনা হবে। ভারগো গ্রুপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সদস্যের নাম হলো এম-৮৭। এখানে এম এর অর্থ হলো "মেসিয়ার", মেসিয়ার নামে একজন বিজ্ঞানী গ্যালাক্সিগুলোকে তালিকাভুক্ত

করেছিলেন, তাই তাঁর নামের প্রথম অক্ষর প্রতিটি গ্যালাক্সির নাম্বারের পূর্বে দেওয়া হয়ে থাকে।



মেসিয়ার ক্যাটালগের ১৬টি উজ্জ্বল সদস্য ভারগো গ্রুপে অবস্থান করছে। এই গ্রুপকে কেন্দ্র করে আমাদের লকেল গ্রুপ প্রদক্ষিণ করছে। বর্তমানে প্রতি সেকেন্ডে ২০০ কিলোমিটার বেগে আমাদের গ্রুপ এটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কমা গ্রুপ

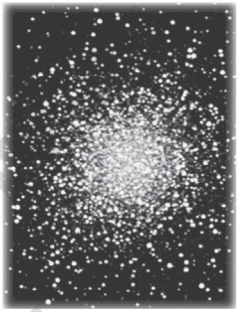
কমা বেরেনিসেস নামে নক্ষত্রপুঞ্জে এ গ্রুপের অবস্থান, এবং এতে হাজারেরও বেশী গ্যালাক্সি আছে। এটাও আমাদের কাছাকাছি একটি গ্রুপ, যার দূরত্ব প্রায় ত্রিশ কোটি আলোক বৎসর। এটা মূলতঃ আকারে গোলকের মতো, এবং বেশীরভাগ গ্যালাক্সি কেন্দ্রের নিকটে অবস্থান করছে।

আশাকরি পাঠকরা এ তিনটি গ্রুপ সম্পর্কে জানার পর মহাকাশে গ্যালাক্সি-গ্রুপ সম্বন্ধে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্বের সর্বত্র এরূপ গ্রুপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তবে একাধিক গ্রুপের সমন্বয়ে আরও কতকগুলো বিরাট আয়তনের সুপারগ্রুপ বা সুপারক্লাস্টার আছে, যে ব্যাপারে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি সুপারক্লাস্টারের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রতিটি সুপারক্লাস্টারে গড়ে বারোটা করে গালাক্সি গ্রুপ বা ক্লাসটার আছে, যদিও কোন কোনটাতে বহু বেশী দেখা যায়। এক একটা সুপারক্লাস্টারের আয়তন কোটি কোটি আলোক বৎসরের পথ।

তারা ক্লাস্টার

গ্যালাক্সির আভ্যন্তরে হাজার হাজার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোটি কোটি তারা মিলে সৃষ্টি হয়েছে একেকটি তারা কাষ্টার। দুধরণের তারা কাষ্টার দেখতে পাওয়া যায়। এর একটি হলো অপেন বা খোলা ও অপরটি গ্লোবুলার বা বৃত্তাকার।

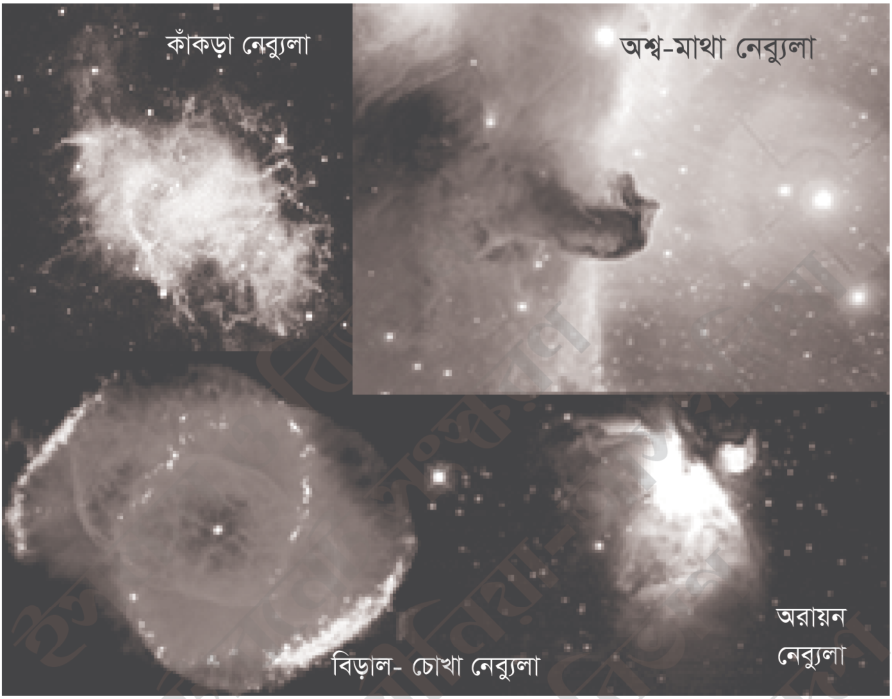


অপেন তারা ক্লাস্টার বা গ্যালাক্টিক ক্লাস্টারের তারাগুলোর বেশিরভাগই অল্পবয়সী বলে ধারণা করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় এদের জন্ম ১০ বিলিয়ন বছরের ভেতরে হয়েছে। এসব ক্লাস্টারের আয়তনও কম, গড়ে ১৫ আলোক বৎসর। সদস্যসংখ্যা ১ হাজার থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

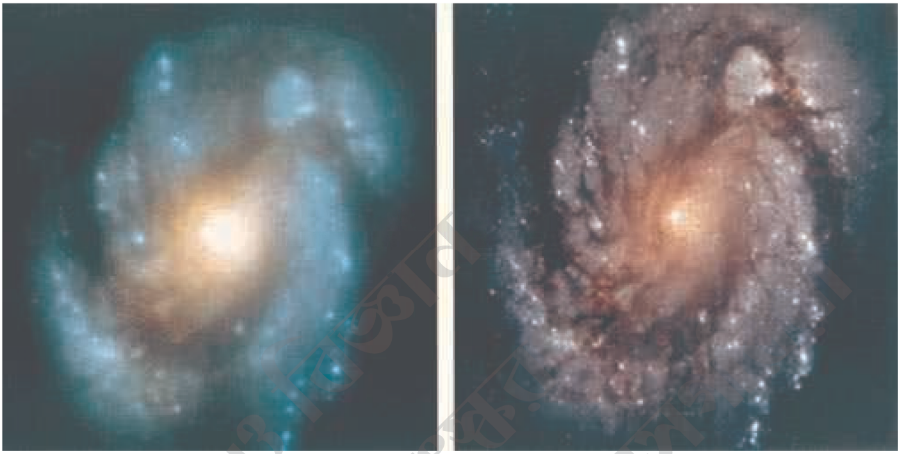
বৃত্তাকার ক্লাস্টারে লাখ লাখ বা কোটি কোটি পর্যন্ত তারা আছে। এদের প্রায় সবাই বেশ বুড়ো। কোন কোন তারা ১৫ হাজার মিলিয়ন বছর পুরাতন। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে এদের অবস্থান। আমাদের গ্যালাক্সি ছাড়াও অন্যান্য গ্যালাক্সিতে তারা ক্লাস্টার দেখতে পাওয়া যায়।

নেব্যুলা

মহাকাশে কিছু তারা ও আন্তঃগ্যালাক্টিক গুড়া পদার্থ (ডাস্ট) দেখতে পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় এসব এলাকায় নতুন তারা ও সৌরজগতের জন্ম হচ্ছে। এগুলোকে নেব্যুলা বলে। এসব নেব্যুলার মধ্যে প্রখ্যাত ক'টি হলো, হর্স-হেড নেব্যুলা (অশ্ব-মাথা নেব্যুলা), ক্যাটস-আই নেব্যুলা (বিড়াল-চোখা নেব্যুলা), অরায়ন নেব্যুলা ও ক্রাব নেব্যুলা (কাঁকড়া নেব্যুলা)।



কাল্পনিক মহাকাশ যানে বিশ্বজুড়ে আমাদের এই ভ্রমণ-কাহিনী এখানেই শেষ হতে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আশাকরি পাঠকদের জ্ঞানের পরিধি সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ আজ সত্যিই বিশ্বজগৎ ঘুরে বেড়াবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবে এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা পূর্ণতা অর্জন থেকে বহুদূরে অবস্থান করছি। বাস্তবে জ্ঞানের সূর্য শুধুমাত্র পূর্বাকাশে উদয় হয়েছে। মানুষ যেদিন মহাবিশ্বের সর্বত্র ঘুরে জ্ঞান আহরণ করবে, সৃষ্টির রহস্যকে অবলোকন করবে, সেদিনই পূর্ণতার নিকটে পৌঁছবে। সার্থক হবে স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য।



হাব্ল মহাকাশ টেলিস্কোপঃ মহাকাশে স্থাপিত হয়েছে এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল টেলিস্কোপ ‘হাব্ল’। দীর্ঘদিন যাবৎ এই টেলিস্কোপ পৃথিবীতে অসংখ্য ছবি প্রেরণ করে আসছে। একবার এটি মেরামতের প্রয়োজন দাঁড়ায়। উপরের বায়ের ছবি মেরামতের পূর্বের এবং ডানেরটি পরের। কয়েক লক্ষ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত একটি সুদৃশ্য গ্যালাক্সির ছবি এটি।

"আমিই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি শক্তিসহ এবং আমিই এটিকে ধীরে ধীরে বর্ধিত করছি" [কুরআন: ৫১ ঃ ৪৭]।

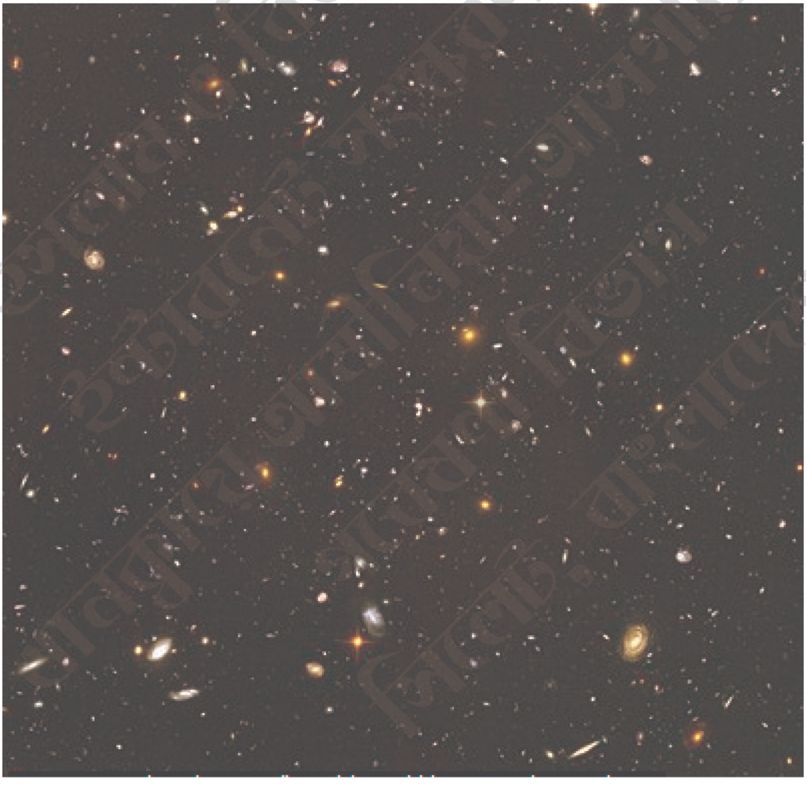
পরিচ্ছেদ ৫

বিশ্বের গঠনপ্রণালী, আয়তন ও জন্মবৃত্তান্ত

আজ থেকে ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে এ মহাবিশ্বের জন্ম হয় একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। এ থিওরীটি বিশেষ কিছু তথ্যনির্ভর কারণে বর্তমানে বিজ্ঞানমহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রথমতঃ এটা নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছে যে সমগ্র মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত চতুর্দিকে আয়তনে বৃদ্ধি হচ্ছে। আর দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের সর্বত্র একটা সমমাপের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ (কজমিক মাইক্রোওয়েভ বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন) আবিষ্কার করা হয়েছে, যা বিজ্ঞানীদের মতে ঐ প্রথম মহাবিস্ফোরণেরই একটা প্রতিধ্বনি মাত্র।

প্রতিষ্ঠিত পদার্থ বিজ্ঞানের তথ্য ও আইন-কানুন ব্যবহারের মাধ্যমে মহাবিস্ফোরণের ক্ষণকাল পর পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। সৃষ্টির ১০ লক্ষ বছর পরে জগতটা মূলতঃ উদ্যমে পূর্ণ অণু-পরমাণুর তৈরী একটি বল আকারের অগ্নিকাণ্ড ছিলো, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় "প্লাজমা" বলা হয়। এ সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বের তাপমাত্রা কোটি কোটি ডিগ্রী থেকে ৩,০০০ ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসে। এর ফলে প্রটোন ও ইলেকট্রন কণা মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে জগতের বিকিরণ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। বস্তুর ঘণত্ব তখন বিকিরণ থেকে বেশী হয়, যা ইতোমধ্যে এর উল্টো অবস্থায় ছিলো। এতে বিশ্বের বিস্তৃতি নিয়মমতো হতে থাকে। বর্তমানে যে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ দেখা যায় তা হলো ঐ প্রাথমিক অবস্থার একটি ঠাণ্ডা অবস্থা, অর্থাৎ ঐ বিকিরণ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, যার মাত্রা এখন ৩ ডিগ্রী কেলভিন।

প্রথম গ্যালাক্সিগুলো একশত থেকে দুইশত কোটি বছর পরে সৃষ্টি হওয়া শুরু করে, এবং মহাবিস্ফোরণের গতিতে চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে। এ "ছিটকে পড়া" অবস্থাটি এখনও অব্যাহত আছে, তবে এর গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা সুদূর ভবিষ্যতে একদা এ গতি সম্পূর্ণরূপে শূন্যের কোটায় পৌঁছে যাবে এবং মহাকর্ষের ফলে বিশ্বটা উল্টো গতিতে (ভেতরের দিকে) ছুটে চলবে। এর ফলে মহাবিশ্ব দিন দিন আয়তনে ছোট হতে থাকবে ও একদা আরো একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে শূন্যতে পরিণত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।



হাব্‌ল ডীপ স্পেইস: উপরের ছবিটি মহাকাশে স্থাপিত স্পেইস টেলিস্কোপ 'হাব্‌ল' ধারণ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার জায়গার প্রতি টেলিস্কোপের ফোকাস দীর্ঘ সময় স্থির রেখে এই ছবি তোলা হয়। এতে পরিষ্কার

দেখাচ্ছে, দূরবর্তী অসংখ্য তারাসিস্টেম বা গ্যালাক্সি। এই ছবি প্রমাণ করে মহাবিশ্বের বিরাটত্ব সত্যিই অত্যাশ্চর্য।

জগতজুড়ে কোটি কোটি তারাজগৎ বা গ্যালাক্সি আছে। তবে গ্যালাক্সিগুলো সাধারণতঃ গুচ্ছবদ্ধভাবে অবস্থান করছে, অর্থাৎ একাধিক গ্যালাক্সি তাদের সম্মিলিত মহাকর্ষের আওতায় থেকে ঘূর্ণমান হয়ে চলছে। বহু গুচ্ছবদ্ধ গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে, তবে এ প্রসঙ্গে তিনটি কাছাকাছিতে অবস্থিত গুচ্ছ বা গ্রুপের কথা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

কজমোলজি

যে বিজ্ঞানের শাখা বিশ্বের সার্বিক গঠনপ্রণালী ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে তাকে বলে কজমোলজি। যেমনঃ কিভাবে তারা ও গ্যালাক্সিগুলো মহাকাশে গুচ্ছবদ্ধভাবে অবস্থান করছে, তারাগুলোর জন্ম-মৃত্যুর রহস্য কি, জগতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাস ও শেষ পরিণতিই বা কি- এসব মৌলিক প্রশ্নের সমাধানকল্পে যে বিজ্ঞান গবেষণা চালাচ্ছে সেটাই হলো কজমোলজি। বাস্তবে কজমোলজি শব্দটি কজমোজ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো- মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্র-তারা-গ্যালাক্সি ইত্যাদি। তবে কজমোলজি যদিও মূলত বিশ্বের বড় আয়তনের বস্তু নিয়ে গবেষণা করে তথাপি এর সঙ্গে পার্টিকেল ফিজিক্স বা পরমাণু বিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে। কজমোলজিষ্টরা বিভিন্ন থিওরী প্রস্তুত করতে পরমাণু বিজ্ঞানের তথ্য অহরহ ব্যবহার করেন।

কজমোলজিষ্টরা যে বিষয়টি নিয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকেন তা হলো গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ। সমগ্র জগতব্যাপী বিরাট বিরাট দূরত্বেও এই ফোর্সটি ক্রিয়াশীল আছে। বলতে গেলে এই ফোর্সই জগতকে অস্তিত্বশীল রেখেছে। সুতরাং কজমোলজি হচ্ছে এই মহাকর্ষ ও বস্তু এবং এনার্জির উপর এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা। গত শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখিয়েছেন বস্তু ও এনার্জি বাস্তবে একই জিনিষের দুটি রূপ। তিনি তাঁর প্রখ্যাত সমীকরণ [$E=mc^2$] দ্বারা বস্তু থেকে এনার্জি ও এনার্জি থেকে বস্তুতে পরিণত করার পথ উন্মুক্ত করেছেন। যেমন তারাগুলো হচ্ছে,

বাস্তবে একেকটি উচ্চ তাপমাত্রাসম্পন্ন আনবিক চুল্লী যেখানে বস্তু (অণু-পরমাণু) বদলে এনার্জি (উদ্যম) হচ্ছে। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ বিষয়ক থিওরী (জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি- **১৯১৭** সালে প্রকাশিত) থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, মহাকর্ষ মূলতঃ চতুর্থ বিস্তৃতিসম্বলিত স্থান-কাল ধারাবাহিকতায় ঘোমরা হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বস্তু এই ঘোমরা বা বাঁকাকরণের জন্য দায়ী।

কজমোলজিক্যাল থিওরী

বর্তমানে বিজ্ঞানমহলে জগতসৃষ্টির একটি থিওরী সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এই থিওরীটি হলো, বিগ বেং থিওরী- বাংলায় বলা যায় মহাবিস্ফোরণ থিওরী। ইতোমধ্যে এ নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছি। এই থিওরী সবার কাছে আস্থাবান হওয়ার পেছনে ক'টি কারণ আছে।

১৯৩৮ সালে হেন্‌স বেধ নামক এক পদার্থবিদ বুঝিয়ে দেন, কিভাবে নিউক্লিয়ার ফিউশন (আনবিক ফিউশন রিয়েকশন সম্পর্কে ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) তারাগুলোকে জ্বলন্ত রাখছে। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে পদার্থ তারার ভেতরের অগ্নিকাণ্ডে পাক করা হয় এবং কিসব কারণে তারাদের মধ্যে বিভিন্ন রং ধরে- তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। এছাড়া ইতোমধ্যে এটা জানা হয়ে গিয়েছিল যে, বিশ্বের সকল তারা সৃষ্টির সাথে সাথেই আত্মপ্রকাশ করে নি। বাস্তবে তারার জন্ম ও মৃত্যু ঘটছে এবং নতুন তারা জন্মও নিচ্ছে। পদার্থবিদ জর্জ গামো চল্লিশের দশকে বলেন, কোন এক সময় এই সমগ্র মহাবিশ্ব হয়তো এমন উত্তপ্ত ছিলো যে, এর মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে নতুন ইলেমেন্ট বা মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছিলো। তিনি আরও বলেন, প্রথামিক অবস্থায় নিশ্চয়ই এই মহাবিশ্ব একটি বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারণা থেকে তিনি সেই বিস্ফোরণের কোন সাক্ষর বা রেডিয়েশন এখনও থাকার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানমহলে তাঁর এসব ধারণা অতি অল্পই প্রভাব ফেলে। অনেকে এটাকে বিগ বেং 'অপপ্রলাপ' বলে আখ্যায়িত করেন।

গামোর ধারণা প্রকাশের দুই দশকের মধ্যেই কিন্তু সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ১৯৬৫ সালে উইলসন ও পেনজিয়াজ নামক দুই যুবক বিজ্ঞানী একটি রেডিও এরিয়েলে কাজ করছিলেন। এটা সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইটে ব্যবহার করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। পরীক্ষা-নীরিক্ষার সময় বিজ্ঞানীদ্বয় হঠাৎ এই এরিয়েলের মাধ্যমে একটি ইতোমধ্যে অজানা ফিঁসফিঁস রেডিও সিগন্যাল আবিষ্কার করেন। এটা সবদিক থেকে আসছিলো। এই সিগন্যালই শেষ পর্যন্ত গামোর ধারণাকৃত সেই বিগ বেং বা মাহবিস্ফোরণের সিগন্যাল বলেই সনাক্ত করা হয়। এর পর থেকেই বিগ বেং থিওরী নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরাট সাড়া জাগে। এখন এই থিওরিটিই হচ্ছে আধুনিক কজমোলজির ভিত্তি।

মহাবিস্ফোরণ থিওরী

মহাবিস্ফোরণ বা বিগ বেং থিওরী মূলতঃ অতি সহজ একটি বিশ্বতত্ত্ব। বিংশ শতকের শুরু থেকেই এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য সবার জানা হয়ে যায়। বিশেষকরে জগতের বিভিন্ন দূর-দূরান্তের বস্তু থেকে আগত লাইট সিগন্যাল ছাড়াও এক্স-রে সিগন্যালের মাধ্যমে অনেক অদ্ভুত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কথা বিজ্ঞানীরা জানতে থাকেন। তারা আবিষ্কার করেন পাল্‌সার (যে তারা থেকে খুব দ্রুত স্পন্দন বা পাল্‌স আসতে থাকে), নিউট্রন তারা (সমগ্র তারটি এককেটি নিউট্রন দ্বারা সৃষ্ট), সুপারনোভা (যে তারা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়), কোয়াইজার (কোয়াইজি ষ্টেলার রেডিও অবজেক্ট- অচিন্তনীয় এনার্জিসম্পন্ন দূরতম তারা) ইত্যাদি।

এসব বস্তু নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের এই ধারণা জন্মিল যে, বাস্তবে হয়তো কোন অজানা শক্তির কারণে এই মহাবিশ্ব যিরো থেকে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে নতুনভাবে অনুসন্ধান শুরু হলো এবং শেষ পর্যন্ত বিগ বেং থিওরী-কে পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। পাঠকদের জানিয়ে রাখা জরুরী যে, নিম্নে বর্ণিত অত্যাধুনিক এই থিওরিটি আমার মতে ফাইনেল নয়। অর্থাৎ অভিষ্যতে এই থিওরী হয়তো বদলে যেতেও পারে। সুতরাং বিজ্ঞানের সবকথার মতো এটাকেও মহাসত্য হিসেবে বিশ্বাস করার কোন উপায় নেই।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত যে এই মহাবিশ্ব ১২ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিস্ফোরণকে বৃটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল পঞ্চাশের দশকে বিগ বেং নামকরণ করেছিলেন। সেই থেকে এই ঘটনাকে বিগ বেং থিওরী বলে আখ্যায়িত করা হয়ে আসছে। তবে উল্লেখ্য যে, হয়েল বাস্তবে এই থিওরীতে বিশ্বাসী ছিলেন না- তিনি এই কথাটি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। হয়েলের নিজস্ব একটি থিওরী ছিলো যা শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানমহলে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কথাটি শেষ পর্যন্ত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ থিওরিতে রূপান্তরিত হলো। কি আশ্চর্য!

বাস্তবে মহাবিস্ফোরণ কোন বিস্ফোরণ ছিলো না- আসলে স্বয়ং স্থান-কালই এসময় জন্ম নেয়। বিস্ফোরণের অতি নিকট-ক্ষণকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা গণিতের মাধ্যমে গবেষণা করতে সক্ষম কিন্তু ঠিক যিরো সময়ে কি হয়েছিল সেটা জানতে অপারগ। সময় = যিরো হলেই সমীকরণ ফেল করে বসে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব কেন বিস্ফোরিত হয়ে জন্ম নিয়েছে সে প্রশ্নের জবাব কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কোন মহাশক্তি এর পেছনে কাজ করেছে তা অবশ্য ঈমানদারদের জানা আছে। যা হউক, এবার আধুনিক বিজ্ঞান এই বিস্ফোরণের ক্ষণকাল পর থেকে আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে কি বলে তা তলিয়ে দেখা যাক।

বিস্ফোরণের $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড (এখানে এই সংখ্যাটি এক সেকেন্ডের কোটি কোটি অংশের এক অংশ বুঝাচ্ছে!) পরই স্থান সবদিকে বিস্তৃত হওয়া শুরু করে। এই সময়ের ভেতর বস্তু বা মেটার বলতে যা বুঝায় তা মূলত নিষ্কলুষ এনার্জি বা উদ্যম ছিলো। এই অবস্থা $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড থেকে $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। এসময়ও স্বভাবের মৌলিক যে চারটি আইন আছে তার আলাদা অস্তিত্ব ছিলো না। এ সময়কে গ্রাণ্ড ইউনিফিকেশন ইপোক (বাংলায় তরজমা করা যায়ঃ মৌলিক শক্তির পুর্ণাঙ্গ একত্রিত কাল।) বলা হয়। অর্থাৎ চারটি ফোর্স মিলে একটি ফোর্স ছিলো। বস্তু ও এনার্জি একত্রে সমভাবে বিরাজ করছিলো। এসময় তাপমাত্রা ছিলো $১০^{২৭}$ কেলভিন (১০ এর পরে ২৭টি শূন্য লিখলে যে বিরাট সংখ্যা হয়)। এই তাপমাত্রা থাকার সময় বিশ্বটির মধ্যে পরিবর্তন আসে। চার ফোর্সের মধ্যে ষ্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স (শক্তিশালী আনবিক শক্তি) আত্মপ্রকাশ করে আলাদা হয়ে যায়। এই ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিরাট অংকের এনার্জি বিরিকণ হয়। এর পরমুহূর্তে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাকে

বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন, ইনফ্লেশন বা স্ফীতিকরণ অবস্থা। এই স্ফীতিকরণের মাধ্যমে খুব দ্রুতগতিতে সমগ্র বিশ্বটি বিস্তারলাভ করে। মাত্র $১০^{-৩৩}$ সেকেন্ডের মধ্যে জগতটা $১০^{৫০}$ (১০ এর পরে ৫০টি শূন্য যোগ দিলে যে বিরাট নাম্বার হয়) গুণ বিস্তৃত হয়। ইনফ্লেশন পিরিওড পরে সবকিছু অনেকটা শান্তময় হয়ে ওঠে। তবে বিস্তৃত হওয়া বন্ধ হয়নি- এখনও তা হচ্ছে।



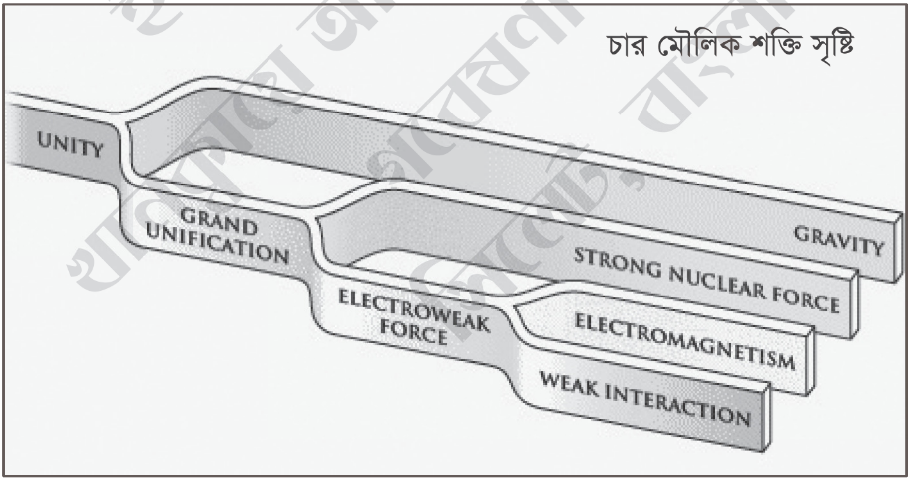
মহাবিশ্ব সৃষ্টি মুহূর্ত?

স্থান বাড়ার সাথে সাথে বিশ্বের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। বিস্ফোরণের মাত্র এক সেকেন্ড পরই মৌলিক পরমাণূ- প্রটোন, কুয়ার্ক, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদি

আলাদাভাবে অস্তিত্বলাভ করে। জন্মের এক বিলিয়ন বছর পরে আজকের আয়তনের এক-পঞ্চমাংশ আয়তনবিশিষ্ট ছিলো এই মহাবিশ্ব।

ইনফ্লেশন কাল পরে আসে পার্টিকেল সৃষ্টির কাল। বিজ্ঞানীরা এ সময়কার ১২টি মৌলিক পরমাণুর কথা বলেছেন। এগুলো কুয়ার্ক ও লেপটন জাতীয় বস্তু। কুয়ার্ক হচ্ছে পরমাণু প্রটোন ও নিউট্রন তৈরীর মৌলিক মাল-মসলা। অপরদিকে লেপটন দ্বারা সৃষ্টি হয় ইলেকট্রন। লেপটন থেকে নিউট্রিনো নামক আরেক পার্টিকেল সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন। এই নিউট্রিনো জগতের সর্বত্র বিদ্যমান আছে। বর্তমানে এগুলোকে জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

জগতসৃষ্টির $১০^{-১২}$ সেকেন্ড অতিবাহিত হওয়ার পর ইলেকট্রমেগন্যাটিক (বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয়) ফোর্স ও দুর্বল আনবিক ফোর্স আলাদা হয়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে জানা চারটি ফোর্স আলাদাভাবে বিরাজ করতে থাকে। দুর্বল শক্তিটি যা রেডিওএকটিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়ার জন্য দায়ী এবং তা অত্যন্ত অল্প দূরত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল। অপরদিকে বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি থেকেই সৃষ্টি হয় বিদ্যুত, চুম্বকের ক্রিয়া, আলো, রেডিও সিগন্যাল, এক্স-রে ইত্যাদি। উল্লেখ্য তখনও এটম সৃষ্টি হয়নি।



চার মৌলিক শক্তি সৃষ্টি

এটম ও তার নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র) সৃষ্টি হয় জগতসৃষ্টির ১ সেকেন্ড পর থেকে। তবে প্রথমতঃ শুধুমাত্র ডিউটেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন), হিলিয়াম এবং লিথিয়াম সৃষ্টি হয়। এই সময়কে বলে নিউক্লিওসিনথেসিস বা নিউক্লিয়াস-সংশ্লেশন কাল। দীর্ঘ ১০০ সেকেন্ড পর্যন্ত এ কালটি স্থায়ী ছিলো। উল্লেখ্য সাধারণ হাইড্রোজেনে নিউক্লিয়াস সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো না- কারণ, এটা আগে থেকেই সৃষ্ট ছিলো!

১০০ সেকেন্ড পরে তাপমাত্রা এ পরিমাণে নেমে আসে যে, নিউক্লিয়াসে প্রটোন ও নিউট্রন একত্রে অবস্থান করতে থাকে। ফটোন নামক পার্টিকেল এদের ছিটিয়ে ফেলতে শেষ পর্যন্ত অক্ষম হয়। এর ফলে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন এটম স্থিতিশীল হয়।

প্রটোন ও নিউট্রন এটম, ৩ লক্ষ বছর পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। বাস্তবে এ সময় পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বটা একত্রে একটি নিউক্লিয়ার পরমাণুর সুপ ছিলো। কিন্তু ৩ লক্ষ বছর পরে তাপমাত্রা ৩,০০০ কেলভিনে নেমে আসে। এই সুযোগে ফটোন নামক পার্টিকেল ফ্রি হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই ফটোন থেকেই সৃষ্টি হয় কজমিক বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন- যে বিকিরণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। দুই যুবক বিজ্ঞানী ১৯৬৫ সালে এই রেডিয়েশনই আবিষ্কার করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ৩,০০০ ডিগ্রী থেকে এই রেডিয়েশন মাত্র ২.৭৩ কেলভিনে (মাইনাস ২৭০.৪৩ সেলসিয়াসে) নেমে আসে। তবে কজমোলজিস্টরা এই রেডিয়েশনকেই বিগ বেং বা মহাবিস্ফোরণের স্বাক্ষর সিহেবে সাব্যস্ত করেছেন।

এই কাল থেকেই তারা ও গ্যালাক্সি সৃষ্টির সূচনা হয়। এটমগুলোর মধ্যে মহাকর্ষের ফলে সৃষ্টি হয় একত্রে জড়িত অসংখ্য গ্যাস ক্লাউড (মেঘখণ্ড)। একদিকে যেহেতু বিশ্বটা দ্রুত বর্ধিত হচ্ছিলো তাই বস্তুর ঘনত্বও পাতলা থেকে পাতলা হতে থাকে। এর ফলে উক্ত ক্লাউডগুলো পাতলা বস্তুকে নিজের দিকে শক্তভাবে আকর্ষণ করতে থাকে এবং প্রতিটি ক্লাউড বড় থেকে বড়-ও হতে থাকে। এরপর এই ক্লাউড তার নিজের মহাকর্ষের ফলে কলাপ্‌স হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ও গ্যালাক্সি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সৃষ্টির এক বিলিয়ন (১০০ কোটি বছর) পরে প্রাথমিক তারা ও গ্যালাক্সিগুলোর জন্ম হয়।

আধুনিককালে সেই প্রাথমিক গ্যালাক্সিগুলো দেখার এক অভিনব টেকনিক আবিষ্কৃত হয়েছে। জগত সৃষ্টির ১২ কিংবা ২০ বিলিয়ন বছর পর সেই বেবী গ্যালাক্সিগুলো এখনও দেখা যায় কিভাবে? এটাতো বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়- কারণ, সেই গ্যালাক্সিগুলো তো এখন আর নেই! এগুলো দেখার প্রশ্নই তো অবাস্তব! মোটেই নয়। একটু পরই এ সম্ভাবনার কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সেকালের গ্যালাক্সি দেখার সম্ভাবনার পেছনে যে জিনিসটি কাজ করে সেটা হচ্ছে আলো। কোন বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পতিত হলেই আমরা সে বস্তুটি দেখতে পাই। তাহলে একবছর পূর্বে যদি কোন বস্তু থেকে আলো আসা শুরু করে, আর এই আলো তথা 'আলোর মধ্যে ধারণকৃত বস্তুটির ছবি' আমরা এখন দেখি, তাহলে বাস্তবে এক বছর পূর্বের সেই বস্তুটি যেভাবে ছিলো ঠিক সেভাবেই এটাকে আমরা দেখছি। একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে সূর্য। সূর্য আমরা আকাশের যে স্থানে দেখি আসলে তা সে স্থানে নয়। সূর্য থেকে আলো আসতে ৮ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের পরই যখন আমরা সূর্যকে দেখি তখন কিন্তু সূর্যটি কিছুটা ঊর্ধ্বাকাশে পৌছে গেছে। অর্থাৎ আসল অবস্থান সর্বদাই অপর জায়গায়- এই সঠিক জায়গায় সূর্যকে দেখার কোন উপায় নেই। আট মিনিট আগে যেখানে ছিলো সেখানে তাকে আমরা দেখি। ঠিক এভাবে একটি তারা যদি ১০ আলেক বৎসর (আলো আসতে দশ বছর সময় লাগে) দূরে অবস্থান করে, তখন আজ এটাকে যখন আমরা দেখলাম- এর অর্থ দাঁড়ায়, বাস্তবে দশ বছর আগে এটা এই স্থানে ছিলো, সেই ছবি আমাদের চোখে এসে পৌঁছেছে। এই জগতে কোন কোন বস্তু আছে যাদের আলো কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীপানে আসা শুরু করে। এখন এসে পৌছে কোটি কোটি বছর পূর্বের সেই বস্তুটির ছবি আমাদের চোখে কিংবা টেলিস্কোপে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সেই অতীতের বস্তুটিকেই আমরা আজ দেখছি। বস্তু 'এখন' সেখানে তো নেই-ই বরং তার অস্তিত্ব বর্তমান আছে কি-না সেটাও আমাদের জানা নেই!

বস্তু থেকে শুধুমাত্র আলো বিকিরণ হয় না। এসাথে থাকে ইনফ্রারেড, এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি রেডিয়েশন। এগুলোও আলোকের গতিতে চলে। সুতরাং সঠিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এসব রেডিয়েশন থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সুদূর অতীতের বস্তুগুলো সম্পর্কে অনেককিছু জানা সম্ভব।

কিছুদিন পূর্বে মহাকাশে প্রেরিত হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ দ্বারা আজ থেকে ১২ বিলিয়ন বছর পূর্বের অনেক গ্যালাক্সির বেশ কিছু ছবি ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলোর এসব ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা জগতসৃষ্টির কিছুকালের পরের প্রাথমিক অবস্থায় গ্যালাক্সির স্বরূপ নিয়ে গবেষণা চালাতে পারছেন। কুয়াইজার নামক একটি বস্তু আবিষ্কার করা হয়েছে যার দূরত্ব বিলিয়ন বিলিয়ন আলোক বৎসর। অনেকের ধারণা এসব বস্তু বাস্তবে অল্পবয়সী জগতের প্রাথমিক গ্যালাক্সি।

জগতের মৃত্যু

আমরা জানি জগতের ধ্বংস হবে আল্লাহর নির্দেশে। যে কোন মহূর্তে এই নির্দেশ আসতে পারে। মূলতঃ শিঙ্গায় ফুঁৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক যদি প্রাকৃতিক চারটি ফোর্স তুলে নেন তবে সব বস্তু তুলার মতো উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মাত্র কয়েক মুহূর্তে। তবে বিজ্ঞানীরাও এ মহাবিশ্বের একদিন যে মৃত্যু বা ধ্বংস হবে তা মেনে নিয়েছেন। তাদের সৃষ্ট সেই বিগ বেং থিওরীই এই মহামৃত্যুর কথা বলেছে। সুতরাং এবার দেখা যাক এ মহাবিশ্ব কিভাবে ধ্বংস হবে সে ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলে।



মহাবিশ্ব ধ্বংসের মুহূর্ত?

বিগ বেং থিওরীর মতে এ মহাবিশ্ব কোন একদিন চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়া থেকে বিরত হয়ে যাবে। এরপর বিশ্বের কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে সবকিছু আবার সেই কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হবে। অর্থাৎ তখন বিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো উল্টোদিকে ছুটে সমগ্র বিশ্বকে ছোট থেকে ছোট করতে থাকবে। কালে মহাবিশ্ব একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে আবার শূন্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ সবকিছু আবার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে যেমনটি সৃষ্টির আগে ছিলো। এই ধ্বংস হওয়ার ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা 'বিগ ক্রান্‌চ' [মহাপ্রলয়] বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ জগত শুরু হয়েছে বিগ বেং এর মাধ্যমে এবং ধ্বংস হবে বিগ ক্রান্‌চের দ্বারা। ক্রান্‌চ হচ্ছে বিস্ফোরণের বিপরীত ক্রিয়া।

এভাবে বিশ্বটা ধ্বংস হওয়ার জন্য এ মহাবিশ্বের বস্তুর পরিমাণ পর্যাপ্ত হতে হবে। কারণ জগতের বিস্তৃতিকে থামানো ও একে আবার ভেরতের দিকে ধাবিত করার জন্য যে শক্তিটি ক্রিয়াশীল হবে তা হলো মহাকর্ষ। আর মহাকর্ষের শক্তির পরিমাণ বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বস্তু যতো বেশী হবে এই শক্তিও ততো প্রভাবশালী হবে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মহাকাশে যতোটি গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন তা এই ক্রিয়া সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ বর্তমানে জানা সকল বস্তুর সমন্বয়ে যে মহাকর্ষ আছে তা জগতকে থামিয়ে উল্টোদিকে ধাবিত করার জন্য অপর্যাপ্ত। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, বাস্তবে এ বিশ্বের এক বিরাট অংকের বস্তু আমরা এখনও সনাক্ত করতে পারি নি। তাদের ধারণা এই ডার্ক বা অদৃশ্য মেটার এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এগুলো আবিষ্কার হলেই এটা নিশ্চিত হবে যে, এই মহাবিশ্ব সত্যিই একদিন বিগ ক্রান্‌চের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে বিজ্ঞানের হিসেব মতে এই ঘটনাটি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে। কেউ কেউ বলেছেন, জগতটি আসলে মধ্যম বয়সে পৌঁছেছে। আরও ১২ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর পরই তা ধ্বংস হবে। কিন্তু এ কথাটি কার্যকারণ নীতি বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বস্তুজগতের নেচারেল আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বাস্তবে কোন অদৃশ্য শক্তি যদি এই মুহূর্তে মৌলিক চারশক্তির কোন একটিকে কিছুটা হেরফের করে বসে, তাহলে জগতটি ধ্বংস হয়ে যেতে খুব বেশী সময় অতিবাহিত হবে না। কারণ, সব মিলে যে একটি বিরাট ব্যালান্স সৃষ্টি হয়েছে তার উপর আঘাত হানা হবে।

সুতরাং এ মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে আরও ১২-২০ বিলিয়ন বছর পর, এ কথাটি বৈজ্ঞানিক আরেকটি ধারণা মাত্র। তাই ইতিহাসব্যাপী পরিবর্তনশীল 'মতবাদ' বা 'ধারণাভিত্তিক'

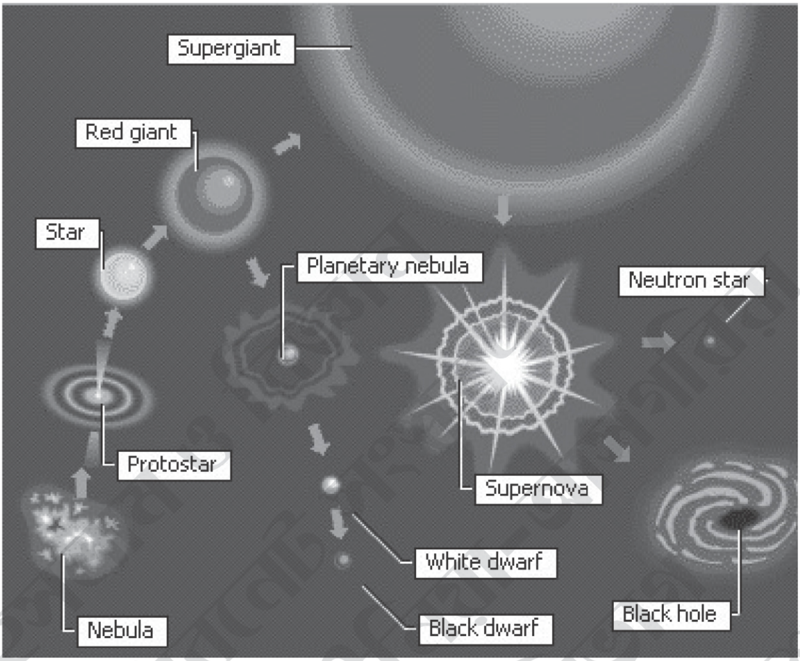
তথ্য হিসেবেই এ কথাটিকে গ্রহণ করা হবে আমাদের জন্য অনেকটা নিরাপদ। অর্থাৎ উক্ত মতবাদ চূড়ান্ত মহাসত্য নয়।

ডার্ক মেটার বা বস্তু বলতে যদি কিছু থাকে না, কিংবা জগতকে থামিয়ে মহাকর্ষ যদি এটাকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয় তবে অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে? বিজ্ঞান বলে হয়তো সেক্ষেত্রে এই মহাবিশ্ব অনন্তকালের জন্য বিস্তৃত হতে থাকবে। এছাড়া কেউ কেউ বলেন, হয়তো এক পর্যায়ে জগতের বিস্তৃতি থেমে যাবে কিন্তু ভেতরের দিকে পতিত হয়ে এর আয়তন আর কমে আসবে না। অর্থাৎ একই আয়তনবিশিষ্ট হয়ে তা চিরকাল থেকে যাবে।

আমার ধারণা এসব কথা মূলত ভিত্তিহীন। বিগ ক্রান্‌চের অবস্থা না হলেও জগতটি যে একদিন ধ্বংস হবে তা অবশ্য নিশ্চিত। এর কারণ হলো স্বভাবের আইন কানুন রদবদল হওয়া সম্ভব। সুতরাং মহাকর্ষ যদি বদলে যায় কিংবা অন্যান্য মৌলিক শক্তি যদি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে তবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনিবার্য হবে। এছাড়া দার্শনিক দিক থেকেও ভাবলে বলতেই হয়, যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যুও অনিবার্য। এটা এ মহাবিশ্বের একটি সচরাচর নিয়ম।

তারার মৃত্যু

সমগ্র জগতের মৃত্যু একদিন হবে- তা যতো সুদূর ভবিষ্যতে হউক কিংবা যে কোন মুহূর্তেই হোক। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক চূড়ান্ত কোন তথ্য এখনও জানা যায় নি। বিভিন্ন থিওরী বা ধারণা তো অবশ্যই আছে। মহাবিশ্বের জন্মমৃত্যুর রহস্য চূড়ান্তভাবে জানা না গেলেও তারাগুলোর যে জন্ম এবং মৃত্যুও আছে তা আজকের বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবে একাধিক তারার মৃত্যুর মুহূর্ত আমরা দেখতে পেরেছি। আমাদের এই গ্যালাক্সিতেই গড়ে প্রতি দশ বছর পর পর একটি করে তারার মৃত্যু ঘটছে। তারা কোনটি কতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। এগুলো হলো আয়তন, ম্যাস (বস্তুর পরিমাণ বা ওজন), কোন কোন কেমিক্যাল দ্বারা তৈরী হয়েছে এবং তার তাপমাত্রা।



আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তারাজীবনঃ নেব্যুলায় জন্ম; তারাপূর্ব স্তর (প্রটোস্টার); তারা স্তর (স্টার); যদি যথেষ্ট ওজনসম্পন্ন হয়ঃ সুপারবড়ো (সুপারজায়ান্ট) - সুপারবিস্ফোরণ (সুপারনোভা) - নিউট্রন তারা (নিউট্রন স্টার) কিংবা কৃষ্ণ গর্ত (ব্ল্যাক হোল); যথেষ্ট ওজনসম্পন্ন না হলেঃ গ্রহসদৃশ নেব্যুলা (প্লানেটারী নেব্যুলা) - সাদা বামন (হুয়াইট ডর্ফ) - কালো ডর্ফ (ব্ল্যাক ডোর্ফ)।

তারার মৃত্যুর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে এর জ্বালানী সাপ্লাই। উনুনে লাকড়ী শেষ হয়ে গেলে যেভাবে আগুন নিভে যায় ঠিক তদ্রূপ কোন একদিন তারার ইন্ধন হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ হবে। আর তখনই এই তারা নিভে যাবে। এই নিভে যাওয়ার নামই হচ্ছে তারার মৃত্যু। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, সব তারাই একদা নিভে যাবে সত্য কিন্তু কোন কোনটা নিভে যাওয়ার সময় এক প্রচণ্ড তাণ্ডব ঘটায়। পুরো তারাটি এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে চতুর্দিকে তার বস্তু ছড়িয়ে দেয়। এতে সমগ্র গ্যালাক্সিটা আলোকিত হয়ে ওঠে। তারা এভাবে বিস্ফোরিত হওয়াকে বলে সুপারনোভা। আমাদের গ্যালাক্সিতে একাধিক সুপারনোভা দেখা গেছে। এই

বিস্ফোরণের মাধ্যমে তারাটির ৯০% বস্তু চতুর্দিকের মহাকাশে ছিটকে পড়ে। বাকী থাকে একটি ছোট্ট আয়তনবিশিষ্ট তারা যার তাপমাত্রা কমতে কমতে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন আর এই কৃষ্ণপ্রায় বস্তুকে দেখা যায় না। এটা একটি মৃত তারায় রূপান্তরিত হয়।

এবার দেখা যাক আমাদের নিকটতম তারার মৃত্যু কবে কিভাবে হবে। আমাদের এ তারাটি অবশ্য সূর্য। বিজ্ঞানের মতে আজ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন (পাঁচ হাজার মিলিয়ন বা পাঁচশ কোটি) বছর আগে সূর্যসহ এ সৌরজগতের জন্ম হয়। সূর্যটি হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল। সমগ্র সৌরজগতের ৯৯% ওজন বা বস্তু এই সূর্যের মধ্যেই নিহীত। মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীসহ সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহগলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এ উজ্জ্বল জ্বলন্ত বিশাল বস্তুটি আসলে কি?

সূর্য হচ্ছে বিশ্ব জগতের আরোও অগণিত তারাদের মতো একটি হলুদ বর্ণের জ্বলন্ত তারকা। এতে সিংহভাগ হাইড্রোজেন পদার্থ আছে। মহাকর্ষের প্রচণ্ড চাপে ও উচ্চতাপে সূর্যের ভেতরে আনবিক স্কেলে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়েকশন বা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সূর্যের ভেতরের তাপমাত্রা ৬ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আনবিক এ রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন ক্ষয় হচ্ছে ইন্ধন হিসেবে। অর্থাৎ সূর্যকে জ্বলন্ত রাখতে যে পদার্থ ব্যবহার হচ্ছে তার মাত্রা দিন দিন কমে আসছে। অবশ্য এ প্রক্রিয়া সূর্যের জন্ম থেকেই সংঘটিত হচ্ছে।

সূদীর্ঘ ৫০০ কোটি বছর ধরে হাইড্রোজেন পুড়ে কিন্তু শেষ হয়নি। আনবিক চুল্লীতে অল্প বস্তুই অনেক এনার্জি বা উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের নিকটতম তারা এ সূর্যটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আনবিক রিকেশনের মাধ্যমে সূর্যটি জ্বলন্ত না থেকে যদি স্বাভাবিকভাবে পুড়তো, তবে মাত্র কয়েক হাজার বছর পরই হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক অপূর্ব কৌশলে সূর্যকে আনবিক রিয়েকশনের মাধ্যমে জ্বলন্ত রেখে এর জীবন সুদীর্ঘ করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ ও অনুগ্রহের বিকাশ।

তবে সূর্যের ইন্ধন বা জ্বালানী হাইড্রোজেন যে চিরকাল স্থায়ী থাকবে না, তা আমাদেরকে আজ বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে। যদিও সূর্যটি সম্ভবত তার জীবনের অর্ধেক

সীমায় পৌঁছেছে মাত্র, তথাপি এটা যে একদা ধ্বংস হবে তা নিশ্চিত। বিজ্ঞান আমাদেরকে ধ্বংস হওয়ার তারিখ সুদূর ভবিষ্যতে বলে, কিছুটা সুস্থির করেছে! আজ থেকে আরো ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্যের ভেতর আনবিক রিয়েকশন শেষ হবে। তখন এটা চতুর্দিকে বেড়ে যেয়ে এমনকি পৃথিবীকে পর্যন্ত তার ভেতরে নিয়ে যাবে। কেউ যদি সেদিন বেঁচে থাকে, তখন সে দেখতে পাবে সূর্যটা সত্যিই তার মাথার উপর অবস্থান করছে। সূর্যের এই অবস্থাকে বলে রেড জায়ান্ট। অর্থাৎ সূর্যের মৃত্যুর পর তার আয়তন শতগুণ বেড়ে বিরাট লালবর্ণের একটি তারায় পরিণত হবে। মহাবিশ্বে এরূপ অনেক লাল তারার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গর্ত

মহাকাশে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গর্ত নামক একটি বস্তুর ব্যাপারে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে এ বস্তুটি কি? এবার এই রহস্যময় বস্তুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

ব্ল্যাক হোল বাস্তবে একটি সম্ভাব্য থিওরিটিক্যাল বস্তু। এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কোন ব্ল্যাক হোলের সন্ধান মেলেনি। তবে কেণ্ডিডেটের অভাব নেই। এ পর্যন্ত অনেক বস্তু মহাশূন্যে পাওয়া গেছে যেগুলো ব্ল্যাক হোল হওয়ার শক্তিশালী কেণ্ডিডেট হিসেবে অনেকেই মনে করেন। এবার প্রশ্ন জাগে এসব বস্তুর নামকরণ ব্ল্যাক হোল করার পেছনে রহস্যটা কি?

ব্ল্যাক হোল হলো মহাকাশের এমন একটি বস্তু যার নিজস্ব মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী যে, কোন কিছুই এর উপর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না (এস্কেপ করতে পারে না) এমনকি আলোকরশ্মিও বেরিয়ে আসে না। সুতরাং এটাকে দেখার কোন উপায় নেই- তাই এই নামকরণ।

সূর্যের ওজন থেকে বেশী ওজনবিশিষ্ট কোন তারার মৃত্যু ঘটতে পারে কয়েকটি পদ্ধতিতে। এগুলো হলো, সাদা ডোয়ার্ফ (শ্বেত বামন তারা!), নিউট্রন তারা কিংবা ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোল হওয়ার কারণ হলো, তারাটি তার নিজস্ব মহাকর্ষের কারণে

ভেতরের দিকে কলাপ্‌স হতে থাকে। যতো বেশী কলাপ্‌স হয় তার মহাকর্ষও ততো বেশী বাড়তে থাকে- সুতরাং কলাপ্‌স হওয়া আরও বাড়ে। এক পর্যায়ে এসে এর মহাকর্ষ এতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, এর উপর থেকে আলোকরশ্মি পর্যন্ত আর বেরিয়ে আসতে পারে না। তার মহাকর্ষ আলোক রশ্মিকে পর্যন্ত আটকে রেখে দেয়। শুধু আলো নয় এক্স-রে, গামা-রে ইত্যাদি সকল ইলেকট্রমেগন্যাটিন সিগন্যালকেও সে আটক করে ফেলে। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, ব্ল্যাক হোল হচ্ছে মাহাকাশের কবরস্থান। কারণ, এর কাছে কোন বস্তু পৌঁছে গেলে আর রক্ষা নেই- তার মহাকর্ষ তা ছিড়ে-টেনে-হেচঁড়ে নাস্তেনাবুদ করে ছাড়বে। আপনি যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ব্ল্যাক হোলের কাছে গিয়ে পড়েন তবে আপনাকে টেনে অন্তত শতফুট লম্বা করবে এবং তার দেহের উপর নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে নিশ্চহ্ন করে দেবে। এই হচ্ছে ব্ল্যাক হোল নামক শক্তিশালী বস্তুর স্বরূপ।

লাইট ইয়ার বা আলোক বৎসর

ইতোমধ্যে আমরা অনেকবার আলোক বৎসর (ইংরেজীতে লাইট ইয়ার) কথাটি ব্যবহার করেছি। আলোক বৎসর বলতে এক বৎসর সময়ের মধ্যে আলো যতটুকু দূরত্বে গিয়ে পৌঁছে এটুকু বুঝায়। এই মহাবিশ্বের বড়ত্ব কিংবা আয়তন এতো বেশি যে, আমাদের মাইল বা কিলোমিটারের হিসেবে এগুলো বুঝিয়ে বলা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ আমাদের নিকটতম তারা থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতেই প্রায় ৪.৩ বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং এর দূরত্ব মাইল দিয়ে বলা মূলতঃ অর্থহীন। বাস্তবে তা হলো ৫.৮৭ x ৪.৩ ট্রিলিয়ন (এক হাজার বিলিয়ন = ১ ট্রিলিয়ন) = ২৫.২৪১ ট্রিলিয়ন মাইল। এখন এক বিলিয়ন হচ্ছে ১০০ কোটি, এক হাজার বিলিয়ন হলো (অর্থাৎ এক ট্রিলিয়ন), ১০ হাজার কোটি। সুতরাং ২৫.২৪১ ট্রিলিয়ন অর্থ হলো ২৫২.২৪১ হাজার কোটি মাইল। এই বিরাট নাম্বারটি ধারণা করারও ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে যেহেতু আলো আসতে চার বছর ও এর কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয় (অর্থাৎ ৪.৩ বছর) তাই নিকটতম তারা আলফা সেন্টরীর দূরত্ব ৪.৩ আলোক বৎসর বলা অনেকটা সহজবোধ্য নয়কি? আর এ-তো গেল নিকটতম তারার কথা। কোন কোন তারা ও গ্যালাক্সি আছে যাদের আলো এই পৃথিবীতে পৌঁছুতে ৯ থেকে ১২

বিলিয়ন বছর পর্যন্ত অবিতাহিত হয়। চিন্তা করে দেখুন, এই বিরাট দূরত্বকে মাইলের হিসেবে লিখবেনই বা কি করে- বুঝা তো পরের ব্যাপার।

এবার হিসেব করে দেখা যাক এক আলোক বৎসর বাস্তবে কত মাইলের দূরত্ব। এক ঘণ্টার মধ্যে আছে ৩,৬০০ সেকেন্ড। সুতরাং এক দিনে (২৪ ঘণ্টায়) আছে ২৪ x ৩,৬০০ = ৮৬,৪০০ সেকেন্ড । এক বছরে আছে ৩৬৫ x ৮৬,৪০০ = ৩,১৫,৩৬০০০ সেকেন্ড । আলোকের গতি হলো ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড। সুতরাং এক আলোক বৎসর = ৩,১৫,৩৬,০০০ x ১,৮৬,০০০ = ৫৮,৬৫,৬৯৬,০০০,০০০ মাইল। এই বিরাট নাম্বারকে সংখ্যায় কিভাবে বলা হবে ভেবে দেখুন। বাস্তবে তা প্রায় ৫৯ লক্ষ কোটি মাইল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, বিজ্ঞানীরা মহাকাশের তারা, গ্যালাক্সি ও অন্যান্য কজমিক বস্তুর দূরত্ব মাপতে কেন আলোক বৎসরের ব্যবহার করেন।

“আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই বেহুদা সৃষ্টি করিনি;...” [সূরা হিজ্বর ঃ ৮৫]।

পরিচ্ছেদ ৬

আপেক্ষিকতাবাদ বা রিলেটিভিটি থিওরী

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে আমরা একাধিকবার ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। এই গুরুত্বপূর্ণ থিওরীটি আজ বিজ্ঞানমহলে সর্বজনস্বীকৃত একটি মতবাদ। সুতরাং এই থিওরীটি ভালো করে বুঝা আমাদের জরুরী। আগেই বলে রাখি, এই আলট্রা-মডার্ণ বিশ্বতত্ত্ব সবার জন্য সহজে বুঝা সম্ভব নয়। আমি বাংলা ভাষায় এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সহজ-সরলভাবে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। তথাপি কেউ যদি মনে করেন, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তবে আমি উপদেশ দেব, একাধিকবার পড়ে বুঝার চেষ্টা করুন। স্বভাবত এরূপ থিওরীর সঙ্গে উচ্চগণিত জড়িত থাকে। কিন্তু আমি গাণিতিক দিকটি যতদুর সম্ভব এড়িয়ে গেছি। থিওরীর আসল বিষয়বস্তু ও এর সম্ভাব্য ফলাফল ইত্যাদির ব্যাপারে জানাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য।

আপেক্ষিকতাবাদ- এর নামকরণ থেকেই বুঝা যায়, মূলতঃ তা রিলেটিভ বা আপেক্ষিক কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। জগতের সব ঘটনা বাস্তবে মৌলিক নয়- অর্থাৎ কোন ঘটনাই চূড়ান্ত সত্য নয়- সবকিছুই আপেক্ষিক। আমরা যা দেখি বা পর্যবেক্ষণ করি তা আমাদের অবস্থান, গতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। একই ঘটনা একাধিক ব্যক্তি ভিন্ন অবস্থান, গতি ইত্যাদির কারণে ভিন্নভাবে দেখবে। এছাড়া গতি এবং সময় বলতে যা বুঝায় তা-ও মূলত আপেক্ষিক- কোন চূড়ান্ত বা এবস্যুলুট গতি কিংবা সময় বলতে কিছু নেই। অথচ আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭] ধারণা করেছিলেন, সময়, গতি ইত্যাদির একটি এবস্যুলুট অস্তিত্ব আছে। এই থিওরী তাঁর বিশ্বতত্ত্বকে তাই পাল্টিয়ে দিয়েছে। সবকিছুর আপেক্ষিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করেই আইনস্টাইন তাঁর থিওরী সৃষ্টি করেন।

আইনস্টাইন [১৮৭৯-১৯৫৫] আমাদের বলেছেন, বাস্তবে আমরা সমতল ইউক্লিডিয়ান (বিজ্ঞানী ইউক্লিডের জ্যামিতি ভিত্তিক) স্থানে (স্পেইসে) বসবাস করি না। যদিও সাধারণভাবে আমরা ভাবি, স্থান সমতল, সময় ও গতি ইউনিফর্ম (সমরূপ)। অর্থাৎ প্রাত্যহিক অনুভূতিতে মনে হয় সবকিছু সমভাবে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আসলে আমরা যে বিশ্বে বাস করি তা হলো ঘোমরা স্থান-কাল বিশিষ্ট। অর্থাৎ স্থানও বক্র এবং কালও বক্র। এই বক্র বা বাঁকা হওয়ার মানে কি তা একটু পরই আমরা বুঝতে পারবো। আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আধুনিক কজমোলজি, অণু-পরমাণু বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ এ থিওরীটি মর্ডাণ যুগের বিজ্ঞানকে বৈপ্লবিক করে তুলে।

রিলেটিভিটির আসলে দু'টি আলাদা অংশ আছে। প্রথমটি হলো বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি) ও দ্বিতীয়টি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (জেনারেল রিলেটিভিটি)। আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে প্রথমটি প্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয়টি ১৯১৬ সালে। দুটির মধ্যে বিরাট পার্থক্যও আছে। স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথচ জোনারেল রিলেটিভিটির ব্যাপকতা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি বিজ্ঞানমহলে খুব দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে কিন্তু সাধারণ রিলেটিভিটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। এর একটি কারণ ছিলো। থিওরীকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্যায়ন করা সহজ নয়। এছাড়া এই থিওরীর সঙ্গে অত্যন্ত কঠিন উচ্চগণিত জড়িত- যা অতি সহজে অনুধাবন করা যায় না। বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন যিনি এই থিওরীটি পুরোদমে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁকে একদা কেউ জিজ্ঞেস করলো, "এটা কি সত্যি, পৃথিবীর ৩ ব্যক্তি মাত্র এই থিওরী বুঝতে সক্ষম হয়েছেন?" তিনি জবাবে বলেছিলেন, "তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?"!

অপরদিকে যেহেতু স্পেশ্যাল রিলেটিভিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপার-স্যাপার তাই তখনকার বিজ্ঞানীরা এটাকে অতি দ্রুত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্যায়ন করতে সক্ষম হন। আর জেনারেল রিলেটিভিটি দীর্ঘ ৪০ বছর পার হবার পরই সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালের দিকে এডিংটনের সেই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে- কারণ এ বছর জেনারেল রিলেটিভিটির উপর এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সংঘটিত হয় এবং তাতে ৮০০ জন বিজ্ঞানী ও গবেষক অংশগ্রহণ করেন। যা হউক, এবার দেখা যাক এ থিওরী দুটি আসলে কি জিনিষ।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ

এই থিওরীর মৌলিক ধারণা জন্মেছে মূলতঃ দুটি অবস্থা থেকে: এক. একটি বিশেষ ফ্রেম বা অবস্থা ও দুই. আপেক্ষিকতার বাস্তবতা। অর্থাৎ আমরা মুক্তভাবে মটির দিকে পতিত (ফ্রি ফোল) একটি ল্যাবেরটরীর কথা বলতে পারি। এই অবস্থায় ভেতরের লোকটি জগতকে কিভাবে দেখবে- সে ব্যাপারে আমরা আপেক্ষিকতার আলোকে গবেষণা করবো। যেহেতু ল্যাবটি মুক্তভাবে পৃথিবীর মহাকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে তাই এর ভেতরের সককিছুই সরলপথে একই গতিতে নীচের দিকে পড়তে থাকবে। বাস্তবে এই ফ্রি ফোল আসলে মহাকর্ষ থেকে মুক্ত। কারণ মহাকর্ষের টান ও বস্তুর পড়ার গতি একই হওয়ায় শেষ রেজাল্ট দাঁড়ায় যিরো। অর্থাৎ মুক্তভাবে পড়ার গতি ও মহাকর্ষের গতি একটা আরেকটার সঙ্গে ক্যানসেল হয়ে যায়। এরূপ ফ্রি ফোলিং ল্যাবের আভ্যন্তরকে বলে গ্যালিলিয়ান সিস্টেম। আমাদেরকে স্পেশ্যাল রিলেটিভি বলছে, এরূপ একটি ল্যাবের ভেতর যেসব ফিজিক্যাল (বস্তু নিয়ে) পরীক্ষা-নীরিক্ষা হবে তার ফলাফল ল্যাবের গতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অন্যকথায়, ফিজিক্সের (পদার্থবিজ্ঞানের) যাবতীয় আইন-কানুন প্রত্যেক এরূপ গ্যালিলিয়ান সিস্টেমে একই ধরণের হবে। এছাড়া আলোকের গতিও ল্যাবের গতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থাৎ যেহেতু আলোকের গতি মাপাও একটি ফিজিক্যাল পরীক্ষা। আলোকের এই গতি তার মূল উৎসের গতি কিংবা পর্যবেক্ষকের গতি থেকেও মুক্ত।

উপরোক্ত গ্যালিলিয়ান সিস্টেমকে গবেষণা করে আইনস্টাইন অংক কষে কিছু নতুন বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন, যা ইতোমধ্যে কারো জানা ছিলো না। প্রাথমিকভাবে অনেকে অবাকও হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আমরাও হবো। এবার দেখা যাক বিশেষ আপেক্ষিকতা আমাদেরকে কিসব অত্যাশ্চর্য কথা বলে।

গ্যালিলিয়ান সিষ্টেম
মহাকর্ষে ফ্রিভাবে পড়ন্ত এই লিফটের সবকিছুই ওজনশূন্য- কারণ মহাকর্ষের গতি ও পড়ার গতি সমান হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।



মহাকর্ষ সমতাবাদ ও স্থান-কাল বাঁকাকরণ

মহাকর্ষ সমতাবাদ হচ্ছে এই : সব উল্লেখযোগ্য আয়তনের বস্তু (বডি) কোন মহাকর্ষের ফিল্ডে একই গতিতে পড়ে- বডিগুলোর ওজন (ম্যাস), গঠনের উপাদান কিংবা আকার যেটাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এই মহাকর্ষের সমতা সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই জানা ছিলো। গ্যালিলিও তা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন। আমরা যে ইতোমধ্যে গ্যালিলিয়ান সিস্টেম-এর কথা বলেছিলাম- অর্থাৎ ফ্রিভাবে পতিত ল্যাবের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, তা এই সমতার আইনেরই আওতাভুক্ত হওয়ায় ল্যাবের ভেতরের সবকিছু একই গতিতে পড়বে বলা হয়েছিল। এই ফ্রি পড়ার অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় মহাকর্ষের ক্রিয়া যেন মুক্ত হয়ে গেছে।

এখন মনে করুন মহাকর্ষমুক্ত কোন স্থানে (স্পেইসে) যদি কোন লিফট দ্রুত গতিতে চালানো হয় তবে লিফট ও এর ভেতরের সবকিছু একইভাবে সমগতিতে চলবে। যেমনটি আমাদের মহাকর্ষের মধ্যে পতিত ল্যাবের অবস্থা হয়েছিল। তাহলে বুঝা গেলো, মহাকর্ষের আকর্ষণে পতিত ল্যাব ও মহাকর্ষমুক্ত লিফট-এর অবস্থার (অর্থাৎ গতিশীলতার) স্বরূপ মূলত অভিন্ন।

এখন, এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা নতুন কিছু নয়। এসব ব্যাপার বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু আইনস্টাইনের দৃষ্টি ছিলো প্রখর। তিনি এই মহাকর্ষের প্রক্রিয়া বস্তুর উপর থেকে ফ্রি-ফোল বা ইনার্শা [মহাকর্ষমুক্ত স্পেইসে লিফটের গতি ইনার্শা (ধাক্কা দেয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট গতি) থেকে সৃষ্ট] গতির ফলে মুক্ত হওয়াকে তিনি শুধুমাত্র মেকানিক্যাল গতিশীলতার ক্ষেত্রেই সত্য বলেননি, বরং এটা পদার্থবিজ্ঞানেরই একটি মৌলিক আইন হিসেবে সনাক্ত করেন। আইনস্টাইনের দিব্যদৃষ্টিটি এখানেই। তিনি দেখিয়েছেন, এই আইন মৌলিক শক্তি যেমন ইলেকট্রোমেগন্যাটিজম এর ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং স্থানীয় বা লকেল যে কোন গ্যালিলিয়ান সিস্টেমে ফিজিক্সের আইন মূলতঃ আপেক্ষিক অবস্থাকে মেনে চলে। এই ধারণাকে বলে আইনস্টাইন ইক্যুইভেলেন্স প্রিন্সিপাল (ইইপি)- বাংলায় বলা যায়, আইনস্টাইনের সমতা প্রতিপাদ্য। এই অবস্থার একটি ফলাফল হলো মহাকর্ষজণিত রেড শিফ্‌ট (আলোর রং লাল হওয়া)। অর্থাৎ শক্তিশালী মহাকর্ষের মাধ্যমে আলেকরশ্মি লাল রং ধারণ করে। এর অর্থ হলো, আলো যখন মহাকর্ষের ফিল্ড ডিঙ্গিয়ে উঠে তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে- কিন্তু যখন মহাকর্ষের মধ্যে পতিত হয় তখন তার রং হয় নীল। এই প্রক্রিয়ার ফলে সবদিক থেকে সমান দুটি ঘড়ির চলার রেইট ভিন্ন হয় যদি এগুলো মহাকর্ষের ফিল্ড থেকে ভিন্ন দূরত্বে রাখা থাকে। অর্থাৎ মহাকর্ষ সময়ের উপরও ক্রিয়া করে। ফিল্ডের কাছে সময় চলে দ্রুত এবং দূরে চলে স্বাভাবিকভাবে। ইইপি'র দ্বিতীয় ফলাফল হচ্ছে স্থান-কাল ঘোমরা বা বাঁকা হওয়া। নীচের ছবিটির দিকে তাকালে এ ঘোমরা হওয়ার ব্যাপারটি বুঝতে সহজ হবে।



সুতরাং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে আমরা যে তিনটি বিষয় অবগত হয়েছি তা হলোঃ ১. মহাকর্ষ আলোর রং লাল (ঊর্ধ্বে ওঠার সময়) এবং নীল (ফিল্ডে পড়ার সময়) করে, ২. মহাকর্ষ সময়ের উপর প্রতিক্রিয়া করে (দ্রুততর করে) এবং ৩. মহাকর্ষ স্থান-কাল (স্পেইস-টাইম) বাঁকা করে।

এই তিনটি ফলাফল পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। লালকরণ ১৯৬৫ সালে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়। আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা হয়েছিল। একটি উঁচু বিল্ডিংয়ে গামা-রে (ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশন) নীচ থেকে উপরের দিকে চালিত করে এই লাল রং ধারণ পরীক্ষা করে সনাক্ত করা হয়েছে। সময়ের ভিন্নতা এটমিক ঘড়ি দিয়ে পৃথিবী থেকে অনেক উচ্চে বায়ূমণ্ডলে বেলুন প্রেরণ করে সত্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া স্থান-কালের বাঁকা হওয়ার ব্যাপারটি অনেক আগেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের সূর্যগ্রহণের সময়, আকাশে একটি তারার অবস্থান এর আসল জায়গা থেকে অনেকটা ভিন্ন অবস্থানে দেখার বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এই তারাটি থেকে আগত আলো সূর্যের পাশদিয়ে আসার সময় এর মহাকর্ষে সৃষ্ট বাঁকাপথে চলে এসেছিল তাই এটাকে অন্য অবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, আইনস্টাইন আগেই এই তারাটি কোথায় দেখা যাবে (অর্থাৎ সূর্যের বাঁকাকরণের ফলে আসল স্থান থেকে কত ডিগ্রী দূরত্বে দেখাবে) তা বলে দিয়েছিলেন। তাঁর হিসেব ও পর্যবেক্ষণ প্রায় একই হয়েছিল। বিষয়টি বুঝতে ২১৮ পৃষ্ঠার ছবিটি হয়তো সহায়ক হবে।

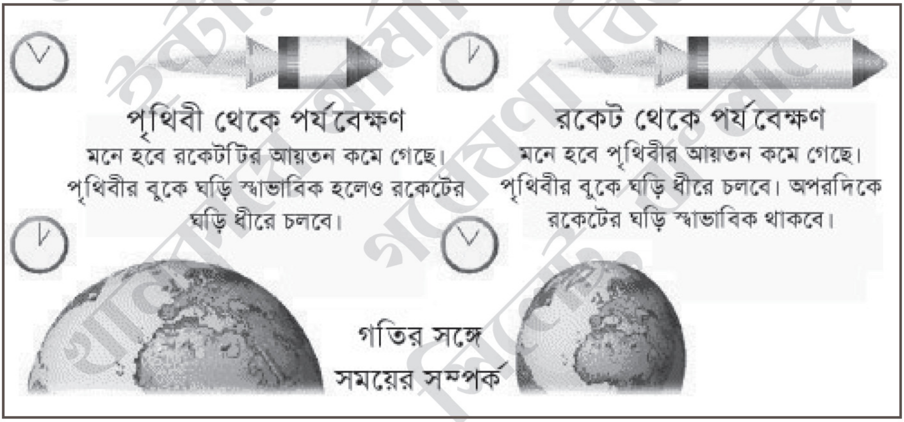
জেনারেল রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ

উপরোক্ত সমতার প্রিন্সিপাল এবং এর পরীক্ষিত সত্যতা আমাদের জানা হলেও বস্তুর দ্বারা স্পেইস-টাইম বা স্থান-কাল ঠিক কতটুকু বাঁকা হয়ে থাকে তা আমরা বুঝতে পরিনি। এটা সঠিকভাবে মাপার জন্য কিছু বিশেষ গাণিতিক সমীকরণ প্রয়োজন। আর আইনস্টাইন এসব সমীকরণই আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন তাঁর প্রখ্যাত জেনারেল রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে।

এসব সমীকরণকে বলে ফিল্ড ইক্যুয়েশন্‌স। বাংলায় বলা চলে, মহাকার্ষিক ক্রিয়া সমীকরণ। তিনি মোট ১০টি এরূপ সমীকরণ আবিষ্কার করেন। এগুলোকে মেট্রিক থিওরী বলে। আর আইনস্টাইনের এই ১০টিই শুধু নয় অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এ ধরণের অথচ ভিন্ন আরও কিছু থিওরী আবিষ্কার করেছেন।

টাইম ডিলে বা সময় লম্বিত হওয়া

আমরা সবাই সময়ের মধ্যে আবদ্ধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনে মিলে সময়ের সাথে আমাদের পরিচিতি। আমাদের অস্তিত্ব সময়ের উর্ধ্বে নয় বরং এর ভেতরে। আমরা সর্বদাই বর্তমানের উপর বাস করি। অতীত থাকে আমাদের স্মরণে, কাগজে, ইতিহাসে আর ভবিষ্যৎ সর্বদাই বাস করে আমাদের নাগালের বাইরে। সময়ের ক্ষয় ও অবক্ষয় থেকেও আমরা কেউ মুক্ত নয়। চলমান সময় আমাদের দেহ-মন-প্রাণে ক্রিয়া করে একদিন নির্দিষ্ট ক্ষণে সবাইকে নিয়ে যায় কবরে। সে কবর হোক সলীল সমাধি, সাড়ে তিনহাত মাটির গহ্বর কিংবা শব-চুল্লি বা অন্যকিছু।



বস্তুজগতে সময় সদাক্রিয়াশীল। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুর জন্ম হয়- ক্ষয়, পরিবর্তন এবং ধ্বংস হয়। এই সময় যদি চলমান না থাকতো তবে সবকিছু অনড়, অক্ষয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো। সর্বাদিক মহাসত্য এই সময় জিনিসটি আসলে কি? বড় জটিল প্রশ্ন বটে। সময়কে বুঝার জন্য যুগ যুগ ধরে কত বিজ্ঞানী ও

দার্শনিক মাথা ঘামিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সময়কে চেনা যে কতো কঠিন তা এক ঘটনা থেকে জানা যায়।

কথিত আছে একদা এক বিদেশী বয়োবৃদ্ধ দার্শনিক লন্ডনে বেড়াতে এসেছিলেন। একদিন বিকেলে তিনি টেম্‌স নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নদীর তরঙ্গদোলা অবলোকন করছিলেন তন্ময় হয়ে। এসময় তার মতো আরেক বিদেশী পর্যটক এসে তাঁকে প্রশ্ন করলো, What is time? (সময় কি?) দার্শনিক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বিদেশী স্বরে বললেন, What did you say? What is Time? I Have spent my life to find that out! (কি বললে? সময় কি? আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি এটা বোঝার চেষ্টায়!) বলাই বাহুল্য, দার্শনিকের মুখ থেকে এরূপ কথা শ্রবণ করে ঐ লোকটি ভাবলো, এ বৃদ্ধ পাগল-ছাগল হবে! কারণ সে জানতে চেয়েছিলো বিকেল ক'টা হয়েছে, কিন্তু লোকটি কি অদ্ভুত জবাবই না দিলো! আসলে দার্শনিকের জবাবই সঠিক ছিলো, কারণ লোকটি তো ইংরেজী ভাষায় অদক্ষ থাকায় প্রশ্ন করে বসেছে বড়টি। সময় কি? এটা তো দর্শন ও বিজ্ঞানের Sixty-four million dollar question! তবে সে যদি বলতো, হুয়াট টাইম ইজ ইট? তবে হয়তো তার কাঙ্খিত জবাব পেতো।

প্রথমে রহস্যজনক অথচ সার্বজনিন এই টাইম বা সময় সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা কি, তা আলোচনা করে দেখা যাক।

সময় সম্পর্কে বিজ্ঞান ও দর্শন যুগ যুগ ধরে গবেষণা চালানোর পর অবশেষে বিংশ শতকের শুরুতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এর একটি সংজ্ঞা দেন। গণিত ও ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তাঁর এ ব্যাখ্যা এখন বিজ্ঞানজগতে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাঁর মতে সময় তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন বস্তু জগতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একটি উপাদান। আমরা মূলত চার-বিস্তৃতিসম্পন্ন স্থান-কাল-চলমান (স্পেইস-টাইম-কন্টিনিউয়াম) জগতে বাস করি। আইনস্টাইন তাঁর প্রখ্যাত রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ থিওরীর মাধ্যমে এ সত্য দেখিছেছেন। আপেক্ষিকতবাদ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। সময় সম্পর্কে এ থিওরী থেকে যেসব কথা বেরিয়ে এসেছে তা অবশ্যই ধারণাতীত। আইনস্টাইন দেখিছেছেন আলোকের গতির সাথে

সময়ের সম্পর্ক আছে। কেউ যদি আলোকের গতির কাছাকাছি চলতে পারে (আলোকের গতি প্রায় ১,৬৮,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড) অর্থাৎ এ উচ্চগতিসম্পন্ন ভ্রমণকারীর বয়স বৃদ্ধি হবে অনেক আস্তে আস্তে! এ অদ্ভুত কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি কিন্তু পরবর্তীতে একাধিকবার এর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার জন্য সুইজারল্যান্ডে স্থাপিত অণু-পরমাণু পরীক্ষা-নীরিক্ষার একটি বিশেষ লেবেরেটরী ব্যবহার করেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, কিছু পরমাণুর স্থায়িত্বকাল যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় হাফ-লাইফ বলে, নির্দিষ্ট সময় থেকে অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোকের কাছাকাছি গতিতে এগুলো চালিত করার পর তা সম্ভব হয়েছে।

সময় সম্পর্কে আইনস্টাইন আরোও অনেককিছু বলেছেন। যেমন, সময়ের শুরু ছিলো এবং শেষ হবে। এর শুরু হয় জগতসৃষ্টির মুহূর্তে এবং শেষ হবে জগত ধ্বংসের কালে। সময় আপেক্ষিক, অর্থাৎ একেকজন দর্শকের কাছে সময় একেক রকম হয়ে থাকে। বিশ্বজনিন কোন সময় নেই। সময় মূলতঃ লকেল (স্থানীয়)। বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের থিওরী অনুসরণ করে আরো আবিষ্কার করেছেন যে, আমাদের দেহে বায়োলজিক্যাল ঘড়ি আছে। দেহের প্রতিটি কোষে এই ঘড়ি ক্রিয়া করে আমাদেরকে বুড়ো করছে।

এ হচ্ছে সংক্ষেপে সময় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা। সময়ের আপেক্ষিকতার ব্যাপারে টুইন প্যারাডক্স নামক একটি অত্যাশ্চর্য কাল্পনিক গল্প বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাল্পনিক হলেও এটা সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যাক, গল্পটি এই: একদা সুইজারল্যান্ডের একজন নভোচারী সিদ্ধান্ত করলেন, তার আলোকের কাছাকাছি গতিসম্পন্ন রকেটশীপে পৃথিবীর নিকটতম তারা প্রক্সিমা সেন্টোরীতে ভ্রমণে যাবেন। বর্ণনার সুবিধার্থে আমরা তাকে জন বলে সম্বোধন করবো। জনের এক যমজ (টুইন) ভাই ছিলেন, তাকে আমরা জোহান বলে ডাকবো। যেহেতু যমজ, তাই দু'ভাইয়ের বয়স একই ছিলো এবং তা হলো ৪৭ বছর। জন নির্দিষ্ট দিনে তার যমজ ভাই জোহানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রকেটে আরোহণ করলেন এবং বললেন, ভাই জোহান, তোমার সাথে বারো বছর পর দেখা হবে। গুডবাই।

জনের মাহাকাশযান দ্রুত উপরের দিকে উঠে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। জনের 'বারো বছর পর দেখা হবে' বলার পেছনে রহস্য হলো, প্রক্সিমা সেন্টোরী তারাটি পৃথিবী থেকে ৪.৩ আলোক-বৎসর (আলো যেতে ৪.৩ বছর সময় লাগে) দূরে অবস্থিত। সুতরাং আলোকের কাছাকাছি গতিতে সেথা পৌঁছে ফিরে আসতে অন্তত বারো বছর সময় লাগবে।

যা হউক সময় যেতে লাগলো। পৃথিবীতে থেকে জোহান তার ভাইয়ের আগমণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। বারো বছর তো আর কম দিন নয়। জোহান বিয়ে করলেন এবং দুটি সন্তানের পিতা হলেন। একদিন তার অপেক্ষার অবসান ঘটলো এবং জনের প্রত্যাবর্তন দিসব এসে হাজির হলো। রকেট স্টেশনে তিনি স্বপরিবারে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। জন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসে অবতরণ করলেন। এতোদিন পর ভাইকে দেখার জন্য জোহান ছুটে গেলেন রকেটের কাছে। জন বেরিয়ে আসলেন কিন্তু জোহান তাকে চিনতে পারলেন না। তার নিজের অর্ধেক দাড়ি পেকে গেছে কিন্তু জনের তো অবস্থা সেই বারো বছর আগে যেরূপ ছিলো ঠিক সেরূপই রয়েছে। সে তো ৫৯ বছর বয়স্ক লোক বলে মনে হয় না! জনও তার ভাইয়ের অবস্থা দেখে একেবারে থ! কি ব্যাপার? এই একদিনে আমার ভাইয়ের বয়স এতো বৃদ্ধি পেল কি করে! দুভাই একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন, ঠিক এসময় এক বয়োবৃদ্ধ লোক সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি যমজ দু'ভাইয়ের দিকে গভীরভাবে তাকালেন তারপর মৃদু হেসে বললেন, "আরে! তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? তোমরা আমার আপেক্ষিতাবাদের কথা শুননি বুঝি!"

জন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? বি বলতে চান?"
বৃদ্ধ বললেন, "আমি আইনস্টাইন। তোমাদের মধ্যে বয়সের তারমত্য কিভাবে সৃষ্টি হলো তা বলে দিতে চাই।"
"বলুন।" বললেন জোহান।

বৃদ্ধ এবার বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে, জন যেহেতু আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে ভ্রমণ করেছেন তাই তার উপর দিয়ে সময় অত্যন্ত ধীর গতিতে চলেছে, অপরদিকে জোহানের উপর দিয়ে সময় স্বাভাবিকভাবেই চলেছে। তাই তার বয়স

বারো বছর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনের বয়স মাত্র একদিন বেড়েছে। সময় এরূপই গতির সাথে আপেক্ষিক।

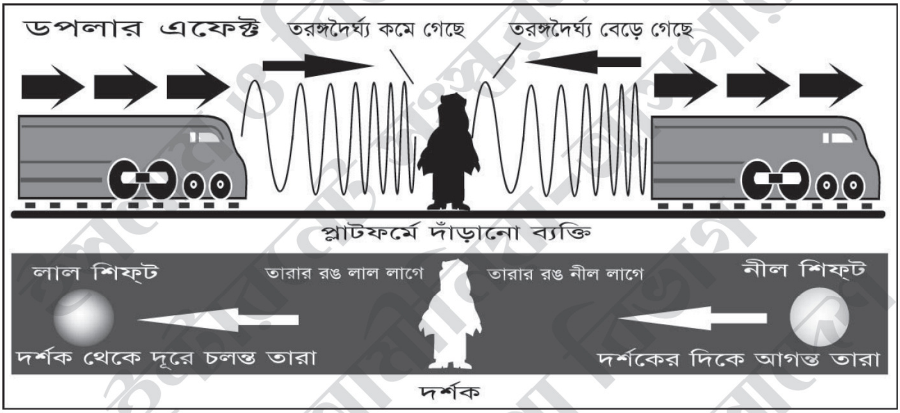
এই গল্প থেকে পরিষ্কার হয়েছে, ইতোমধ্যে সময় সম্পর্কে যা ধারণা ছিলো তা পাল্টে গেছে। গতি ও মহাকর্ষ সময়কে লম্বা করে দিতে জানে। কেউ যদি আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে চলে তাহলে তাঁর নিজের কাছে সময় স্বাভাবিক মনে হলেও, সে তুলনায় বাইরজগতের সময় লম্বায়িত হবে। অপরদিকে বাইরজগতের তুলনায় গতিশীল ব্যক্তির সময় হবে খাটো।

ডপলার এফেক্ট

যাবতীয় ইলেকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গ এবং শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে একটি এফেক্ট বা ক্রিয়া আছে যাকে বলে ডপলার এফেক্ট। এই এফেক্টটি শব্দ-তরঙ্গ কিংবা যে কোন ওয়েভ সৃষ্টির সূত্রের গতির সঙ্গে সম্পর্কিত। শব্দসৃষ্টির সূত্র যখন শ্রবকের কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন শব্দের ফ্রিক্যুয়েন্সি (সেকেন্ডে কয়টি তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে সেই হিসাবকে বলে ফ্রিক্যুয়েন্সি) কমে এবং শব্দটির পীচ বা তীব্রতা অনেকটা হালকা হয়ে যায়। অপরদিকে সূত্র যখন শ্রবকের দিকে ছুটে আসবে তখন শব্দ-তরঙ্গে ফ্রিক্যুয়েন্সি বৃদ্ধি পায়, এতে শব্দটির তীব্রতা শ্রবকের কাছে বেড়ে ওটে। এই এফেক্টটি একটি রেল ষ্টশনে অপেক্ষারত যাত্রীরা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। মনে করুন আপনি একটি লক্যাল ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। আপনার ট্রেন আসার আগেই একটি ইন্টারসিটি ট্রেন স্টেশনের দিকে দ্রুত আসতে লাগলো। ট্রেনের শব্দ তখন আপনার কানে বেশী থেকে বেশী মনে হবে, কিন্তু যেহেতু এটা ইন্টারসিটি ট্রেন তাই স্টেশনে না থেমে যখন এটা দ্রুত স্টেশন পেরিয়ে আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে, তখন ট্রেনের শব্দের তীব্রতা কমে আসবে। এই এফেক্টটি সর্বপ্রথম অষ্ট্রিয়ান এক বিজ্ঞানী, ক্রিস্টিয়ান জোহান ডপলার আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে তার নামানুসারে ডপলার এফেক্ট বলা হয়।

ডপলার দেখিয়েছেন, এই এফেক্টের কারণে সূত্রের দেহের রংও বদলে যায়। অর্থাৎ এই এফেক্ট আলোক-তরঙ্গের উপর ক্রিয়াশীল। কাছে আসতে তার রং হয় নীল এবং

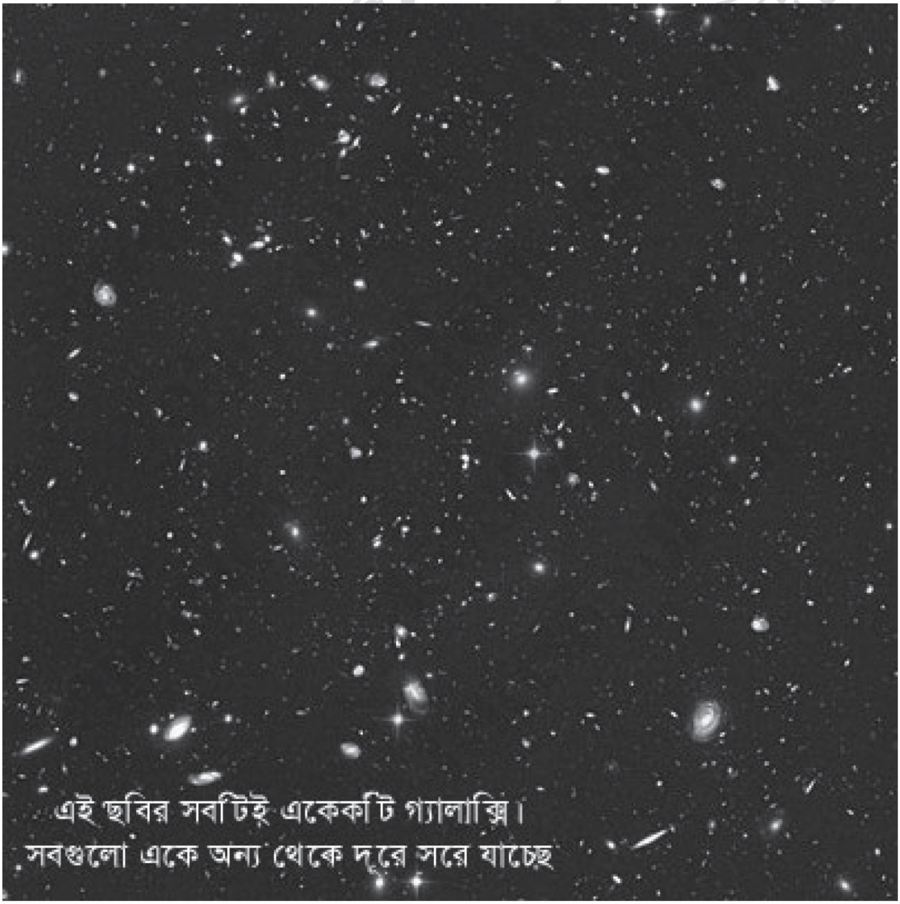
দূরে সরে গেলে তা হয় লাল। এই এফেক্টের সহজ ব্যাখ্যা হলো, যেহেতু তরঙ্গ সৃষ্টির সূত্র বা বস্তুটি দ্রুত দর্শকের দিকে এগুচ্ছে তাই ওয়েভটিও (তরঙ্গটি) শ্রবকের দিকে অগ্রসর হয় অপেক্ষাকৃত দ্রুত। তখন এর ওয়েভ-লেন্থ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) স্বভাবতই একটা আরেকটা থেকে কাছে এসে পড়ে অর্থাৎ শ্রবকের কাছে প্রতি সেকেন্ডে বেশী থেকে বেশী তরঙ্গ পৌঁছে যায়। অপরদিকে সূত্রটি দূরে সরে গেলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেকটা চওড়া হয়ে পড়ে, এতে শ্রবকের কাছে কম থেকে কম তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে এসে পৌঁছে। এই এফেক্ট আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।



মহাকাশে দূর-দূরান্তে নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির গতি খুব দ্রুত হওয়ায় এই এফেক্ট থেকে বুঝা যায় গতিশীল বস্তু আমাদের দিকে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে। এই দুই অবস্থার প্রথমটি হলে- অর্থাৎ কাছে আসছে সেটা সত্যি হলে, আলোর রং নীলের দিকে শিফ্‌ট করবে; এই শিফ্‌ট বা সরে যাওয়াকে বলে ব্লু শিফ্‌ট (নীল শিফ্‌ট)। তবে বস্তুটি যদি দ্রুত সরে যায় তবে আলোর রং লালের দিকে সরে যাবে; এই অবস্থাকে বলে রেড শিফ্‌ট (লাল শিফ্‌ট)। এখন, একটি তারা কিংবা গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোরশ্মিকে যদি আমরা পরীক্ষা করে নেই, তবেই তারাটি কিংবা গ্যালাক্সিটি আমাদের দিকে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে তা সহজেই জেনে নিতে পারি। আরও জানতে পারি বস্তুটির দূরত্ব। জানা দূরত্বে অবস্থানরত বস্তুর লাল বা নীল শিফটের সঙ্গে তুলনা করলেই দূরত্ব হিসেব করে নেয়া যায়। এই ডপলার এফেক্ট থেকেই দেখা গেছে

বিশ্বের চতুর্দিকে গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে- অর্থাৎ বিশ্বটা দিন দিন বিস্তারলাভ করছে।

ডপলার এফেক্ট একমাত্র মূল সূত্র কিংবা পর্যপেক্ষকের গতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সূত্র এবং পর্যবেক্ষক উভয়ই যদি স্থির অবস্থায় থাকে তবে ডপলার এফেক্ট ক্রিয়াশীল হয় না।



"আল্লাহ্ সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং সব বস্তুর রক্ষাকারী" [সূরা জুমার ঃ ৬২]।

পরিচ্ছেদ ৭

আলোকবিজ্ঞান

এ পর্যন্ত আমরা আলো নিয়ে অনেককিছু বলেছি। আইনস্টাইনের থিওরী বুঝাতে যেয়ে এই আলোকের কথা এসেছে। আলো মূলত স্থান-কালের অংশ, এর গতি সসীম ও অপরিবর্তনীয়। আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে চললে সময় আস্তে চলে। এসব কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু বাস্তবে আলো কি জিনিস তা আমরা ভালোকরে বুঝিয়ে বলিনি। আলো নিয়ে গবেষণা একটি ব্যাপক বিষয়। এই গবেষণাকে এখন বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই শাখাটির নাম আলোকবিজ্ঞান। এই পরিচ্ছেদে পাঠকরা আলোকবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

আলো কি?

আলো বস্তাবে স্বভাবের মৌলিক চার শক্তির একটি থেকে সৃষ্ট। এই শক্তিটি হলো বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় তেজস্ক্রিয়া বা ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশন। এই শক্তি থেকে সৃষ্ট সব রেডিয়েশনের ভিন্নতা বা পরিচিতি আমরা রেডিয়েশনটির ওয়েভলেন্থ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে পাই। অর্থাৎ রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থ কোন রেঞ্জের ভেরত আছে সেটা থেকে বিভিন্ন ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশন সনাক্ত করা হয়। যার মাধ্যমে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে তাকে বলে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক স্পেকট্রাম। স্পেকট্রাম হচ্ছে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের পুরো রেঞ্জের হিসাব। এরমধ্যে চোখে দেখা যায় যে অংশটি সেটিই হলো আলো। অর্থাৎ ০.৪ মাইক্রন (ওয়েভলেন্থের পরিমাপ মাইক্রন দিয়ে করা হয়) থেকে ০.৭ মাইক্রন পর্যন্ত রেডিয়েশনের অংশটুকু আমাদের চোখে আলো হিসাবে ধরা পড়ে। তবে চোখে ধরা পড়েনা যে অংশটুকু তার রেঞ্জ বা ব্যাপ্তি কিন্তু অনেক বড়।

যেমন আলট্রাভাইলোট আলো, ইনফ্রারেড আলো ও কালো আলো- এগুলো আমরা দেখতে পাই না। সুতরাং দেখার রেঞ্জের ভেতরের আলো হচ্ছে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের যে অংশ আমাদের চোখে ধরা পড়ে সেটুকু।



আলো বাস্তবে চলমান একটি এনার্জি বা উদ্যম। এটা একটি গতিশীল এনার্জি আবার তরঙ্গও বটে। এই দুটির সমন্বয়ে একটি আলোক থিওরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাকে বলে ফোটন। ফোটন হলো এনার্জি ও ওয়েভলেন্থের উপর নির্ভরশীল একটি হিসেব। লাইট বা আলোককে কেউ কেউ বলেছেন, এনার্জি নিয়ে চলমান তরঙ্গের ট্রেন।

কিভাবে আলো সৃষ্টি হয়

যে কোন ইলেকট্রোমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের মতো লাইট বা আলোও সৃষ্টি হয় তিনটির মধ্যে যে কোন একটি উপায়ে। এগুলো হলো: ১. ইলেকট্রিজ চার্জ গতিশীল করে, ২. নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রতিক্রিয়ায় এবং ৩. নিউক্লিয়ার ফিশন প্রতিক্রিয়ার

মাধম্যে। আগেই বলেছি আলো হচ্ছে ফোটন নামক উপদানে তৈরী। যে কোন বস্তুর মধ্যে এই ফোটন তৈরী হলেই বস্তুটি আলো বিকিরণ করে। যেমন নিউক্লিয়ার রিয়েকশনে একটি ফোটন সৃষ্টি হয়ে তা বিকিরণ হয় আলো হিসেবে। সূর্যালোক ও তারা থেকে আগত আলো মূলত নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে সৃষ্ট। তবে পৃথিবীতে বেশিরভাগ আলো সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনিক উপায়ে। অর্থাৎ এটম ও মলিকিউল যখন এনার্জির মাধ্যমে পরিবর্তন হয় তখন আলোর সৃষ্টি হয়।

আলো মূলত সৃষ্টি হয় তাপ থেকে। একটি লাইট বাল্বের ভেতর থাকে ফিলামেন্ট (অতি কম ব্যাসবিশিষ্ট তার)। এই ফিলামেন্ট ইলেকট্রিক কারেন্টে উচ্চতাপ ধারণ করে। ফিলামেন্ট গরম হলেই তার এটম ও মলিকিউলে কিনেটিক এনার্জি (গতির মাধ্যমে সৃষ্ট এনার্জি) সৃষ্টি হয়। গতিশীলতার কারণে এটম ও মলিকিউলগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ শুরু হয়। এ থেকেই সৃষ্টি হয় ফটোন যা আলো হিসেবে চতুর্দিকে বিকিরণ করে। সুতরাং আলো এটম ও মলিকিউলের মধ্যে এনার্জি দেওয়ায় সৃষ্টি হয়। এই এনার্জি ইলেকট্রিকেল (যেমন লাইট বাল্ব) কিংবা কেমিক্যাল (যেমন হারিকেন) এনার্জি হতে পারে।



লেইজার (LASER)

লেইজার (ইংরেজীতে LASER) অর্থ হলো, লাইট আমপ্লিফিকেশন বাই সিম্যুলেইটেড এমিশন অব রেডিয়েশন। কথাটির ভাবার্থ হবে, কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে আলোকরশ্মিকে শক্তিশালী করা। লেইজার আলো সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ আলোকে প্রযৌক্তিক উপায়ে একটি শক্তিশালী ছোট্ট আলোক বীমে পরিণত করা। লেইজার বস্তুর ভেতর দিয়ে একটি ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত করে। এই বস্তুটি কঠিন, তরল কিংবা গ্যাস হতে পারে। কারেন্টের প্রক্রিয়ায় বস্তুর কিছু এটম এনার্জি গ্রহণ করে গুচ্ছ গুচ্ছ রেডিয়েশন বিকিরণ করে। এর ফলে বস্তুর অপর আরও এটম থেকে বিকিরণ শুরু হয়। এই বিকিরণ মূলত ফোটন (আলো)। দুটি আয়না দিয়ে এই ফোটনকে আটকে একটি সরুপথে বের করে আনা হয়, যা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি আলোকরশ্মি হিসেবে চলমান হতে থাকে। এই বীমের মধ্যে একটি মাত্র ওয়েভলেন্থ থাকায় এটা বেশী শক্তিশালী এবং খুব দূরত্বে ভ্রমণশীল হয়ে উঠে।



অলোর অন্যান্য দিক

আলোকরশ্মি যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে চলমান থাকে (যেমন বাতাস থেকে কাঁচে) তখন এর ডাইরেকশন বা চলার দিক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন হওয়াকে বলে রিফ্রেকশন।

রিফ্রেকশন কিন্তু সব ধরনের চলমান এনার্জির ক্ষেত্রেই সত্য যা সাধারণত তরঙ্গ হিসেবে বিকিরণ হয়। রিফ্রেকশন হওয়ার অর্থ আলোকরশ্মি বাঁকা হওয়া। সাধারণত আলো সরপথে চলে। প্রত্যেক বস্তুর একেকটি আলাদা অপটিক্যাল ডেনসিটি (আলোক-ঘনত্ব) আছে। এই ঘনত্বের ফলে আলো ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন গতিতে চলমান হয়। যেমন বাতাসে চলার পর আলো যখন পানির ভেতর প্রবেশ করে তখন এর গতি কমে যায়। এখন এই আলো যদি সরাসরি উপর থেকে প্রবেশ না করে তাহলে তা বাঁকা হয়ে যাবে।



আমরা অনেক সময় চন্দ্রের চতুর্দিকে একটি গ্লো বা উজ্জ্বল আলো দেখতে পাই। বাস্তবে এটি রিফ্রেকশনের মাধ্যমে সৃষ্ট। পৃথিবীর বায়ূমণ্ডের উপরিভাগে ছোট্ট ছোট্ট বরফখণ্ডের উপর চন্দ্রের আলো এসে এই গ্লো সৃষ্টি করে।

রিফ্লেকশন

রিফ্লেকশন হচ্ছে প্রতিবিম্ব। আলো যেহেতু ওয়েভ এনার্জি বা তরঙ্গশক্তি তাই এটা কোন পরিষ্কার শাইনী (পালিশ-করা) বস্তুর উপর পতিত হলে রিফ্লেকশনের সৃষ্টি করে। যেমন আয়না বা শান্ত পুকুরের পানিতে আলো প্রতিবিম্ব হয়।

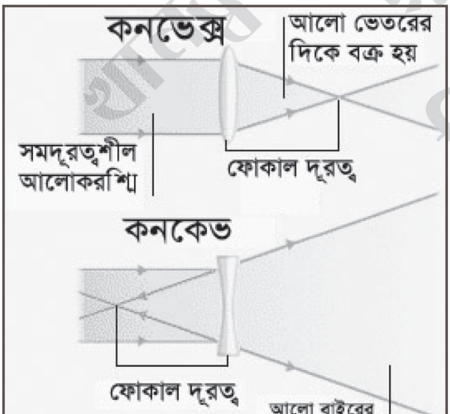


রিফ্লেকশনের মধ্যে দুটি আলোকরশ্মি কাজ করে। প্রথমটি হচ্ছে আলোক সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে আগত রশ্মি এবং দ্বিতীয়টি রিফ্লেকটিং বস্তু বা সারফেস থেকে চলমান রশ্মি

যা পতিত হয়ে লাফমেরে বিকিরণ করে। মনে রাখা দরকার, রিফ্রেকশন ও রিফ্লেকশন ভিন্ন ক্রিয়া। প্রথমটি হচ্ছে আলোকরশ্মির দিকপরিবর্তন হওয়ার ক্রিয়া, আর শেষেরটি হলো শাইনী সারফেস থেকে প্রতিবিম্ব হওয়া।

কনকেভ-কনভেক্স লেন্স ও আয়না

গাড়ির হেডলাইটের ভেতরের আয়নাটি কিংবা টর্চ লাইটের ভেতরের আয়না (বা পালিশ বস্তু) কেন এভাবে বাঁকা (ভেতরের দিকে) থাকে তা কি আমরা চিন্তা করি? এছাড়া গাড়ির ড্রাইভিং মিররই বা কেন বাইরের দিকে বাঁকা থাকে? এসব আয়না এভাবে তৈরীর মূলে আলোকের রিফ্লেকশন আইন কাজে লাগানো হয়। আমরা চাই টর্চের লাইট কিংবা গাড়ির হেডলাইট দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুক। এটা করতে যেয়ে আমাদেরকে আলেকের বীমটি (বীমঃ একাধিক রশ্মির সমন্বয়ে গঠিত হয় একেকটি বীম- বাংলায় বলে অংশুজাল) সরু করতে হয়। সুতরাং (ভেতররে দিকে, কনকেভ-ভাবে) বাঁকা করলে এ কাজটি সম্পন্ন হবে। অপরদিকে কোন বস্তুকে মোটা দেখাতে গিয়ে আমরা আয়নাকে কনভেক্স উপায়ে (বাইরের দিকে) বাঁকা করি। উপরের ডায়াগ্রাম ও ছবির দিকে লক্ষ করলে এই কনকেভ ও কনভেক্স এর স্বরূপ বুঝা যাবে। উল্লেখ্য কনকেভ আয়না দৃশ্যটিটে পাল্টে দেয়। তা কিভাবে দেয় ছবি থেকে সেটা স্পষ্ট। আলোক রশ্মি পতিত হয়ে উল্টোদিকে ফিরে আসে। আর আলো যখন বস্তুর উপর পতিত হয়ে ফিরে এসে আমাদের চোখে পড়ে তখনই আমরা কোন বস্তু দেখতে পাই।



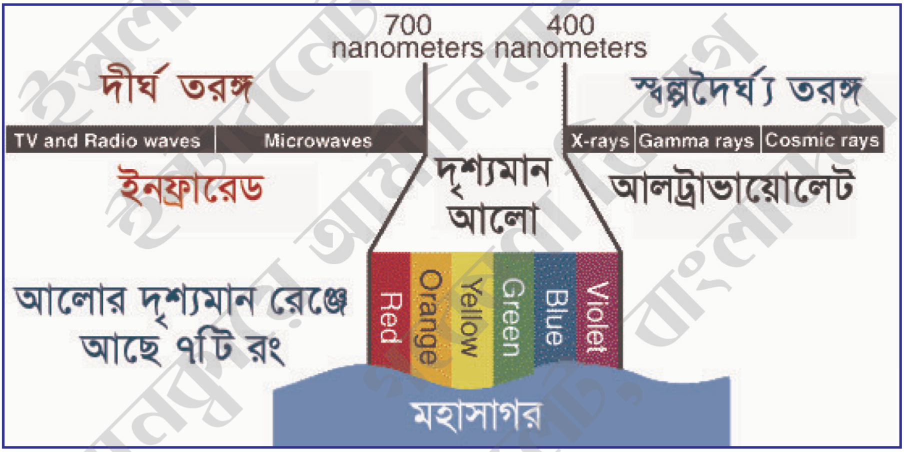
একই উপায়ে আমরা এই দু'ধরণের পদ্ধতিতে চশমার গ্ল্যাস তৈরী করি। চোখের মধ্যে যদি ফক্যাল দূরত্বে বেশকম হয় তবে সঠিক লেন্স দিয়ে তা ঠিক করা যায়। ফক্যাল লেন্থ হচ্ছে যেটুকু দূরত্বে লেনস পেরিয়ে আলোর বিভিন্ন রশ্মি একত্রিত হয়। চোখের ভেতরে নেচারেল লেনসের মধ্যদিয়ে আলো গিয়ে রেটিনা

নামক স্থানে পতিত হয়। এই রেটিনায় থাকতে হবে ফক্যাল দূরত্ব কিন্তু চোখের লেনসে সমস্যা হলে, তা হয় বেশি না হয় কম দূরত্বসম্পন্ন।

ফক্যাল দূরত্বের মধ্যে বেশকম থাকায় লেনস থেকে আলোকরশ্মি রেটিনার সঠিক জায়গায় পতিত হয় না। সুতরাং আমরা তখন ঠিকমতো দেখতেও পারি না। আলাদা লেনস (চশমা) লাগিয়ে এই ফক্যাল দূরত্বকে কৃত্রিম উপায়ে সঠিক করা হয়।

রংয়ের খেলা

এই বসুন্দরা হচ্ছে নানা রংয়ের খেলা। রঙ্গিন ফুলে-ফলে-পল্লবীতে ভরপুর এ পৃথিবীটা কী সুন্দর সৃষ্টি! কিন্তু রং আসলে কী? এটা আমরা দেখিই বা কি করে?



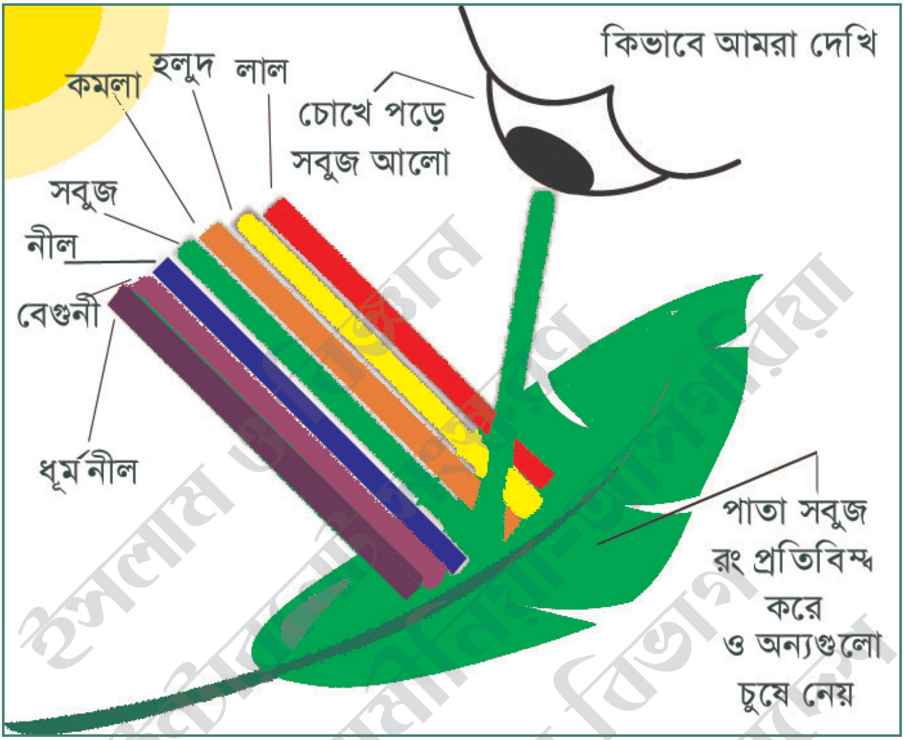
রং মূলতঃ আলোর সঙ্গে সম্পর্তিক একটি উপাদান। রঙ্গিন বস্তু বা পিগ্‌মা আলোকরশ্মিকে একেকটি বিশেষ পদ্ধতিতে রিফলেক্স বা প্রতিবিম্ব করে। সূর্য কিংবা যে কোন বাতি থেকে আগত সাদা লাইট আসলে মোটেই সাদা নয়। ৭টি ভিন্ন রংয়ের মিশ্রণেই এই আলো তৈরী হয়েছে। এই সাত রংকে বলে স্পেকট্রাম। আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম প্রিজম নামক কাঁচের মাধ্যমে সূর্যালোকের ৭টি রংবিশিষ্ট স্পেকট্রাম

আলাদা করে দেখিয়েছিলেন। এই রংগুলো হচ্ছে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, ইণ্ডিগো (ধূর্মনীল) ও বেগুনী (ভায়োলেট)।

আমরা স্কুলে থাকতে এই সাতটি রংবিশিষ্ট স্পেকট্রামকে মনে রাখতে যেয়ে একটি ইংরেজি বাক্য মুখস্ত করেছিলাম। এ বাক্যটি হচ্ছেঃ Richard Of York Gave Battle In Vain. (R = Red, O = Orange, Y = Yellow, G = Green, B = Blue, I = Indigo, V = Violet)

কোন বস্তুর উপর যখন সাদা আলো পতিত হয় তখন বস্তুটি উপরোক্ত এক বা একাধিক আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব করে এবং বাকীগুলো এবজোর্ব বা চুষে নেয়। বস্তুটি যে রংয়ের হবে সেই রংয়ের আলোকরশ্মি প্রতিবিম্ব হয়ে আমাদের চোখে পড়ে- তাই আমরা রং দেখি। ৭টি মৌলিক রংয়ের মিশ্রণ যদি বস্তুর রং হয় তবে ঐসব মিশ্রিত রং প্রতিবিম্ব হবে। সুতরাং আমরা বিভিন্ন রং দেখতে পাই।

মনে করুন আপনি একটি সবুজ পল্লবী দেখছেন। এটাকে সবুজ দেখার কারণ হলো সাদা আলোর মধ্যে যে সবুজ রংয়ের রশ্মি আছে শুধুমাত্র সেটিই এই পাতা প্রতিবিম্ব করে বাকীগুলো চুষে নেয়। অর্থাৎ বাকীগুলো প্রতিবিম্ব করে না। এখন কথা হচ্ছে ৭টি রংয়ের প্রতিটিই যদি কোন বস্তু প্রতিবিম্ব করে ফেলে তাহলে বস্তুটি দেখতে কিরূপ লাগবে। একটু ভাবলেই এর জবাব মেলবে। আমরা যে সাদা আলো দেখি তার মধ্যেও তো প্রতিটি রং আছে কিন্তু আমরা দেখি তাকে সাদা হিসেবে। এ থেকে এটা সহজেই বুঝা যায়, যে বস্তু প্রতিটি রং প্রতিবিম্ব করবে তা হবে সাদা। বস্তু প্রতিটি রং যতো বেশি প্রতিবিম্ব করবে তার রংও ততো বেশি শ্বেতবর্ণের হবে। অপরদিকে যে বস্তু সব কটি রং চুষে নেয় অর্থাৎ প্রতিবিম্ব করবে না- তার রং হবে কালো। অর্থাৎ কালো দেখার কারণ হলো বস্তুটি কোন রং প্রতিবিম্ব করছে না।



এ পর্যন্ত রং নিয়ে আলোচনায় আমরা দুটি বিষয় বুঝতে পেরেছি- ১. রং দেখা মানে প্রতিবিম্বের মধ্যে যে আলোকরশ্মি আছে তা-ই দেখা। ২. বস্তুর উপর থেকে ৭টি রং একই সাথে প্রতিবিম্ব হলে তার রং হয় সাদা আর একটিও প্রতিবিম্ব না হলে তা হয় কালো। এবার এই দুটি বিষয় থেকেই আমরা রং আসলে কি তা সজহে বুঝতে পারবো।

রং হচ্ছে বস্তুর মধ্যে যে রসায়ন দ্রব্য আছে তার একটি গুণ। যে রসায়ন দ্রব্য (যেমন পিগমা কিংবা তৈল রং) যদি নীল আলোকরশ্মি ছাড়া বাকীগুলো চুষে নেয় তবে এই দ্রব্যটি দেখতে নীল লাগবে। লাল রং লাল আলোকরশ্মি ছাড়া বাকীগুলো চুষে নেয়। সুতরাং রং আর কিছু নয়- কোন্ রংয়ের আলোকরশ্মি বস্তু চুষে কিংবা প্রতিবিম্ব করে, সেটার উপরই বস্তুর রং কোন্‌টি হবে তা নির্ভর করে। তাহলে বোঝা গেল, রঙিন বস্তু আলোর রং প্রতবিম্ব করে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়। কারণ, আসলে আলোকরশ্মির মধ্যে ৭টি রং যদি থাকতো না তাহলে জগতটাকে আমরা ব্লাক-এণ্ড-হুয়াইট দেখতাম।

সুতরাং রংয়ের খেলা বাস্তাবে '৭ রংবিশিষ্ট আলোর খেলা' ছাড়া আর কিছুই নয়। পিগমা বা রঙিন বস্তুর মধ্যে চোষা আর না চোষার গুণই বস্তুকে রঙিন দেখানোর জন্য দায়ী।

প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী রং

আলোর মধ্যে তিনটি প্রাথমিক রং আছে। এগুলোকে বলে প্রাইমারী কালার। এই প্রাইমারী কালারের মিশ্রণে বিভিন্ন রং তৈরী হয়। প্রাইমারী রং হলো: লাল, নীল ও সবুজ। সাদা আলোসহ মোট ৭টি ভিন্ন রং এই মৌলিক তিনটি রঙের মিশ্রণ থেকে সম্ভব। এবার দেখা যাক কিভাবে এসব রং তৈরী করা যায়।

লাল+নীল=ম্যাজেন্টা; লাল+সবুজ=হলুদ; নীল+সবুজ=সায়ান (আকাশ নীল); লাল+নীল+সবুজ=সাদা। সুতরাং আমরা লাল, নীল, সবুজ, সায়ান, ম্যাজোন্ট, হলুদ ও সাদা এই ৭টি রং পেলাম।



প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী রং

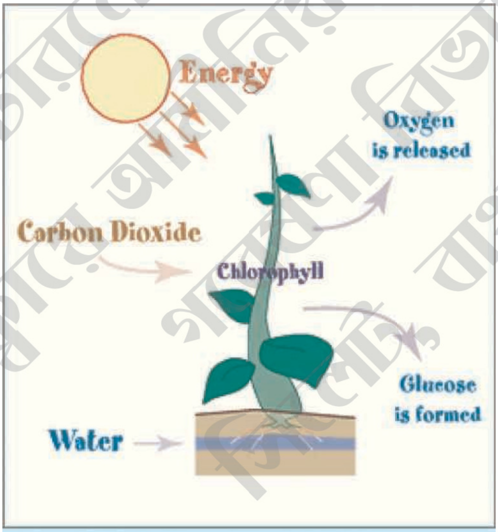
ফটোসিনথেসিস

সূর্যালোক থেকে যে পদ্ধদিতে এনার্জি বা উদ্যম সংগ্রহ করে সবুজ উদ্ভিত খাদ্যগ্রহণ করে তাকে বলে ফটোসিন্থেসিস। এটাকে কে বা কারা কেন যে বাংলায় 'সালোকসংশ্লেশন' নামকরণ করেছেন তা আমার বোধগম্য নয়। আমার ধারণা বাংলাভাষায় সকল বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী যতো সম্ভব সহজ করে লেখা জরুরী। আমাদের সমাজে বিজ্ঞান বিষয়টি সম্পর্কে একটি বিশ্বাস প্রায় সবার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে- তাহলো, বিজ্ঞান একটি কঠিন বিয়ষ। কিন্তু বাস্তবে এ ধারণাটি ভিত্তিহীন। বিজ্ঞানকে যদি সঠিকভাবে সরল বাংলায় উপস্থাপন করা যায়, তাহলে সর্বসাধারণের কাছে তা দিন দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। সুতরাং সালোকসংশ্লেশন ইত্যাদি বলার কোন প্রয়োজন নেই। বরং ফটোসিন্থেসিস শব্দটি দিয়েই বিষয়টি উপস্থাপন করা সহজ বলে মনে করি। কারণ, ফটো শব্দটির অর্থ আমাদের প্রায় সাবারই অল্প-বিস্তর জানা আছে। এছাড়া সালোকসংশ্লেশন থেকে এটি উচ্চারণও অনেকটা শ্রুতিমধুর। যেসব শব্দ বাংলা থেকে ইংরেজী বেশি ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চারণ সহজ হবে, তা মূল ইংরেজী শব্দব্যবহারের মধ্যেই লেখার পক্ষপাতী আমি। অবশ্য বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। বাংলায় নতুন শ্রুতিমধুর সরল শব্দ আবিষ্কারের পক্ষে আমি। ইতোমধ্যে কলিকাতা থেকে কিছু শব্দ আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হয়, এগুলো এতো কঠিন ও শ্রুতিকঠোর যে, তা সচরাচর ব্যবহার হবে পাঠকদের প্রতি জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়!

দুটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ফটোসিন্থেসিস সংগঠিত হয়। প্রথমতঃ লাইট রিয়েকশন বা আলোর প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম্যে আলোকের এনার্জি চুষা এবং দ্বিতীয়তঃ কার্বন রিয়েকশন (কার্বন নামক রসায়নিক বস্তুর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া) বা কালো প্রতিক্রিয়া। এর অপর নাম ক্যালভিন সাইকেল। আমরা এ দুটি প্রসেস আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

লাইট রিয়েকশন

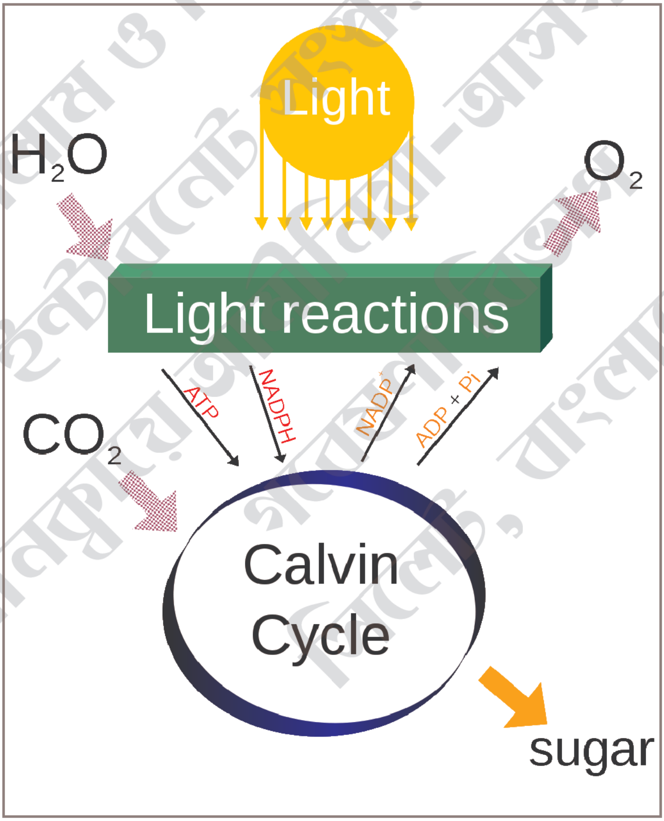
আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, রং বা পিগমা (এ ক্ষেত্রে এই রংকে বলে ক্লোরোফিল্স) সূর্যালোক বা ৭ রংবিশিষ্ট যে কোন আলোকরশ্মিকে চুষে নেয়। যেটি চুষে না, সেটি প্রতিবিম্ব হয়ে আমাদের চোখে রং দেখায়। সবুজ পাতা তাই সূর্যালোকের সবুজ রং ছাড়া বাকী রংগুলো চুষে ভেরতে নিয়ে যায়। তবে যেহেতু আলেকরশ্মি হচ্ছে এনার্জি বা উদ্যম তাই এই চুষা থেকে পাতার ভেতর সামান্য ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। এই কারেন্ট থেকে জন্ম নেয় উচ্চমানের দুটি রসায়নিক বস্তু- এর একটি হচ্ছে এটিপি ও অপরটি এনএডিপিএইচ। এ দুটি নামের অর্থ বুঝা আমাদের জন্য জরুরী নয়- তবে এগুলো থেকেই শুরু হয় দ্বিতীয় প্রসেস।



Photosynthesis

কালো রিয়েকশন

পাতার ভেতর কারবন নামক রসায়নের সঙ্গে উপরোক্ত এটিপি ও এনএডিপিএইচ মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় আরও কিছু জৈবিক পদার্থ- যেমন, চিনি। এ প্রসেসে কার্বন ডায়োক্সাইড ও পানি সক্রিয় থাকে। এ থেকে উদ্ভিদ খাদ্য আহরণ করে। তবে এই ফটোসিন্‌থেসিস রিয়েকশনের মাধ্যমে সমগ্র গ্রহের প্রাণীর জন্য যে জরুরী একটি বাই-প্রোডাক্ট তৈরী হয় তা হচ্ছে অক্সিজেন। এই অক্সিজেন কিভাবে সৃষ্টি হয় এবার সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাক।

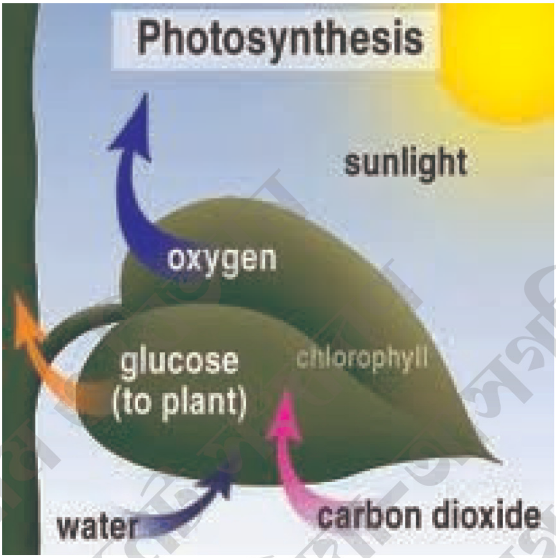


অক্সিজেন রিলিজ

ফটোসিন্থেসিস প্রসেসে যে রিয়েকশন সংঘটিত হয় তাতে সূর্যালোক থেকে সৃষ্ট কারেন্ট পানির মলিকিউল (কয়েকটি এটম মিলে একেকটি মলিকিউল হয়) ভেঙ্গে যায়। পানির মলিকিউলে অক্সিজেন এটম আছে, কারণ পানির কেমিক্যাল ফর্মুলা হলো H_2O (দুটি হাউড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন এটম)। কারেন্ট এই অক্সিজেন এটমকে মুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ বায়ূমণ্ডলে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই উপায়ে যদি অক্সিজেন সৃষ্টি না হতো তবে অচিরেই বায়ূমণ্ডলের সকল অক্সিজেন আমাদের ও প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে ফুরিয়ে যেতো। এখানে উল্লেখ্য যে, উদ্ভিত তথা গাছ-গাছাড়ি আমাদের জীবনরক্ষার জন্য কতো জরুরী তা এখন আশাকরি সবাই বুঝতে পেরেছেন। আশা করবো পাঠকরা বৃক্ষরোপণ কাজে সবসময় সচেতন থাকবেন।

ফটোসিন্থেসিস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। বাস্তবে একটি আরেকটির বিপরিত ক্রিয়া। আমরা এই দুটি বিষয়কে সহজে বুঝার জন্য উপস্থাপন করতে পারি এভাবে: শ্বাস-প্রশ্বাস = জৈবিক পদার্থ + অক্সিজেন = কার্বন ডাইয়োক্সাইড +পানি; ফটোসিনথেসিস = কার্বন ডাইয়োক্সাইড + পানি = জৈবিক পদার্থ + অক্সিজেন।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করতে যেয়ে আমরা বলতে পারি: শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন ও জৈবিক পদার্থের সমন্বয়ে যে বাই-প্রোডাক্ট বা ফলাফল-বস্তু সৃষ্টি করি তা হলো কার্বন ডাইয়োক্সাইড ও পানি। অর্থাৎ প্রশ্বাসের সময় কার্বন ডাইয়োক্সাইড গ্যাস ও পানি আমাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। অন্যদিকে ফাটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে গাছের সবুজ পাতা কার্বন ডাইয়োক্সাইড ও পানি থেকে সৃষ্টি করে অক্সিজেন ও জৈবিক পদার্থ। জৈবিক পদার্থ হয় গাছের খাদ্য আর অক্সিজেন ছেড়ে দেয়া হয় বায়ূমণ্ডলে।



আলো সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আলো হচ্ছে এ জগতের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। আলো ছাড়া সবকিছুই অন্ধকার থাকতো। বাস্তবে ইলোকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ফোটনের তৈরী এই আলো। এছাড়া সূর্যালোক থেকে সৃষ্ট ফটোসিন্থেসিস যে কত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রিয়া তা আশাকরি সবাই অনুধাবন করেছেন।

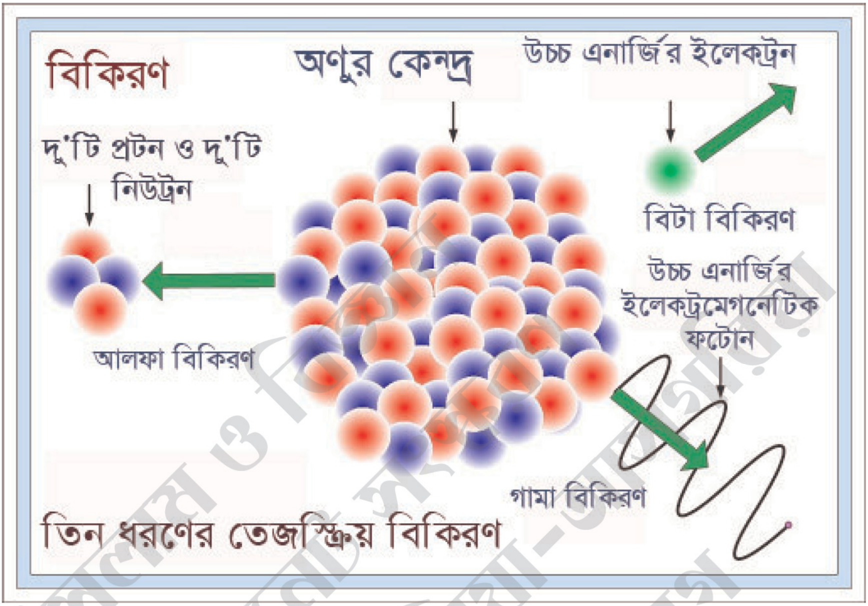
"আকাশ-পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন" [সূরা জ্বাসিয়া ঃ ৩]।

পরিচ্ছেদ ৮

রেডিওএক্টিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা

ইতোমধ্যে পাঠকরা রেডিওএক্টিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা শব্দটি অনেকবার পড়েছেন। এই ক্রিয়াটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। বর্তমান আনবিক বিজ্ঞানের সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আনবিক বোমা বিস্ফোরণে মারাত্মক তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ হয় বলে আমরা শুনে থাকি। কিন্তু এটি কি? আসুন, এই জিনিষটি আসলে কি তা আমরা সরলভাষায় জেনে নিই।

তেজষ্ক্রিয়া মৌলিক চার শক্তির একটি, যাকে বলে ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশন, তা থেকে সৃষ্ট। কোন কোন বস্তুর এটমের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র থেকে এই তেজষ্ক্রিয়া এমনিতেই বিকিরণ হয়।

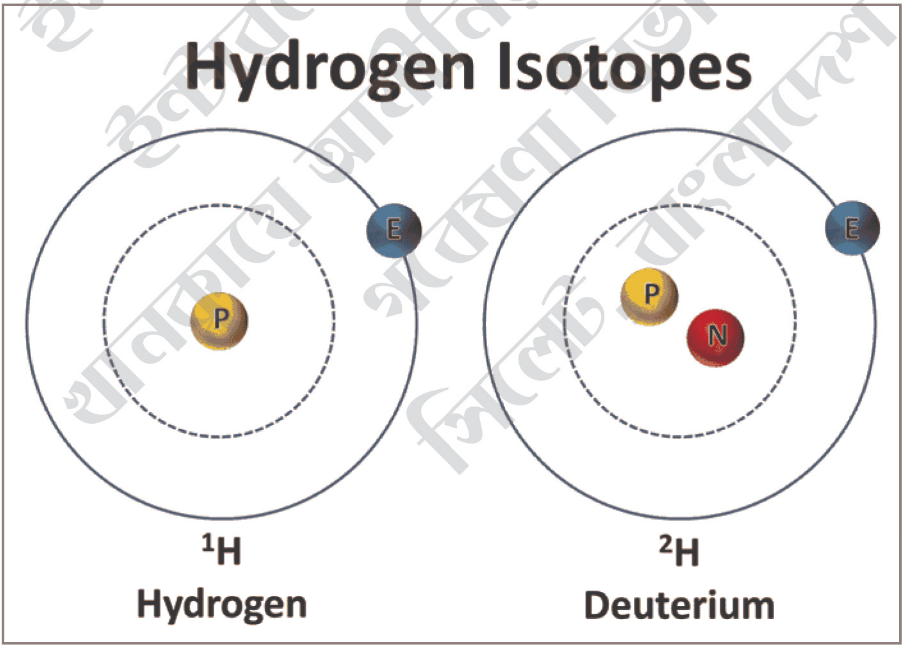


১৮৯৬ সালে জেতক্রিয়া সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। পিয়ার ও মেরী কিউরী নামক স্বামী-স্ত্রী জুটি এই ক্রিয়াকে রেডিওএক্টিভিটি নামকরণ করেন। তাঁরা প্রমাণ করেন যে, ইউরেনিয়াম (আনবিক বোমা তৈরীর পদার্থ) হচ্ছে বাস্তবে একটি তেজক্রিয়াসম্পন্ন পদার্থ। এছাড়া পলোনিয়াম ও রেডিয়ামে যে তেজক্রিয়া আছে তা-ও তাঁরা আবিষ্কার করেন। শেষোক্ত দুটি পদার্থের হাফ-লাইফ বা অর্ধ-জীবন [এ ব্যাপারে একুট পরেই আলোচিত হবে] অনেকটা কম এবং ইউরেনিয়াম থেকেও এগুলো বেশি রেডিওএক্টিভ (তেজক্রিয়াসম্পন্ন)।

এটমের নিউক্লিয়াস

তেজক্রিয়াকে বুঝতে হলে এটমের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র নিয়ে আবারও আমাদের গবেষণা করতে হবে। আমরা জানি এটমের কেন্দ্রে দুটি পরমাণু আছে- এর একটি হলো প্রটোন (চার্জ- ধণাত্মক) এবং নিউট্রন (চার্জ- নেই)। এ দুটিকে একত্রে বলে নিউক্লিওন্‌স। আমরা এটাও জানি একটি এটমে সমপরিমাণ ইলেকট্রন ও প্রটোন

আছে। তাই নেগেটিভ চার্জ সম্বলিত ইলেকট্রন ও পজিটিভ চার্জ সম্বলিত প্রটোন থাকায় এটমের মধ্যে একটি ব্যালান্স তৈরী হয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি এটমের নিউক্লিয়াসে যেসংখ্যক প্রটোন থাকে সেটাকে বলে এটমিক নাম্বার এবং যতোটি নিউক্লিওন্‌স আছে তা হলো এটমের ম্যাস নাম্বার। পিরিওডিক টেবিল থেকে সহজেই দেখা যায় যে, প্রতিটি ইলেমেন্ট বা মৌলিক পদার্থেরই একেকটি আলাদা এটমিক নাম্বার আছে। তবে এটমের কেন্দ্রে একই পদার্থের ম্যাস নাম্বার (ওজন নাম্বার) ভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ একই পদার্থের এটমের নিউক্লিয়াসে এটমিক নাম্বার একটি হলেও এর মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকতে পারে। এই প্রতিটি (অর্থাৎ কতটি ভিন্ন ম্যাস আছে সে হিসেবে) ভিন্নতাকে বলে এই ইলেমেন্টের আইসোটপ। সুতরাং একই পদার্থের বিভিন্ন আইসোটপ থাকতে পারে। সাধারণত এটম যতো ভারী হবে এর আইসোটপের সংখ্যাও ততো বেশি হবে।



তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, পদার্থের ম্যাস নাম্বার ভিন্ন হলে এটাকে বলে আইসোটপ। এখন একই পদার্থের ভিন্ন আইসোটপকে আমরা কিভাবে সনাক্ত করবো। বিজ্ঞানীরা সাধারণত এই পরিচিতিকরণের জন্য পদার্থের নামের সাথে হাইফ্যান যোগ করে ম্যাস নাম্বারটি সংযুক্ত করেন। যেমন "কার্বন- ১৪"। অন্য আরেকটি লেখনপদ্ধতি হলো C_{14}। এখানে C হচ্ছে কার্বনের কেমিক্যাল সংকেত।

স্থিতিশীল ও অস্থির নিউক্লিয়াস

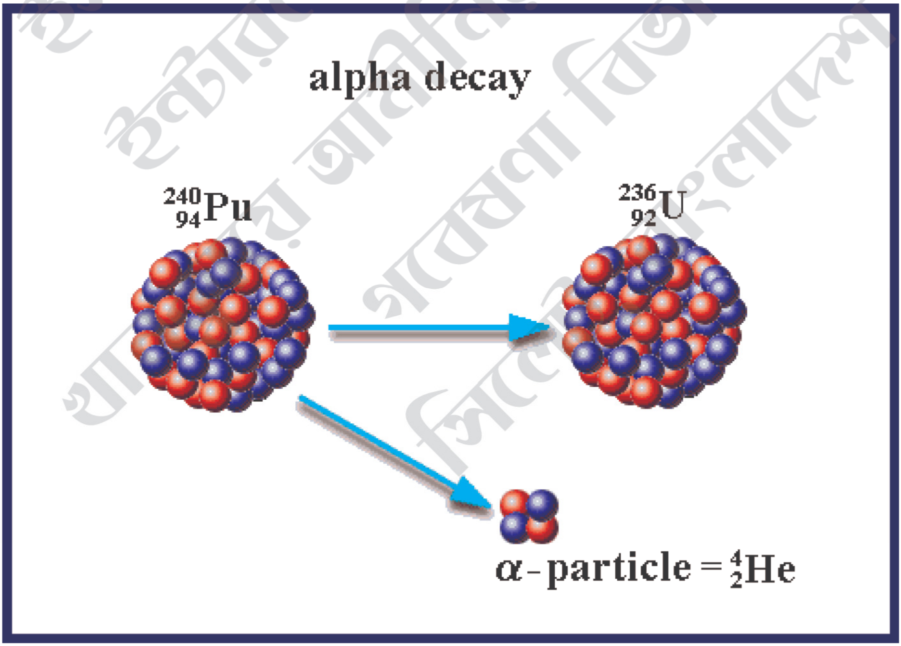
আগেই বলেছি, কোন এটমের স্থিতিলীশতা নির্ভর করে এর নিউক্লিয়াসে কটি নিউট্রন ও প্রটোন আছে সেটার উপর। অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রটোন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ যদি সামঞ্জস্য বা ব্যালান্স সৃষ্টি করে তবে এটমটি হবে স্থিতিশীল। সব এটম কিন্তু এভাবে স্থিতিশীল নয়।



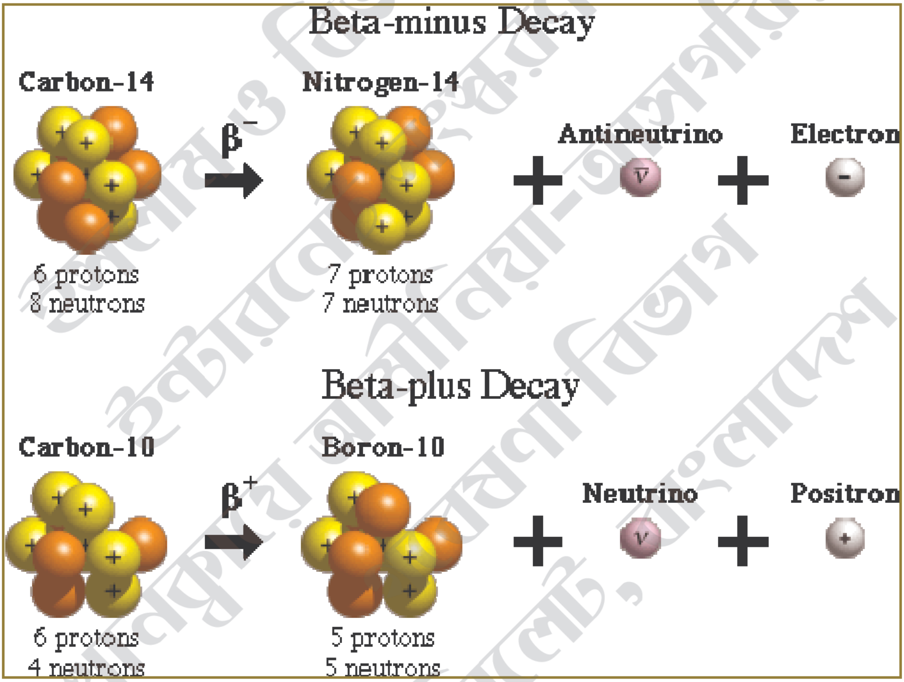
স্থিতিশীল ও অস্থির নিউক্লিয়াস

কিছু কিছু এটমের বা পদার্থের নিউক্লিয়াস অস্থিরও আছে। তবে এ অবস্থায় নিউক্লিয়াসটি থাকতে চায় না। সে চায় ব্যালান্স। সুতরাং সে তার নিউক্লিয়াসের কিছু নিউক্লিওন্‌স (প্রটোন ও নিউট্রন) দূরে ছেড়ে দেয় যাতে স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এই অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াসকে বলে রেডিওআইসোটপ। আর এই দূরে ছেড়ে দেয়া বা বহিষ্ককরণকেই বলে রেডিওএক্টিভিটি বা তেজক্রিয়তা।

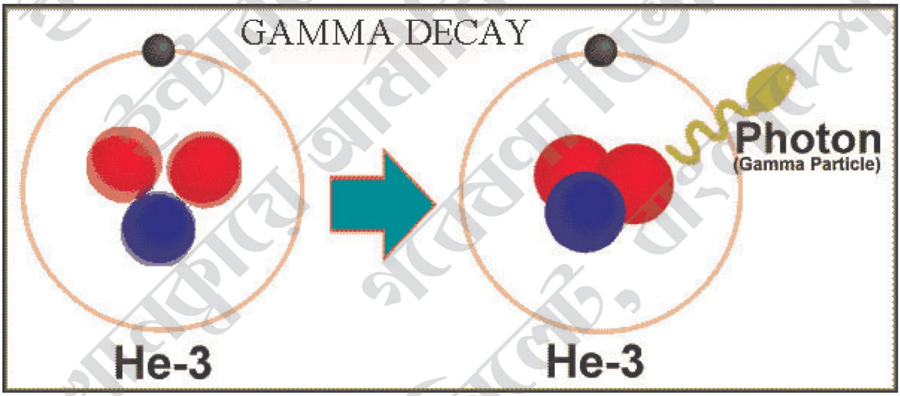
তেজক্রিয়তার মাধ্যমে পদার্থের মধ্যে রদবদল ঘটে। কালে এক পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তবে এটমের নিউক্লিয়াসের ওজনের উপর নির্ভর করে- এ পরিবর্তনে সময় কতটুকু ব্যয় হবে।



এই পরিবর্তন হওয়ার কয়েকটি ধারা আছে। তেজক্রিয়ার বা রেডিয়েশনের মাধ্যমে উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন পার্টিকেল বা পরমাণু বিকিরণ হয়। বাস্তবে সাধরণত তিন ধরণের পার্টিকেল বিকিরণ হয়ঃ এক. আলফা পার্টিকেল, দুই. বিটা ডিকে (ক্ষয়) ও তিন. গামা রেইজ (রশ্মি)।



আলফা ও বিটা পার্টিকেল ক্ষয়ের কারণে পদার্থের নিউক্লিয়াসে চার্জের মাধ্যমে তা অপর পদার্থে রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে গামা রশ্মি হচ্ছে একধরণের আনবিক এনার্জি বিকিরণ। আলফা পার্টিকেল একমাত্র উচ্চ ম্যাসসম্পন্ন (ওজনবিশিষ্ট) ইলেমেন্ট থেকে বিকিরণ হয়। আলফা পার্টিকেল হিলিয়াম নামক পদার্থের কিউক্লিয়াসের সমান। অর্থাৎ এতে আছে দুটি প্রটোন ও দুটি নিউট্রন। রেডিওআইসোটপ থেকে এই পার্টিকেল ক্ষয় হলে পদার্থের নিউক্লিয়াস বদলে অন্য পদার্থে পরিণত হয়। কারণ এটা দুটি প্রটোন ও দুটি নিউট্রন নিয়ে চলে যায়। যেমন রেডিয়াম-২২৬, আলফা পার্টিকেল রেডিয়েশনের মাধ্যমে রেডন-২২২-এ রূপান্তরিত হয়। অপর আরেকটি পরিবর্তন হচ্ছে পলোনিয়াম-২০৯ থেকে লেড-২০৫ [সীসা]-এ পরিণত হওয়া।

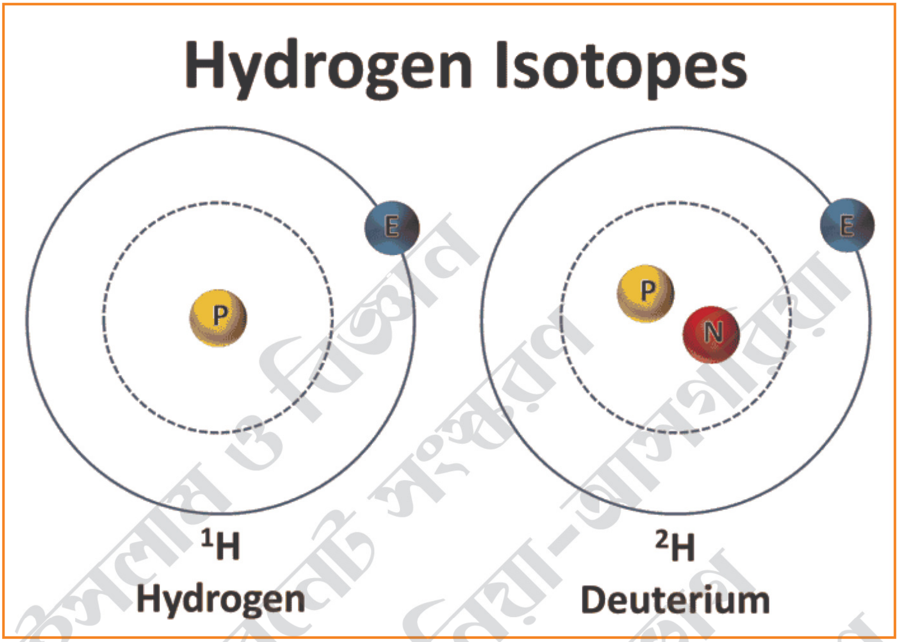


বিটা পার্টিকেল হচ্ছে দুধরণের। এর একটিকে বলে নিগেট্রন (বা ইলেকট্রন) আর অপরটিকে বলে পজিট্রন। কোন কোন রেডিওআইসোটপ যার মধ্যে অতিরিক্ত নিউট্রন আছে তা হয়তো একটি নিউট্রনকে প্রটোনে রূপান্তরিত করে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে। এই প্রসেসেই পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকে একটি নেগেটিভ বিটা

পার্টিকেল ছেড়ে দেয়া হয়। সুতরাং বিটা বিকিরণের মাধ্যমে এটমিক নাম্বার এক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই রদবদলের মাধ্যমে কিছু অতিরিক্ত এনার্জি নিউক্লিয়াসে জমা হতে পারে। এটম এই এনার্জিকে মুক্ত করতে যেয়ে গামা রশ্মি বিকিরণ করে। এই প্রসেসে যেসব পদার্থ পরিবর্তন হয় তার উদাহণর হচ্ছে ফোসফোরাস-৩২ থেকে সোলফার-৩২ এবং কোবল্ট- ৬০ থেকে নিকেল- ৬০।

রেডিওআইসোটপের অতিরিক্তি প্রটোন অপর আরেকটি উপায়ে বদলে যেয়ে স্থিতিশীল হতে পারে। এই প্রসেসকে বলে পজিটিভ বিটা পার্টিকেল বা পজিট্রন বিকিরণ। নিউক্লিয়াসের একটি প্রটোন নিউট্রনে রূপান্তরিত হয় পজিট্রন বিকিরণের মাধ্যমে। সুতরাং এরফলে এটমিক নাম্বার একটি সংখ্যা কমে যায়। আর এই রদবদলের সময় যে অতিরিক্ত এনার্জি নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে আসে তা হলো গামা রশ্মি তেজষ্ক্রিয়া। পজিট্রন বিকিরণের উদাহরণ হলো নাইট্রোজেন-১৩ থেকে কার্বন-১৩ এবং অক্সিজেন-১৫ থেকে নাইট্রোজেন-১৫-তে রূপান্তর।

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, গামা রেডিয়েশন সাধারণত ফোটন হিসেবে (অর্থাৎ তেজষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে) বিটা রেডিয়েশনের প্রসেস থেকে সৃষ্টি হয়। পজিটিভ ও নেগেটিভ বিটা রেডিশয়েশন থেকে সৃষ্ট অতিরিক্ত এনার্জি নিউক্লিয়াস থেকে তেজষ্ক্রিয়া হিসেবে বিকিরণ হওয়াই হচ্ছে গামা রশ্মি। তবে কিছু নিউক্লিয়াস আছে যারা এমনিতেই এই তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ করে। এ ধরণের রেডিয়েশন কিন্তু পদার্থের নিউক্লিয়াসের এটমিক নাম্বার কিংবা ম্যাস নাম্বার রদবদল করে না। অর্থাৎ পদার্থটি বদলে অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। এই উপায়ে মূলত নিউক্লিয়াসের অতিরিক্ত এনার্জি মুক্ত করে দেয়া হয়। এরূপ গামা রেডিয়েশনের একটি উদাহরণ হচ্ছে আয়োডাইন-১৩১ রেডিওআইসোটপ।



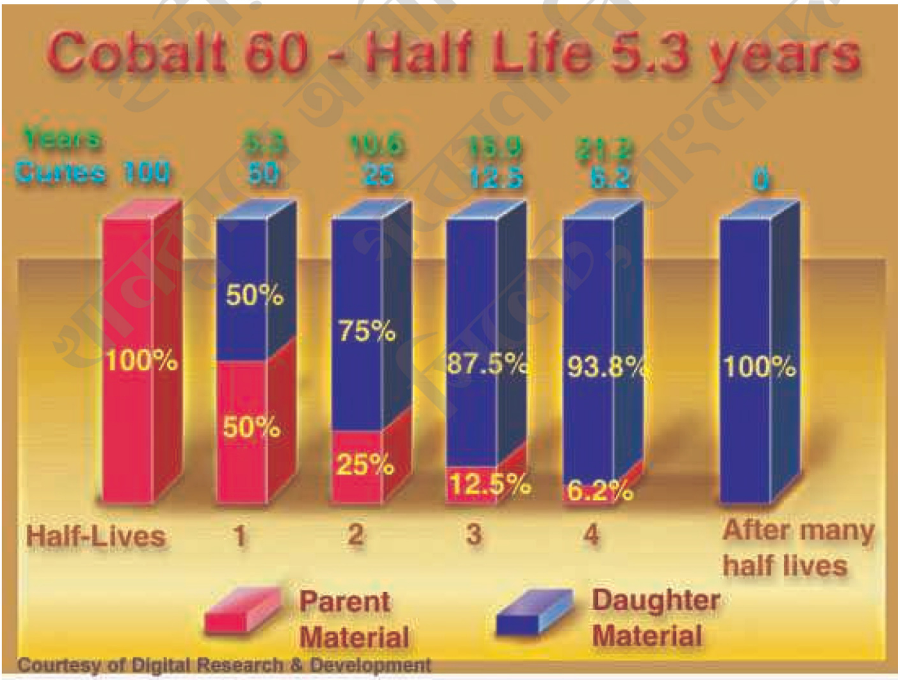
একটি বিশেষ ক্ষয়ের (তেজস্ক্রিয়ার) উদাহরণ হচ্ছে রেডিয়াম-২২৩। এই রেডিওআইসোটোপ থেকে একটি কার্বন নিউক্লিয়াস (কার্বন-১৪) ক্ষয় হয়ে তা লেড-২০৬ (সীসা- ২০৬)-এ রূপান্তরিত হয়।

অর্ধ-জীবন (টি ১/২)

রেডিওএক্টিভিটির সঙ্গে হাফ-লাইফ নামক কথাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হাফ-লাইফ বা অর্ধ-জীবন হচ্ছে, একটি রেডিওএক্টিভ বা তেজস্ক্রিয়াশীল আইসোটোপ, তার প্রাথমিক ম্যাস (ওজন) অর্ধেকে কমে আসতে যেটুকু সময় নেয়- তা-ই। অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আইসোটোপের ওজন কমে আসে। পূর্বের তুলনায় অর্ধেক ওজনবিশিষ্ট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়- এই সময়টি হলো অর্ধ-জীবন। তবে অর্ধ-জীবন একটিই নয়- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি অর্ধ-জীবন আছে। অর্থাৎ এক অর্ধ-জীবন বাদে ৫০% ম্যাস অবশিষ্ট থাকে, দুই অর্ধ-জীবন অতিবাহিত হলে ম্যাস থাকে ২৫%, তিন অর্ধ-জীবন বাদে থাকবে ১২.৫% ওজন

ইত্যাদি। এই প্রসেসে কিন্তু একটি পদার্থ অপর আরেকটি পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকে। তবে সাধারণত অনেক পদার্থেরই অর্ধ-জীবন অত্যন্ত দীর্ঘ। উদাহরণস্বরূপ রেডিয়াম- ২২৬-এর কথা বলা যেতে পারে। এর অর্ধ-জীবন হলো ১,৬০০ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে এর ম্যাস হবে ৫০% এবং এটি পরিবর্তিত হবে অপর পদার্থ রেডন- ২২২ এবং হিলিয়াম- ৪-এ। অবশ্য কোন কোন পদার্থের হাফ-লাইফ এক সেকেন্ডের এক বিলিয়নের এক অংশও হতে পারে। আবার কোনটির অর্ধ-জীবন কোটি কোটি বছরও আছে। মনবতৈরী আইসোটপের অর্ধ-জীবন সাধারণত অতি অল্প হয়ে থাকে। তবে অকৃত্রিম পদার্থের অর্ধ-জীবন দীর্ঘ বলেই প্রতীয়মান হয়।

কিছু সুপরিচিত পদার্থ ও তাদের অর্ধ-জীবন হলোঃ ১. ইউরেনিয়াম- ২৩৮, অর্ধ-জীবন ৫ বিলিয়ন বছর; ২. ইউরেনিয়াম- ২৩৫, অর্ধ-জীনব ৭০০ মিলিয়ন বছর; ৩. প্লেটোনিয়াম- ২৩৯, অর্ধ-জীবন ২৪,০০০ বছর; ৪. কার্বন- ১৪, অর্ধ-জীবন ৫,৬০০ বছর; ৫. কোবল্ট- ৬০, অর্ধ-জীবন ৫ বছর,; ৬. আয়োডিন- ১৩১, অর্ধ-জীবন ৪ দিন; ৭. স্বর্ণ- ১৯৮ (অস্থিতিশীল স্বর্ণ), অর্ধ-জীবন ৩ দিন; সোডিয়াম- ২৪, অর্ধ-জীবন ১৫ ঘণ্টা; ৮. ফ্লোরিন- ১৭, অর্ধ-জীবন ১ মিনিট; পলোনিয়াম- ২১৪, অর্ধ-



জীবন ০.০০০০০০০৩ সেকেন্ড (মাত্র এক মূহূর্ত) এবং সীসা, অর্ধ-জীবন নাই (এটা স্থিতিশীল)।

কার্বন ডেইটিং

তেজষ্ক্রিয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্ধ-জীবন পদ্ধতি থেকেই অতি পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক বস্তুর বা যুগের সঠিক বয়স নির্দিষ্ট করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত গবেষণায় কার্বন ডেইটিং টেকনিক বা কার্বন-তারিখনির্ধারণ পদ্ধতি আজকাল এক শক্তিশালী সিস্টেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কার্বন-ডেইটিং সিস্টেমে কয়েকটি বিষয়ের সঠিক তথ্য ব্যবহৃত হয়। এই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর দেহে কার্বন-১৪ নামক তেজষ্ক্রিয়াশীল কিছু না কিছু বস্তু থাকে। এই পদার্থটি মূলত বায়ূমণ্ডল ও প্রাণীদেহের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইয়োক্সাইডের সচরাচর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদজীবী যথাক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস ও ফটোসিন্‌থেসিসের মাধ্যমে উপর্যুক্ত দুটি গ্যাস দেহের মধ্যে প্রবেশ-বহিষ্করণ করে। এ থেকেই দেহের ভেতর কার্বন-১৪ জমা হয়। কিন্তু প্রাণী বা উদ্ভিদের যখন জীবনাবসান ঘটে তখন উপরোক্ত গ্যাস দুটোর ক্রিয়া ও রদবদল বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরই তাই দেহের ভেতরের জমাকৃত অস্থিতিশীল কার্বন-১৪ তেজষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয় হতে শুরু করে।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, কার্বন-১৪-এর অর্ধ-জীবন হলো ৫,৬০০ বছর। অর্থাৎ এই সময় অতিবাহিত হলে কার্বন-১৪ ক্ষয় হয়ে অর্ধেক পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং একটি মৃতদেহ ৫,৬০০ বছর পর জীবীত থাকতে যে পরিমাণ তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ করতো সে তুলনায় ঠিক অর্ধেক পরিমাণ তেজষ্ক্রিয়া বিকিরণ করবে। তবে অর্ধ-জীবন পরও তেজষ্ক্রিয়া কিন্তু কমে না, এটা সর্বদাই বিকিরণ করতে থাকে। সুতরাং এই রেডিয়েশন কি তা মেপে নিলেই কতদিন পূর্বে এই দেহটি পৃথিবীতে

জীবিত ছিলো তা সহজেই বের করা যায়। এই উপায়ে কোন প্রণী কিংবা উদ্ভিদের মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণকেই বলে কার্বন-ডেইটিং।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা কার্বন-ডেইটিংয়ের মাধ্যমেই অনেক পুরাতন কার্বন-বেইস্ড বস্তু ও প্রাণীর 'ফসিল' [প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাণীর দেহাবশেষ] থেকে রেডিয়েশন মেপে তা কতদিন পূর্বে জীবিত ছিলো তা জেনে নেন। যেমনঃ মিশরের মমিগুলো ঠিক কতদিনের পুরাতান তা তারা সঠিকভাবে নির্ণিত করেছেন কার্বন-ডেইটিংয়ের মাধ্যমে।

Radioactive Parent	Stable Daughter	Half life
Potassium-40	Argon-40	1.25 billion yrs
Rubidium-87	Strontium-87	48.8 billion yrs
Thorium-232	Lead-208	14 billion years
Uranium-235	Lead-207	704 million years
Uranium-238	Lead-206	4.47 billion years
Carbon-14	Nitrogen-14	5730 years

"তিনি পবিত্র, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ ও ওরা যা জানে না তার প্রতিটি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়" [সূরা ইয়া-সীন ঃ ৩৬]।

পরিচ্ছেদ ৯

বিদ্যুৎ ও চুম্বক

আধুনিক যুগে টেকনোলজির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও চুম্বক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের স্বরূপ বুঝতে না পারলে মডার্ণ প্রযুক্তির অনেককিছুই বুঝা সম্ভব নয়। এই পরিচ্ছেদে তাই আমরা প্রথমে বিদ্যুৎ ও পরে চুম্বক এবং বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ কি?

বিদ্যুৎ বাস্তাবে একটি এনার্জি বা উদ্যম। বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল চার্জ আছে। এ থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বৈজ্ঞানিক থিওরীবলীর মধ্যে বিদ্যুৎ ও চুম্বক নিয়ে গেল শতকে গভীরভাবে গবেষণা হয়েছে। বিদ্যুৎ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের ফলেই ইলেকট্রিক মটর, জেনারেটর, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, এক্স-রে যন্ত্র, কম্পিউটার, নিউক্লিয়ার এনার্জি ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া বৈদ্যুতিক বাতি দিয়ে রাতেরবেলা বড় বড় শহর, রাস্তাঘাট, ফুটবল খেলার মাঠ ইত্যাদি দিনের মতো আলোকিত করা হচ্ছে। আজকের আধুনিক সভ্যতা অনেকটা বিদ্যুতের উপর নীর্ভরশীল।

বিদ্যুৎ আগেই বলেছি, ইলেকট্রিক চার্জ থেকে সৃষ্ট। আপনি যদি আম্বার নামক একখণ্ড মিনারেল জাতীয় বস্তুকে এক টুকরো লোমযুক্ত চামড়া দিয়ে ঘর্ষণ করেন তবে আম্বার খণ্ডটি এমন হবে যে, এর কাছে পালক কিংবা কাগজের টুকরো নিয়ে আসলে তা আকর্ষিত হবে। আম্বারের এই গুণ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জানতো। তবে

এর কারণ জানা ছিলো না। গ্রীক ভাষায় আম্বারকে বলে, ইলেকট্রন। এই শব্দ থেকেই ইলেকট্রিক শব্দটি এসেছে। আম্বারের এই গুণ সম্পর্কে ষষ্ঠ শতকে গবেষকরা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং অন্যান্য বস্তু, যেমন কাঁচের মধ্যে এই গুণ আবিষ্কার করেন। এছাড়া আরও একটি তথ্য বেরিয়ে এলো যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আকর্ষণের স্থলে বিকর্ষণও সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ঘর্ষণ থেকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুটিই সৃষ্টি হয়। সুতরাং বিজ্ঞানীরা আকর্ষণের নামকরণ করলেন, পজিটিভ (ধনাত্মক) ও বিকর্ষণকে নাম দিলেন নেগিটিভ (ঋণাত্মক) চার্জ। তাহলে বৈদ্যুতিক উপায়ে চার্জকৃত কোন বস্তু হওয়ার অর্থ দাঁড়ালো, এই বস্তু হয় অপর কোন বস্তুকে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ করবে।



এই ইলিকট্রিক চার্জ আবিষ্কারের ফলে এটা স্পষ্ট হলো যে, সব বস্তুর মধ্যেই এই চার্জ আছে যা সৃষ্টি করা যায় না কিংবা ধ্বংস করাও সম্ভব নয়। এই শক্তিটি নেচারেল শক্তি। চার্জ করা কোন বস্তু থেকে ইলেকট্রিসিটি স্বভাবতই অপর বস্তুতে চলমান হয়। অর্থাৎ নেগিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জের প্রতি চলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে। আর এই চলার নামই হলো ফ্লো অব ইলেকট্রিসিটি বা কারেন্ট। যেমন একটি ইলেকট্রিক

সার্কেটে বেটারীর নেগিটিভ টার্মিনাল থেকে পজিটিভ টার্মিনালের দিকে কারেন্ট চলে। কারেন্ট-এর শাব্দিক অর্থ হলো চলমান থাকা। যেমন নদীর স্রোতকেও ইংরেজীতে কারেন্ট বলে। তবে আজকাল পারিভাষিক অর্থে কারেন্ট শব্দটি ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ইলেকট্রন নামক পরমাণু বৈদ্যুতিক তারের (কন্ডাকটার) ভেতর দিয়ে চলার নামই হচ্ছে 'কারেন্ট'।

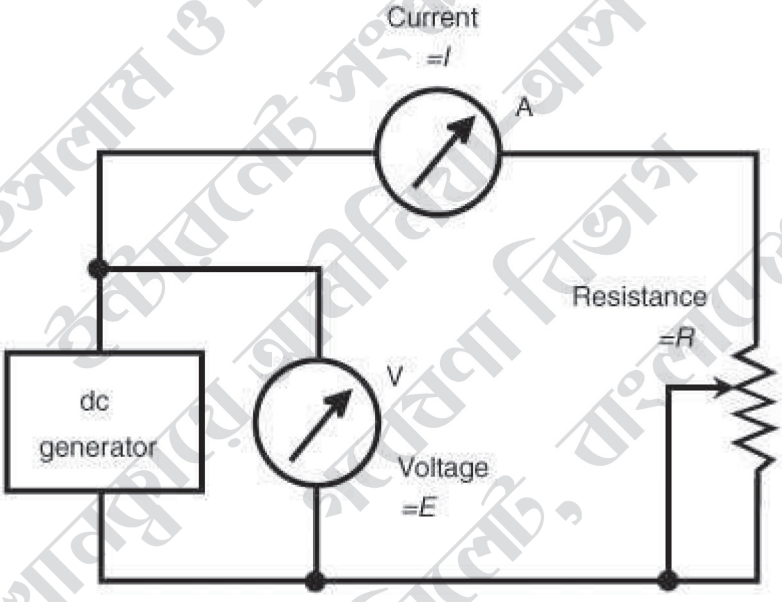
ব্যাটারী

ব্যাটারীর মধ্যে পজিটিভ ও নেগিটিভ চার্জ আছে। যখন কোন তার দিয়ে দুটি টার্মিন্যাল সংযোগ করা হবে তখন নেগেটিভ টার্মিন্যাল থেকে পজিটিভ টার্মিন্যালের দিকে ইলেকট্রিসিটি চলমান হবে। এই চলার রাস্তায় যদি অন্য কোন ইলেকট্রিক বস্তু যেমন লাইট-বাল্ব থাকে, তবে তা জ্বলে উঠবে। লাইট-বাল্ব জ্বলার কারণ হলো, চলমান চার্জের মধ্যকার এনার্জি। ব্যাটারী বাস্তবে কেমিক্যাল এনার্জিকে বিদ্যুতে পরিণত করে।



ইলেকট্রিক্যাল ভলটেজ

বৈদ্যুতিক উপায়ে যে কোন সিস্টেম থেকে যে পরিমাণ কর্ম বা এনার্জি সম্ভব তা হলো ভলটেজ। সুতরাং ভলটেজ হলো এনার্জির পরিমাণ নির্ণয়ের একটি ইউনিট। এনার্জি যতো বেশী হবে ভলটেজও ততো বেশী হবে। যে কোন ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটে ভল্টমিটার নামক একটি যন্ত্র সংযোগ করে ভলটেজ মাপা যায়।



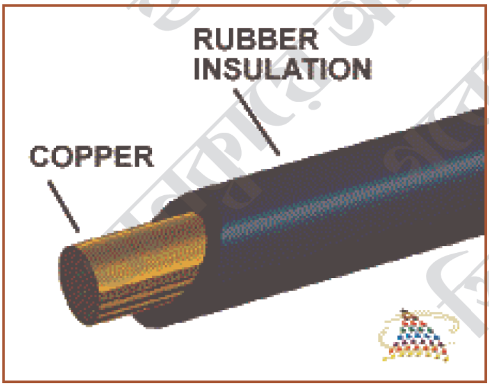
কারেন্ট

ইলেকট্রিক চার্জ চলমান থাকার নামই হচ্ছে ইলেকট্রিক কারেন্ট। কারেন্টে শক্তি কি পরিমাণ ইলেকট্রিক চার্জ প্রতি সেকেন্ডে চলমান আছে সেটার উপর নির্ভরশীল। কারেন্টকে আমপায়ার বা আম্প নামক ইউনিট দিয়ে মাফা হয়। ১ আম্প অর্থ হলো,

প্রতি সেকেন্ডে ১ কুলোম্ব (ইলেকট্রিক চার্জের পরিমাণ) চার্জ। আমিটার নামক একটি যন্ত্র দিয়ে কারেন্ট মাপা যায়।

ইনস্যুলেটর ও কন্ডাক্টার

ইলেকট্রিক চার্জ সব বস্তুর ভেতর দিয়ে সমানভাবে চলে না। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বেশীরভাগ বস্তুর ভেতর দিয়ে কারেন্ট কম চলে। এসব বস্তুকে বলে ইনস্যুলেটর। ইনস্যুলেটরের এটমগুলো সহজে তাদের ইলেকট্রনকে ছেড়ে দেয় না। অর্থাৎ কারেন্ট চলতে হলে যে পরিমাণ ইলেকট্রনের প্রয়োজন সে পরিমাণ ইলেকট্রন এসব বস্তুতে স্বাধীন নয়- এটমের নিউক্লিয়াস এগুলোকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে। তবে ইলেকট্রিক ফিল্ড সৃষ্টি করে কিছু ইলেকট্রন মুক্ত করে দিলে এগুলো থেকেও কারেন্ট চলমান হয়। যে উপায়ে তা করা হয় তাকে বলে আয়োনাইজেশন। আয়োনাইজেশনের মাধ্যমেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। মাটি ও মেঘের মধ্যে চার্জ যখন আলাদা হয় তখন একটি শক্তিশালী ইলেকট্রিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়। এই ফিল্ড মেঘ ও মাটির মধ্যবর্তী বায়ুকে আয়োনাইজ করে ফেলে (ইলেকট্রিসিটি চলার পথ সৃষ্টি করে দেয়)। এ থেকে সৃষ্টি হয় বৈদ্যুতিক চমক। অর্থাৎ আয়োনাইজ বায়ূ কন্ডাক্টার হিসেবে কাজ করে।



কণ্ডাক্টার ঐসব বস্তু যার ভেতর দিয়ে কারেন্ট তথা ইলেকট্রিক চার্জ সহজে চলতে পারে। এদের এটম ইলেকট্রনগুলোকে খুব শক্তভাবে ধরে রাখে না। ফলে সামান্য ইলেকট্রিক ফোর্স থেকেই কারেন্ট চলমান হয়। আজকাল বহুল ব্যবহৃত একটি কণ্ডাক্টার হলো তামা। আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রিক সার্কেটে এই তামার ব্যবহার দেখে থাকি।

রেজিসটেন্স

কণ্ডাক্টারে চলমান চার্জ তথা ইলেকট্রনকে ইলেকট্রিক ফোর্স বা ফিল্ড দিয়ে চালাতে হয়। এতে এনার্জির প্রয়োজন। ইলেট্রনগুলো কিছুদূর অগ্রসর হয়েই কিন্তু কণ্ডাক্টারের কোন না কোন এটমের সঙ্গে সংঘর্ষে লপ্তি হয়। এতে তা ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে যায় এমনকি একেবারে স্থির হতেও পারে। এরফলে চলমান ইলেকট্রন থেকে এনার্জি এটমে স্থানান্তরিত হয়ে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই এনার্জি তখন কারেন্টের বিপরিত শক্তি বা রেজিসটেন্স সিহেবে কাজ করে। যে কোন বস্তুর মধ্যে কতটুকু রেজিসটেন্স আছে তা যে ইউনিট দিয়ে মাপা হয় তার নাম হলো অমিটার। কোন বস্তুতে কতটুকু রেজিসটেন্স আছে তা নির্ভর করে বস্তুর ব্যাস (তারের ক্রস-সেকশনের পরিমাণ), ভলটেজের পরিমাণ, বস্তুর দ্যৈর্ঘ এবং বস্তুটির কণ্ডাক্টিভিটি (এটা কতটুকু চার্জ কনডাক্ট করতে পারে) ইত্যাদির উপর। কোন কোন বস্তুর রেজিসটেন্স অত্যন্ত বেশী, আবার কোনটির অতি অল্প। সম্প্রতি সীসার তাপমাত্রা কমিয়ে এবস্যুলুট শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে দেখা গেছে, এটার রেজিসটেন্স প্রায় একেবারে যিরোতে পৌঁছেছে। যেসব বস্তুতে এরূপ অল্প রেজিসটেন্স বিদ্যমান এগুলোকে বলে সুপারকনডাক্টার। সাধারণত অল্প তাপমাত্রায় বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এই সুপারকনডাক্টিভিটি বিদ্যমান।



কণ্ডাক্টার যেমন কারেন্ট চলার জন্য জরুরী তেমনি কারেন্ট থেকে তাপ-এনার্জি কিংবা লাইট-এনার্জি পেতে আমাদেরকে রেজিসস্টারও ব্যবহার করতে হয়। ইলেকট্রিক হিটার ও লাইট-বাল্ব এর 'ফিলামেন্ট' [যে তার বা কয়েলটি জ্বলে ওঠে] হচ্ছে এরূপ একেকটি রেজিসস্টার।

চুম্বক কি?

চুম্বকীয় শক্তি এমন একটি ফোর্স যা কোন বস্তুর মধ্য থেকে বেশ দূর পর্যন্ত প্রভাবশীল হতে পারে। যেটুকু দূরত্ব পর্যন্ত মেগন্যাটিক ফোর্স ক্রিয়াশীল থাকে সেই এলাকাকে বলে মেগন্যাটিক ফিল্ড। দুটি বস্তুর মধ্যে যদি চুম্বকীয় শক্তি বিদ্যমান থাকে এবং একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে তবে তা হবে পজিটিভ বা ধনাত্মক ফোর্স। কিন্তু যদি একটা আরেকটাকে বিকর্ষণ করে তাহলে তা নেগিটিভ বা ঋণাত্মক ফোর্স। যেসব বস্তুর মধ্যে মেগন্যাটিক শক্তি আছে এগুলোকে বলে মেগনেট বা চুম্বক।



আমরা অহরহ চুম্বক ও এর ক্রিয়া দেখতে পাই। একটি স্ক্রু ড্রাইভারের মাথায় চুম্বকশক্তি থাকায় এটি দ্বারা স্ক্রুগুলোকে এমনিতে ধরে রাখা যায়; কম্পাস মূলত একটি চুম্বক যা পৃথিবীর উত্তরমেরুর দিকে আকর্ষিত হয়ে সেদিকে স্থির হয়। এগুলো হচ্ছে চুম্বক। কিন্তু বাস্তবে সমস্ত পৃথিবীটাও একটি বিরাট চুম্বক এবং প্রায় সব বস্তুতেই কিছু না কিছু চুম্বকশক্তি আছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা চুম্বক নয় এমন বস্তুর মধ্যেও চুম্বকের শক্তি মাপা যায়।

চুম্বক সম্পর্কে আমাদের সবার ধারণা থাকলেও এই চুম্বক আজকের টেকনোলজিতে যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সে ব্যাপারে আমরা কতটুকু ওয়াকিবহাল? সাধারণ স্ক্রু ড্রাইভার থেকে, ইলেকট্রিক মটর, জেনারেটর, হাই-টেক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতিতে এই চুম্বক ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া লাউড স্পীকার, টেপ রেকর্ডিং, কম্পিউটার ইত্যাদিতেও চুম্বকের ব্যবহার অপরিহার্য।

মোটকথা চুম্বক যেহেতু বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই যে কোন বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক বস্তুতে এর ব্যবহার করা একান্ত জরুরী।

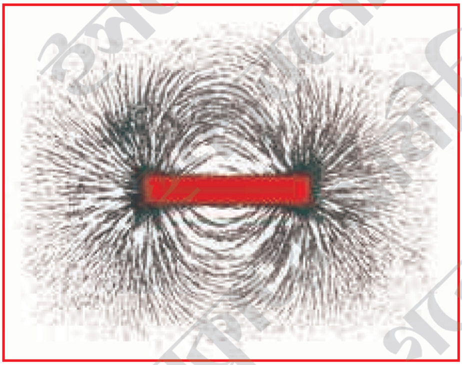
চুম্বক সাধারণত দুধরণের হয়ে থাকে: ১. সাধারণ চুম্বক ও ২. বৈদ্যুতিক-চুম্বক (ইলেকট্রমেগন্যাট)। সাধারণ চুম্বকের দুটি মেরু বা পোল আছে। একটি হচ্ছে উত্তর ও অপরটি দক্ষিণ মেরু। অর্থাৎ একটি উত্তরমেরুর দিকে ও অপরটি দক্ষিণমেরুর দিকে আকর্ষিত হয়। দুটি ভিন্ন চুম্বকের একই ধরণের মেরু বিকর্ষণ আর ভিন্ন ধরণের মেরু আকর্ষণ সৃষ্টি করে। চুম্বকের এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত একাধিক ফোর্স লাইন আছে। প্রাকৃতিকভাবে কিছু বস্তু এমনিতেই একেকটি চুম্বক। যেমন আয়রন অক্সাইড। এসব বস্তুকে বলে পারমানেন্ট বা স্থায়ী চুম্বক। তবে স্থায়ী চুম্বক কৃত্রিম উপায়েও সৃষ্টি করা যায়। এরজন্য বিশেষ ধরণের পদার্থের প্রয়োজন যেমন, লৌহ, নিকেল ইত্যাদি। স্থায়ী চুম্বক তৈরী সহজ। একটি পারমানেন্ট চুম্বকের ফিল্ডে একই দিকে বস্তুকে ঘর্ষণ কিংবা চলমান রাখলেই তা চুম্বকে পরিণত হবে। এই সৃষ্ট স্থায়ী চুম্বকের শক্তি ধ্বংসও করা যায়। একে উক্ত স্থায়ী চুম্বকের সঙ্গে উল্টো দিকে ঘর্ষণ কিংবা ফিল্ডে চলমান রাখলে তার চুম্বকশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এ হচ্ছে প্রথম ধরণের চুম্বক।



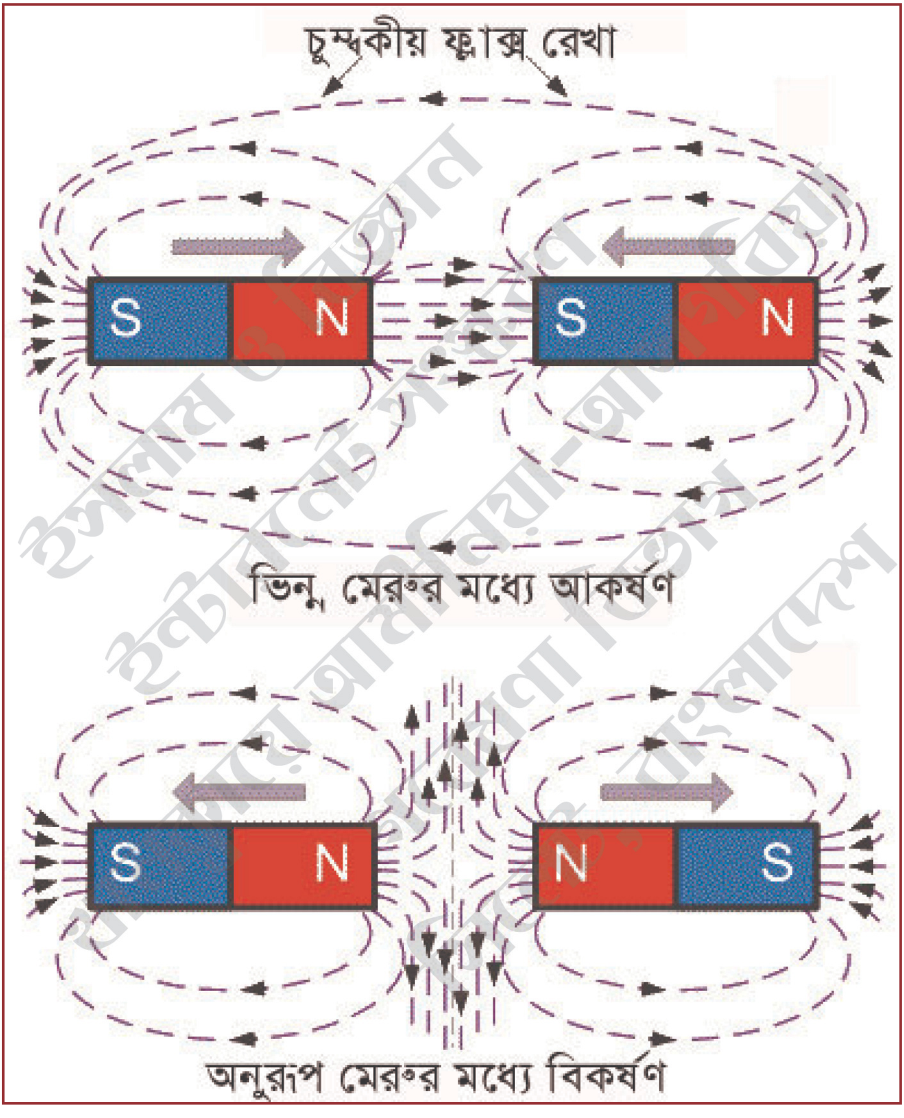
দ্বিতীয় ধরণের চুম্বক হলো ইলেকট্রমেগন্যাট বা বৈদ্যুতিক চুম্বক। আর এই চুম্বকটিই আজকাল বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা দেখেছি কিভাবে স্থায়ী চুম্বকের সঙ্গে ঘর্ষণের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক তৈরীও করা যায় আবার ধ্বংসও করা যায়। চুম্বকের যেহেতু আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি আছে তাই এটিকে তৈরী ও ধ্বংস করার সহজ এবং

স্বয়ংক্রিয় কোন পদ্ধতি পাওয়া গেলে বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহার অনেকটা সহজ হয়ে উঠে। এখানেই আসে ইলেকট্রমেগন্যাটের ব্যবহার।

যে বস্তুটি চুম্বক ও চুম্বক-নয় হিসেবে কাজ করবে তাকে যদি বৈদ্যুতিক তার দ্বারা পেছিয়ে কারেন্ট চলমান করা হয় তাহলে সেটা চুম্বকশক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে- আবার কারেন্ট চলা বন্ধ হলেই সে চুম্বকীয় শক্তি হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ এটা চুম্বক কিংবা চুম্বক-নয় তা কারেন্ট চলার উপর নির্ভরশীল। এরূপ চুম্বকের নামই হচ্ছে বৈদ্যুতিক-চুম্বক। টেকনোলজিষ্টরা তাই ইচ্ছেমতো এই চুম্বককে ব্যবহার করতে পারেন। তার থেকে শক্তির প্রয়োজন হলে কারেন্ট চালানো হয়- আর শক্তির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই কারেন্ট বন্ধ করে এটিকে শক্তিহীন করা হয়। সাধারণতঃ লোহার ধাতু দিয়ে বৈদ্যুতিক-চুম্বক তৈরী করা হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক চুম্বক যন্ত্রপাতির ভেতর সুইচ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। এরূপ সুইচকে বলে রিলে।



বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ব্যবহার আজকের প্রযৌক্তির যুগে কি পরিমাণ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। প্রায় প্রতিটি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ ও চুম্বক- বিশেষকরে বৈদ্যুতিক চুম্বকের প্রয়োজন পড়ে। এ দুটি নেচারেল এনার্জি মূলতঃ মৌলিক শক্তি ইলেকট্রমেগন্যাটিক ফোর্স (স্বভাবের চার মৌলিক শক্তির একটি) থেকে উদ্ভুত। আজকের জগতে কোন প্রযুক্তিসম্পন্ন অর্থনীতিতে ইলেকট্রিসিটি ও মেগন্যাটিজম যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা অতীতে কোন সময়ই ছিলো না। সুতরাং প্রযুক্তির এই ফিল্ডে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা যে কোন অর্থনীতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে টেকনোলজিক্যাল উত্তানে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের উপর গভীর গবেষণার লক্ষ্যে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ, বলতে গেলে আজকের প্রযুক্তির মেরুদণ্ডই হচ্ছে এই দুটি বিষয়।


চুম্বকীয় ফ্লাক্স রেখা
S
N
S
N
ভিন্ন মেরুর মধ্যে আকর্ষণ
S
N
N
S
অনুরূপ মেরুর মধ্যে বিকর্ষণ

"পড়! তোমার প্রতিপালক মহামহিম; যিনি শিখিয়েছেন কলমের দ্বারা; শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না" [সূরা আলাক্ব ঃ ৩-৫]।

পরিচ্ছেদ ১০

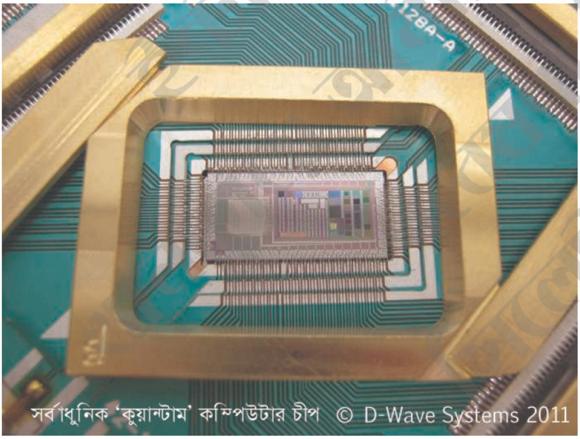
কম্পিউটার বিপ্লব

আজকের জগতে কম্পিউটার শুধু একটি যন্ত্র নয় বরং এক বিরাট বিপ্লবের নাম। এখন ঘরে ঘরে কম্পিউটার এসেছে। এসেছে এর মাধ্যমে তথ্য প্রচারের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ইন্টারনেট। কম্পিউটার তাই আমাদের জীবন চলার একটি নির্ভরযোগ্য উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে, এমনকি এটার উপর আমরা অনেকে নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। এই গ্রন্থটির একটি অক্ষরও আমি কলম দিয়ে কাগজে লিখি নি। আমার আপেল কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে এই পুরো পুস্তকটি রচনা করেছি। এরপর আবার লেখাটিকে পিসি (পার্সোন্যাল কম্পিউটার) ফরমেটে কনভার্ট (পরিবর্তন) করেছি নিজেই একটি কনভার্টার প্রোগ্রাম তৈরী করে। কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আজকাল সবার জন্য একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনায় কম্পিউটার প্রযুক্তির কথা না আসলে পুরো বিষয়টিই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই পরিচ্ছেদে ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাসহ এবার কম্পিউটার বিপ্লবের কথা আমি বিস্তারিত আলোচান করবো।



আজ থেকে ৩৬ বছর আগের কথা, ১৯৭৭ ইংরেজীর শীতকাল। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। হেভী শীতের কাপড় পরে ভোরে ঘর থেকে বের হয়েছি, বিকেল এক ঘটিকার আগে (ইংল্যান্ডের) লিভারপুল ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুতেই হবে। ওখানে ভর্তি হবার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, তাই ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ইউনিভার্সিটি ডেকেছে। সাসেক্সের ছোট্ট একটি টাউন- বেক্সহিল-অন-সি, ঐতিহাসিক হেস্টিংস শহরের নিকটে ইংলিশ চ্যানেলের সৈকতে। এই হেস্টিংয়ের অদূরে ব্যাটেল নামক একটি জায়গা আছে। সেখানে ১০৬৬ সালে উইলিয়াম দ্যা কনক্যুরার নামক এক রাজা ফ্রান্স থেকে এসে ইংল্যান্ডের বাদশাহ হ্যারডকে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন। অনেকের মতে, বৃটিশদের ইতিহাস এই বছর অর্থাৎ ১০৬৬ থেকেই শুরু হয়েছে!

বেক্সহিল-অন-সি থেকে লিভারপুল অনেক দূরে। যাক, প্রথমে রেলপথে লন্ডনের ইউস্টনে এসে এখান থেকে আবার ইন্টারসিটি-১২৫ (১২৫ মাইল বেগে চলমান ইলেকট্রিক লকোমোটিভ) ট্রেনে সময়মতো লিভারপুলে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম।


সর্বাধুনিক 'কুয়ান্টাম' কম্পিউটার চীপ © D-Wave Systems 2011

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী এসেছে ইন্টারভিউ দিতে। ওয়েটিং রুমে বসে একবার ভাল করে তাকালাম- না আর কোন বাঙ্গালী ছাত্র চোখে পড়লো না, আমিই এখানে একমাত্র বাঙ্গালী। সবার ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর একজন লেকচারার এসে আমাদেরকে নিয়ে চললেন, ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করে দেখাতে। আমরা যখন ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবে পৌঁছুলাম, তখন দেখতে পেলাম একজন ছাত্র মোটা আকারের একটা মেশিনে কাজ করছেন। কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, এটা মাইক্রো কম্পিউটার। এ কম্পিউটারের দ্বারা একটা বলকে

এ্যানিমেশনের মাধ্যমে নড়াচড়া করা যায়। তিনি আরও বললেন, আসা করা হচ্ছে যে, অচীরেই এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার ব্যাপকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

মাত্র তিন বছর পরই কিন্তু প্রথম হোম কম্পিউটার (ZX-80) ক্রয় করে লেখালেখি ও গেম খেলতে শুরু করি। আর আজ ৩৬ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু ঘরে ঘরে কম্পিউটার আসে নি, এই যন্ত্রের উপর পুরো পৃথিবীর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। সেদিনের ঐ লেবের কম্পিউটার এবং সেই ছাত্রের কথা আমি কখনও ভুলবো না। বলা হয়, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিলো চাকা। আমি বলবো, আধুনিক ইতিহাসে 'কম্পিউটার' হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্ববহ এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার। পাটকবৃন্দ! আসুন, এ কম্পিউটার বিপ্লবের সুত্রপাত কিভাবে হলো তার উপর আলোকপাত করে দেখি।

কম্পিউটার কি?

এ প্রশ্নের উত্তর 'কম্পিউটার' শব্দের মধ্যেই নিহিত। কম্পিউটার একটা ইলেকট্রনিক মেশিন যার মাধ্যমে নানান ধরনের প্রসেস (কম্পিউটেশন) করা হয়ে থাকে। এসব প্রসেসের মধ্যে ভাষা (লেখা বা ট্যাক্সট্), অংক, ছবি, সাউন্ড (শ্রবণীয় শব্দ) প্রভৃতি হতে পারে। কম্পিউটার প্রসেস অতি দ্রুত গতিতে সাধিত হয়। কম্পিউটার সাধারণতঃ ৩ ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো হলো, ডিজিট্যাল, আনালগ ও হাইব্রিড কম্পিউটার। ডিজিট্যাল কম্পিউটার নাম্বারের (ডিজিটের) মাধ্যমে কাজ করে। এ ধরনের কম্পিউটারই আজকাল বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনার ঘরে যে কম্পিউটার আছে, এটা হচ্ছে একটা ডিজিট্যাল কম্পিউটার। এ প্রসঙ্গে এই ডিজিট্যাল কম্পিউটার নিয়েই আমি লিখবো।

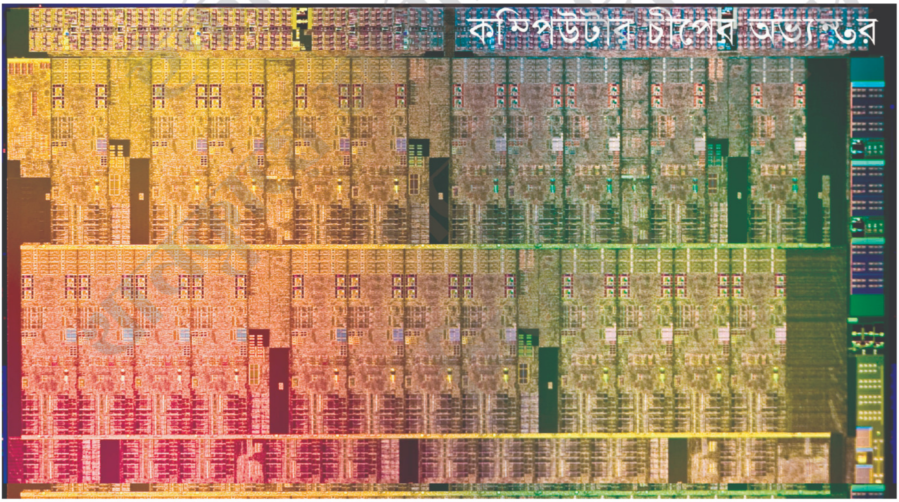


ইনটেল চীপ

আনালগ কম্পিউটারের মধ্যে অনেক অংশ থাকে যা প্রয়োজনে রদবদল করা সম্ভবপর। এসব কম্পিউটার কোন বিশেষ কার্য সমাধা করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাইব্রিড কম্পিউটার হলো ঐসব কম্পিউটার যেটির মধ্যে আনালগ এবং

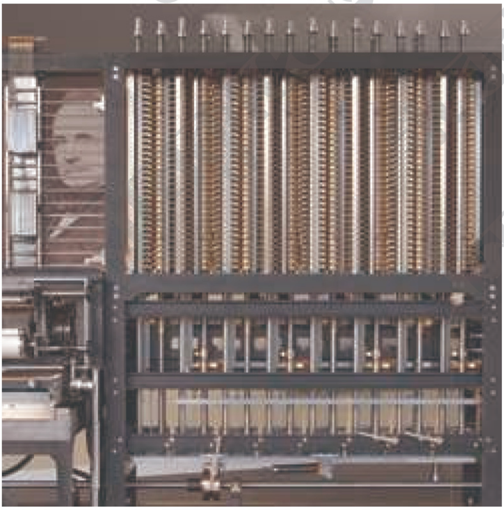
ডিজিট্যাল এ দুটি সিস্টেমই থাকে। এ ধরনের কম্পিউটারের ব্যবহার আজকাল খুবই বিরল। কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে, কম্পিউটার কিভাবে আবিষ্কৃত হলো এবং বিগত কয়েক দশকে এটির চরম উন্নতি সাধিত হলো, তা জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আসুন এবার আমরা কম্পিউটারের ইতিহাসের উপর কিছুটা আলোকপাত করে দেখি।

ঐতিহাসিকভাবে মানবসৃষ্ট প্রথম কম্পিউটার ছিলো অ্যাবাকাস। আজ থেকে প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে এ যন্ত্র চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিলো। অ্যাবাকাস হলো কাঠের তৈরী একটি কালক্যুলেটার যার মধ্যে সারিবদ্ধভাবে কতকগুলো কাঠের তৈরী পুঁতি থাকে। এ পুঁতিগুলোকে কোন একটি বিশেষ আইন অনুযায়ী রদবদল বা প্রোগ্রাম করে যে কোনো হিসেব করা যায়। ব্যবহারকারীকে এ প্রোগ্রামের নিয়ম কানুন অবশ্যই শিখে নিতে হবে। এ ধরণের আরেকটি কমপিউটিং যন্ত্র হলো এ্যাস্ট্রলেব, যেটির মাধ্যমে অতীতে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলে দিকনির্ণয় করা হতো। গ্রন্থের ইতিহাসখণ্ডে আমরা এ্যাস্টলেব সম্পর্কে একাধিকবার লিখেছি। যন্ত্রটি ছিলো মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত একটি প্রসিদ্ধ ন্যাভিগেশন মেশিন।



ফরাসীর বিজ্ঞানী ব্লেইজ পাসক্যাল ১৬৪২ সালে প্রথম ডিজিট্যাল কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। পাসক্যাল এ যন্ত্র তাঁর ট্যাক্স সংগ্রাহক পিতার জন্য তৈরী

করেছিলেন। এটির মাধ্যমে শুধুমাত্র যোগ অংক করা যেতো। পাসক্যালের যন্ত্র থেকে আরও উন্নতমানের যন্ত্র পরবর্তী একশত বছরের মধ্যেও আর কেউ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। ১৮২০ সালে টমাস কলবার নামক একব্যক্তি বাণিজ্যিকভাবে সফল-প্রথম কালকুলেটার আবিষ্কার করেন। এটির মাধ্যমে যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ অংক করা যেতো। এর পরে আরও অনেক ধরনের মেশিন বাজারে বের হতে থাকে, কিন্তু এগুলো সাধারণ কালকুলেটার পর্যায় থেকে আর এগুতে পারে নি। একই সময় বিলেতের কেম্ব্রিজে, চার্লস বাবেজ নামক একজন গণিতের অধ্যাপক কম্পিউটারের উপর বেশ গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। বাবেজ ১৮২২ সালের দিকে একটি বিয়োগ মেশিন তৈরী করতে সক্ষম হন। এ মেশিনটি ছিলো সম্পূর্ণ একটি মেকানিক্যাল মেশিন। মেশিনটি প্রথমাবস্থায় ছোট আকারের একটি মডেল ছিলো মাত্র, তবে কিছুদিনের মধ্যেই তখনকার সরকার বাবেজকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে বড়ো আকারের আরেকটি মেশিন তৈরী করতে বললেন। চার্লস বাবেজ ১৮২৩ সালে এ মেশিন তৈরী আরম্ভ করেন। এ মেশিনটি সত্যিকারের একটি কম্পিউটারই ছিলো। এটির মাধ্যমে প্রিন্টিং পর্যন্ত করা যেতো। তাছাড়া মেশিনটি ছিলো সম্পূর্ণ অটোমেটিক এবং প্রোগ্রাম করার যোগ্যতাসম্পন্ন। চার্লস বাবেজের এ কম্পিউটার চলতো বাস্পীয় শক্তির মাধ্যমে।



পাঠকরা ইচ্ছে করলে চার্লস বাবেজের এ কম্পিউটারের একটি ডুপলিকেট মেশিন লন্ডনের সাইন্স যাদুঘরে দেখতে পারবেন (যদি বিলেত প্রবাসী হয়ে থাকেন বা অচিরেই সেথা যাবার পরিকল্পনা থাকে)। চার্লস বাবেজের এ বিয়োগ করার মেশিন যদিও কম্পিউটার সৃষ্টির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলা যায়, তথাপি এটির ক্ষমতা বাস্তবে খুবই অল্প ছিলো। বাবেজ তাঁর এ মেশিনটাকে আরও উন্নতমানের করার লক্ষ্যে

পরবর্তী ১০ বছর প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তবে বাবেজ নিরাশ হলেন না, ১৮৩৩ সালে তিনি আরেক ধরনের কম্পিউটার সৃষ্টি করতে প্ল্যান-প্রোগ্রাম শুরু করলেন। তাঁর এ নতুন ডিজাইনের কম্পিউটারের নাম হলো, আনালিটিক্যাল মেশিন। বাবেজ এ মেশিনের পাওয়ারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ছিলো সত্যিই দূরদর্শী, যদিও এসব স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হয় তাঁর মৃত্যুর আরও একশত বৎসর পরে।

আনালিটিক্যাল মেশিনের ডিজাইনে ছিলো ৫০ টা পর্যন্ত ডেসিমেল নাম্বারের ব্যবহার, একটা মেমরীর ব্যবস্থা যেখানে এ নাম্বারগুলো রাখা হবে, মেশিন পরিচালনা করার পদ্ধতি (অপরেটিং সিস্টেম)- যা আধুনিক কম্পিউটার করে থাকে; এমনকি প্রোগ্রাম করার ব্যবস্থাও এ মেশিনের ডিজাইনে ছিলো। বাবেজ তাঁর মেশিনে পরবর্তীতে সর্বত্র ব্যবহৃত ছোট ছোট ছিদ্র করা কার্ডের (পান্চ কার্ড) কথাও বলেছিলেন। কিন্তু বাবেজের এ মেশিন তাঁর জীবিতাবস্থায় কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে কিছুদিনের জন্য মানুষ ডিজিট্যাল কম্পিউটারের উপর উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তবে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের উপর বেশ উন্নতি সাধিত হয়, যার ফলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, প্রায় সবগুলো গতিশীল বা ডাইনামিক ঘটনাই গাণিতিক উপায়ে বীজগণিতের সমীকরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করা যায়। এতে যে কোন সমস্যার সমাধান এই সমীকরণ দিয়ে করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। একই সময় বাস্পীয় শক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় কুঠির শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন হতে থাকে। এক কথায়, এ সময় প্রযুক্তির এক চরম উন্নতির কাল ছিলো। তবে বাস্পীয় যন্ত্রপাতি ডিজাইন, রেললাইন তৈরী করা, বাস্পীয় জাহাজ বানানো, টেক্সস্টাইল মিল সৃষ্টি, আর বড়ো বড়ো সেতু গড়তে প্রয়োজন হয় অনেক ধরনের হিসাব নিকাশ বা অংক কষা। এসব ডিজাইন করতে হলে টেকনোলজিক্যালী ব্যবহৃত বস্তুর সেন্টার অব গ্রাভিটি (মহাকর্ষের টানের কেন্দ্র), সেন্টার অব বয়েন্সি, মমেন্টস্ অব ইনারশা এবং স্ট্রেস ডিষ্ট্রিবিউশন প্রভৃতি ব্যাপারে সঠিকভাবে অবগত হবার প্রয়োজন হয়; এমনকি বাস্পীয় যন্ত্রের পাওয়ার কতটুকু তা জানতে হলেও গণিতের দরকার হয়। এ প্রেক্ষাপটে একটি মেশিনের বেশ প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন তখনকার ইঞ্জিনিয়াররা- যেটির মাধ্যমে এসব কালক্যুলেশন সঠিক ও তাড়াতাড়ি করা যায়।

বলাই বাহুল্য এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে ১৮৯০ সালে হারম্যান হলারিথ ও জেমস পাওয়ার নামে দুই বিজ্ঞানী বাবেজের ডিজাইনের ছিদ্র করা কার্ডের মেশিন তৈরী করলেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী আদমশুমারী ব্যুরোতে কাজ করতেন। তাঁদের এ মেশিন কার্ডের ছিদ্রগুলো থেকেই প্রোগ্রামের ইনসস্ট্রাকশন বা নির্দেশ পড়ে নিতে পারতো, এখানে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। এ মেশিনের সর্বাপেক্ষা জরুরী কার্যক্ষমতা যা ছিলো তা হলো, এই কার্ড থেকে ইনসস্ট্রাকশন পড়া, আর এর কারণে কার্ডগুলোকে মেমরী (স্মৃতিরক্ষক) হিসাবে ব্যবহার করা যেতো। এ উন্নতমানের মেশিনের প্রতি অচিরেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর পড়লো এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ ধরনের কার্ড মেশিন সিস্টেম বাজারে বের হলো। প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানী ইন্টারনেশন্যাল বিজনেস মেশিন্‌স (IBM) এ ধরনের মেশিন ব্যবসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।



আইবিএম ও অন্যান্য কোম্পানীর এসব কার্ড মেশিন কম্পিউটারগুলোই পরবর্তী অর্ধ শতাব্দি ধরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সফলতার সহিত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এগুলো

সর্বসাধারণের নাগালের বাইরেই ছিলো। এসব কম্পিউটারের মূল্যও ছিলো খুব বেশী, আর এ কারণেই এগুলো ক্রয় করা সাধারণ্যের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না।

গেল শতাব্দির তৃতীয় দশকের শেষের দিকে কার্ড মেশিন তৈরীর পদ্ধতি বেশ উন্নতমানের হয়ে ওঠে। যার ফলে এইকেন নামক একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী আইবিএম-এর সাথে জড়িত হয়ে একটি বড় আকারের ডিজিট্যাল কম্পিউটার তৈরী করেন। এইকেন তাঁর এ মেশিনের নামকরণ করেন, হারভার্ড মার্ক-১। এই কম্পিউটার দিয়ে ২৩টি পর্যন্ত ডেসিমেল নাম্বারের অংক করা যেতো, এাছাড়া তা ছিলো সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম করার একটি মেশিন। এটা লগ (লগেরিথম) ও ট্রিগ (ট্রিগোনোমেট্রি) ফাংশনের সমাধান করতে পারতো। মার্ক-১ এর ফলাফল একটি ইলেকট্রিক টাইপরাইটারের মাধ্যমে প্রিন্ট হয়ে আসতো। তবে আজকের তুলনায় তখনকার দিনের এই মেশিনও অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন একটি কম্পিউটার ছিলো। একটা সাধারণ পূরণ অংক এ মেশিন দিয়ে করতে হলে ব্যবহারকারীকে প্রায় ৫ সেকেন্ড সময় অপেক্ষা করতে হতো! তবে মার্ক-১ সম্পূর্ণ অটোমেটিক ছিলো। আপনি কিছু করতে চাইলে আগের দিন প্রোগ্রাম করে রেখে গেলেন এবং পরের দিন এসে রেজাল্ট নিয়ে গেলেন! আগেকার দিনে কমপিউটিং এরকমই ছিলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হলো, উন্নতমানের কম্পিউটার সৃষ্টির প্রয়োজন হঠাৎ করে অনেক গুণ বেড়ে গেল। বিশেষ করে মিলিটারীর জন্য কম্পিউটার ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো। নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করা হলো এবং এগুলো কন্ট্রোল করতে কম্পিউটারের ব্যবহার দরকারী হয়ে পড়লো।

১৯৪২ সালে জন একার্ট ও জন মউজলি নামক দু'জন ইঞ্জিনিয়ার একটি কম্পিউটার সৃষ্টি করলেন, যার নাম ছিলো ই.এন.ই.এ.সি. (ইলেকট্রিক্যাল নিউমারিক্যাল ইনটেগ্রেটার এণ্ড কালক্যুলেটার)। এ মেশিন ১০টি পর্যন্ত ডেসিমেল নাম্বার নিয়ে কালক্যুলেশন করতে পারতো এবং এটা আগেকার দিনের মেশিনগুলো থেকে হাজার গুণ দ্রুততর ছিলো। তবে এ মেশিনের আয়তন অত্যন্ত বড়ো ছিলো, কারণ এটার মধ্যে প্রায় ১৮,০০০ ভ্যাকিউম (বাতাসশূন্য) টিউব ছিলো, যার ফলে এটা ১৮০০ বর্গফুট জায়গা দখল করে নিতো, তাছাড়া এটা পরিচালনা করতে ১৮০ কিলো-ওয়াট

বিদ্যুতের দরকার হতো। বলাই বাহুল্য এরূপ বিরাট আকারের মেশিন সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে ছিলো, এবং এটি খুব বেশী দিন ব্যবহৃত হয়নি।


প্রথম আপেল-ম্যাক পিসি

জন নিউম্যান নামে একজন বিজ্ঞানী ১৯৪৫ সালে কম্পিউটারের উপর বিশেষ গবেষণা আরম্ভ করলেন। তাঁর এ গবেষণার ফলে বুঝা গেল যে, কম্পিউটার একটি সাধারণ স্থায়ী মেশিন হয়েও যে কোন ধরনের কমপিউটেশন কার্য সমাধা করতে পারবে। অর্থাৎ কম্পিউটার হতে হবে সম্পূর্ণ একটি প্রোগ্রাম করার ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন। যে কোন কমপিউটেশন কাজ করতে তাই বার বার এর যন্ত্রপাতি রদবদল করার প্রয়োজন থাকবেনা। নিউম্যানের এসব চিন্তাদ্বারা কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক নতুন সাড়া জাগালো। প্রোগ্রাম মেমরীতে জমা করে রাখার পদ্ধতি ব্যবহার করতে নতুন বৈল্পবিক কম্পিউটার ডিজাইনের দরকার পড়লো। এবং এর ফলে আধুনিক প্রথম জেনারেশনের প্রোগ্রাম করার ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ১৯৪৭ সালে বাজারে বের হলো।



এ ধরণের কম্পিউটারে যেসব ব্যবস্থাবলী ছিলো, এর মধ্যে রানডম একসেস মেমরী (জঅগ - এর মাধ্যমে মেমরীর মধ্যে কমপিউটেশন চলাকালে ইনফরমেশন জমা করা হয় ও প্রয়োজনে বের করা হয়), এগুলো পান্চ কার্ড ও পান্চ টেপের মাধ্যমে চলতো, এগুলো খুব দ্রুত কাজ করতো এবং মেশিনগুলো আকারে অনেক ছোট ছিলো। তবে এগুলো তখনও বেশ দামী ছিলো এবং পরিচালনা করতে বেশ খরচ হতো। এক একটা মেশিন ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত চালানো যেতো। এসব কম্পিউটারে যে প্রোগ্রামিং করার ভাষা ব্যবহার করা হতো তা ছিলো 'মেশিন কোড' (প্রোগ্রামিং করার ভাষা সম্পর্কে এ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোচনা হবে)। এসব মেশিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং বাণিজ্যিকভাবে এগুলো বড়ো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্য হয়।

গত শতাব্দির পঞ্চম দশকের শেষের দিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে কম্পিউটারের বেশ উন্নতি সাধিত হয়। এসব আবিষ্কার হলো মেঘন্যাটিক-কোর মেমরী বা চূম্বকীয় মেমরী এবং ট্রানসিষ্টার সার্কেট সৃষ্টি। এ দূটি যন্ত্রাংশ কম্পিউটারে জড়িত করার ফলে, রাম (রানডম এক্সেস মেমরী) মেমরীর ক্ষমতা ৮,০০০ শব্দ থেকে

৬৪,০০০ শব্দে উন্নীত করা হয়। ষাট দশকের প্রথম দিকে এসব নতুন কম্পিউটার বাজারে বের হয়। এরূপ কম্পিউটার বড়ো বড়ো অফিসে থাকতো, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশের সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এগুলোর ব্যবহার সর্বত্র করা হতো। প্রতিটি কম্পিউটার অনেক কম্পিউটার প্রোগ্রামার দ্বারা পরিচালনা করা হতো। এ সময় কম্পিউটার প্রোগ্রাম জমা (ষ্টোর) করে রাখার জন্য অল্প মূল্যে সৃষ্ট মেঘন্যাটিক ড্রামের ব্যবহার করা হয়।

ষাট দশকের শেষের দিকে আরও শক্তিশালী দ্রুত গতিসম্পন্ন কম্পিউটার সৃষ্টির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এর ফলে, তৈরী হয় লার্ক মেশিন (এলএআরসি), এটা কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিলো। একই সময়ে আইবিএম কোম্পানী ষ্ট্রেছ নামে আরেকটি কম্পিউটার তৈরী করে। লার্ক মেশিনের কোর মেমরী ছিলো ৯৮,০০০ শব্দ এবং ১০ মাইক্রোসেকেণ্ডের মধ্যে পূরণ অংক করতে পারতো (১ মাইক্রোসেকেণ্ড = ১/১০০০০০০ বা ০.০০০০০১ সেকেন্ড)। ষ্ট্রেছ মেশিনের মেমরী ক্ষমতা ছিলো বেশী- প্রায় ১০ কোটি শব্দ, তবে তা বেশ আস্তে চলতো। এ সময় বড়ো বড়ো কম্পিউটার কোম্পানী ইনপোর্ট কনস্যাল (এক ধরণের কি-বোর্ড), পেইজ প্রিন্টার, কেথড-রে ডিসপ্লে (এক ধরণের মনিটর), গ্রাফিক্স করার যন্ত্র, মেগন্যাটিক টেপ ও মেগন্যটিক ডিস্ক ফাইল ষ্টোর করার ব্যবস্থাসহ কম্পিউটার বাজারে বের করতে থাকে। এ মেশিনগুলোর মাধ্যমে হিসাব রক্ষা, শ্রমিকদের কাজের হিসাব, দ্রব্যাদির তালিকা, দ্রব্যাদি যোগানোর অর্ডার তৈরী, রশিদ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য সহজে করা সম্ভবপর হয়ে উঠে। এই কম্পিউটারগুলোতে যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, একটু পরই হবে) ছিলো তা এ ধরণের ব্যবহারের জন্য খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়ার বেশ প্রয়োজন ছিলো না। এ মেশিনগুলো সাধারণতঃ রেকর্ড রাখার জন্য ব্যবহার করা হতো। হাসপাতালে রোগীদের, লাইব্রেরীতে বইয়ের প্রভৃতি রেকর্ড রাখার জন্য এগুলো বেশ উপযোগী হয়ে ওঠে।

আধুনিক কম্পিউটার

বর্তমানে সর্বত্র ব্যবহৃত আধুনিক কম্পিউটার তৈরীর কাজ শুরু হয় সত্তুর দশকে। এ সময় কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা ছোট আকারের সর্বত্র ব্যবহার করার যোগ্যতাসম্পন্ন

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের কম্পিউটার তৈরীর চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। আগেকার দিনের কম্পিউটার, কোন বিশেষ কার্য সমাধা করার লক্ষ্যে তৈরী করা হতো, কিন্তু সত্তুর দশকে কয়েকটি প্রোগ্রাম করার নিম্ন স্তরের (লো- লেভেল) ভাষা (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে) আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ফ্লেক্সিবল মেশিনের চিন্তাদ্বারা জাগ্রত হয়। তারা ভাবলেন যে, এমন ধরনের কম্পিউটার হওয়া দরকার যেটির মধ্যে যে কোন কার্য করার জন্য কম্পিউটার ভাষার মাধ্যমে সফট্ওয়ার তৈরী করে ঐ কার্য সমাধা করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ একই কম্পিউটারে প্রয়োজনমতো সফট্ওয়ার তৈরী করে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করা যাবে। এ সময় কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য বিশেষ বিশেষ ছোট্ট আয়তনের যন্ত্রাংশ তৈরী করা শুরু হয়। এটা তখন বুঝতে আর বাকী ছিলনা যে, যন্ত্রাংশ আয়তনে ছোট করলে পরে প্রসেসিং করা দ্রুততর ও কর্মক্ষম হবে। কম্পিউটারের মধ্যে ব্যবহৃত সার্কেটগুলোও তখন ফটো টেকনিকের (প্রিন্টেড সার্কেট) মাধ্যমে তৈরী করা আরম্ভ হলো। সত্তুর দশকের মাঝামাঝির দিকে কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার- চিপ, বাজারে আবির্ভূত হয়। কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ এই ইনটেগ্রেইটেড সার্কেট বা চিপ এর মাধ্যমে তৈরী হতে থাকে। এখন থেকে যাবতীয় কম্পিউটার টেকনোলজী এই চিপের উপর ভরসা করেই অগ্রসর হয়। এক একটি চিপের পাওয়ার দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে, একই সময়ে এগুলোর মূল্যও কমে আসছে। এর একটা বিশেষ কারণ হলো চিপ তৈরীর আসল যে পদার্থ তা হলো সিলিকন বা সাধারণ বালুকা, আর পৃথিবীব্যাপী বালুকার কোন অভাব নেই।

সত্তুর দশকে বিভিন্ন কম্পিউটার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এই চিপ প্রযুক্তির ফলে সফট্ওয়ারসহ ছোট আকারের মিনি কম্পিউটার বাজারে বের করতে থাকে। এ দশকেই প্রোগ্রাম করা যায় এমন ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা পারসন্যাল কম্পিউটার (পিসি) বাজারে প্রথম বের হয়। আপেল কম্পিউটার ও রেডিও সাক নামে দুটি কোম্পানী এসময় অত্যন্ত সফলতার সহিত কয়েকটি কম্পিউটার বাজারে বের করে। পরবর্তীতে আপেল মেকিনটশ্ (ম্যাক) কোম্পানীই পৃথিবী বিখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মৌলিক দুই ধরনের কম্পিউটারই সমগ্র পিসি মার্কেটকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এগুলো হলো আইবিএম বা আইবিএম কম্পাটিবল মেশিন (পিসি) এবং মেকিনটশ্ বা মেকিনটশ কম্পাটিবল মেশিন।

১৯৮০ ইংরেজী হতে বর্তমান কম্পিউটার বিপ্লব সত্যিকার অর্থে শুরু হয়। কম্পিউটারের চিপ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (ঈচট) প্রস্তুত করতে উপর্যুক্ত দুটি কোম্পানীসহ বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। এ প্রতিযোগিতার ফলে কিন্তু একটা বিশেষ লাভ হচ্ছে, আর তা হলো কম্পিউটারের মূল্য দিনদিন কমে আসছে, একই সময় ভালো থেকে ভালো চিপ তৈরী হচ্ছে। সাধারণতঃ ইনটেল করপোরেশন পিসি ও আইবিএম সিস্টেমের জন্য চিপ বানাচ্ছে, অন্যদিকে মটোরলা করপোরেশন ম্যাক সিস্টেমের চিপ তৈরী করছে।

বর্তমান কম্পিউটার বিজ্ঞান

আজকাল কম্পিউটার ব্যবসা সত্যিকার অর্থে একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ব্যবসায় রূপান্তিরিত হয়েছে। এটা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কম্পিউটারের সফ্টওয়ার তৈরীর কোম্পানী মাইক্রোসফ্ট এর মালিক বিল গেইট্স আজ ক'বছর যাবৎ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছেন।

পৃথিবীর সর্বত্র কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে, বহু ধরনের কার্য সমাধানে। আজকাল কম্পিউটার শুধুমাত্র নিছক অংক কষা অথবা ফাইল ও রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয়না। এখন কম্পিউটার দিয়ে ফাইল মেন্যাজমেন্ট থেকে মহাশূণ্যে কৃত্রিম উপগ্রহ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। কম্পিউটারের মূল্য হ্রাস হবার ফলে ঘরে ঘরে কম্পিউটার এসেছে। আপনার ঘরেও হয়ত একটি কম্পিউটার আছে, আপনার বাচ্চা ওটা দিয়ে হোমওয়ার্ক করছে, সিডি রমের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শিক্ষালাভ করছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর কোটি কোটি কম্পিউটারের সঙ্গে নেটওয়ার্ক করে তথ্য সেয়ার করছে প্রভৃতি। বস্তুতঃ আজকাল কম্পিউটার এমন একটা মেশিনে পরিণত হয়েছে যেটি ছাড়া উন্নত বিশ্বে চলাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর উন্নয়নশীল দেশসমূহে দ্রুত এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে নতুন প্রজন্মকে তো অবশ্যই, এমনকি পুরাতনদেরকেও কম্পিউটার অপারেশন পদ্ধতি বাধ্য হয়ে জেনে নিতে হচ্ছে। পাঠকদের সুবিধার্থে এ পরিচ্ছেদের বাকী অংশে আমি কম্পিউটার

কিভাবে কাজ করে, অর্থাৎ এর মৌলিক প্রযুক্তির উপর সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

কম্পিউটার যেভাবে কাজ করে

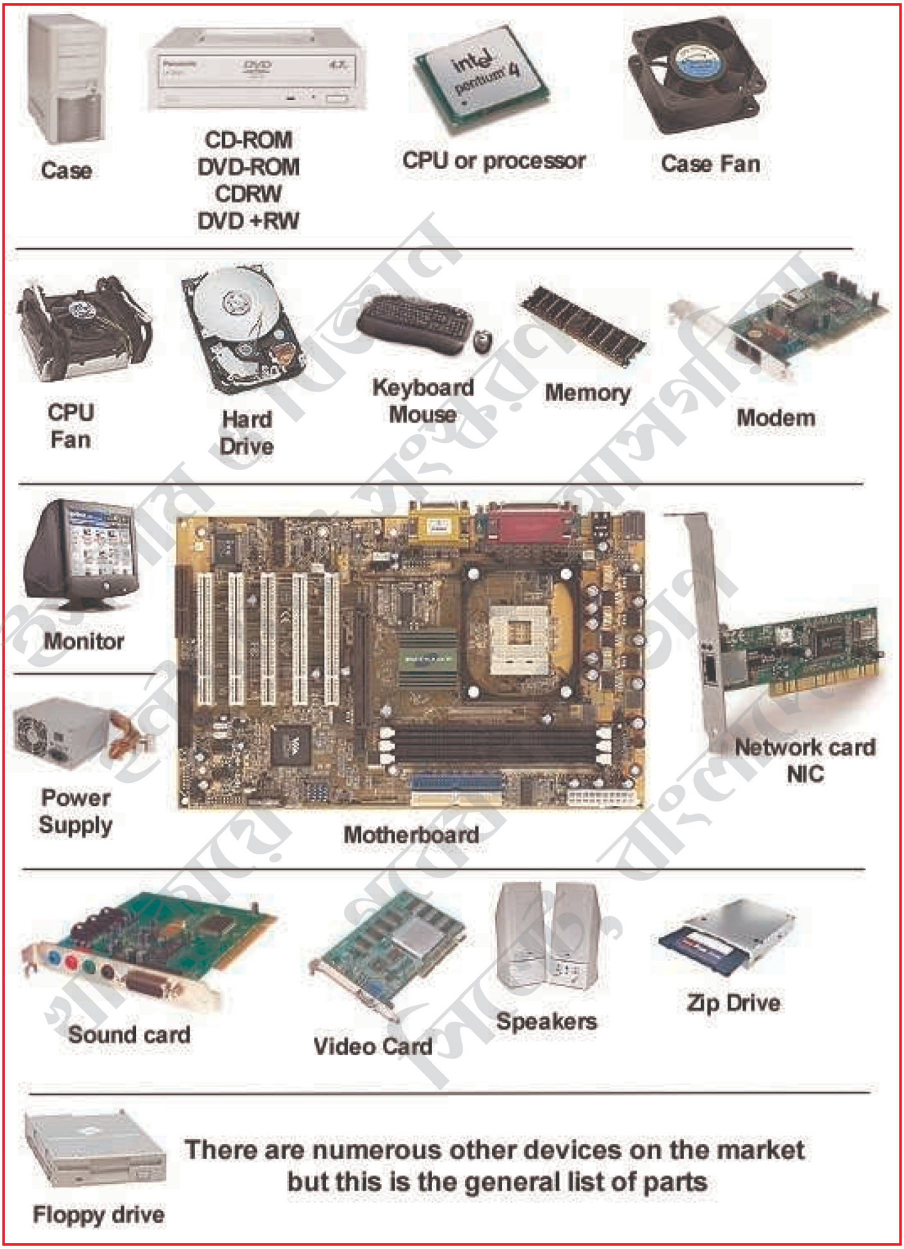
কম্পিউটারে যে নাম্বার-ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়, তা হলো বাইনারি নাম্বার। যে কোন বৈদ্যুতিক সিস্টেমে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও সাধারণ উপায়ে যে কোন অবস্থার দুটি সম্ভাব্য ফলাফল আলাদা করা যায়। যেমন একটা বালব হয় জ্বলন্ত না হয় নিভানো অবস্থায় থাকতে পারে, এ দুটি সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে আলাদাভাবে গ্রহণযোগ্য দুটি অবস্থা। বাইনারি নাম্বারে শুধুমাত্র ০ বা ১ ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে বালব যখন অন (জ্বলন্ত) থাকবে, তখন এ অবস্থাকে ১ দিয়ে বোঝানো যাবে এবং অফ (নিভানো) থাকলে, ০ দিয়ে আলাদা করা যাবে। ঠিক এভাবে দুটি বাইনারি নাম্বারের মাধ্যমে কম্পিউটারে দুটি আলাদা অবস্থাকে উপস্থাপিত করা হয়। প্রতিটি বাইনারি নাম্বারকে এক একটি বিট নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাইনারি নাম্বার দিয়ে তাই যে কোন নাম্বার বা সংখ্যা অথবা বর্ণ উপস্থাপিত করা যায়, যা কম্পিউটার সহজে বুঝতে পারে। তাই ০ ও ১ দিয়ে একটি সংখ্যা অথবা অক্ষরকে উপস্থাপিত করার জন্য যতটুকু সম্ভাবনা আছে তা হলো ২ (যতোটা বিট আছে)। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনার কম্পিউটার যদি ৪ বিটসম্পন্ন হয়, তাহলে সর্বমোট ২৪ = ১৬টা সম্ভাবনা হবে বাইনারি নাম্বার লিখতে। এগুলো হলো:- ০০০০, ০০০১, ০০১১, ০১১১, ১১১১, ০০১০, ০১০০, ১০০০, ০১১০, ১১০০, ১০০১, ১০১০, ০১০১, ১০১১, ১১০১, ১১১০,। লক্ষ করুন, এখানে প্রতিটি সেটই আলাদা। এখন আমরা যদি ৬ বিট ব্যবহার করি তাহলে ২৬ = ৬৪টা সম্ভাবনা পাব। আজকাল বেশীরভাগ কম্পিউটারে ১৬ অথবা ৩২ বিট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরনের বাইনারি কোডিং এর মাধ্যমেই ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে যাবতীয় ডাটা (ইনফরমেশন) উপস্থাপন করা হয়। বাইনারি নাম্বার হচ্ছে ১ এবং ০ যা কম্পিউটারে সহজে ব্যবহার করা যায়।

কম্পিউটারের ভেতরের যন্ত্রাংশ

যে কোন ডিজিটেল কম্পিউটারের মধ্যে চারটি মৌলিক যন্ত্রাংশ থাকে। এগুলো হচ্ছেঃ- (ক) এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট (অখট/ঈচট) বা অংক ও লজিক অংশ। (খ) মেমরী ইউনিট (জঙগ ্ জঅগ) বা স্মৃতি অংশ। (গ) একটি কন্ট্রোল ইউনিট (ঈট) বা নিয়ন্ত্রণ অংশ। (ঘ) একটি ইনপুট/আউটপুট ইউনিট (ওঙ) বা ভেতরে প্রবেশকরণ/ বাহিরকরণ অংশ।

(ক) এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট

এ ইউনিটকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটও বলা হয়ে থাকে। আজকাল চিপ বলতে এ ইউনিটকেই বুঝায়। ইনটেল পেন্টিয়াম চিপ ও পাওয়ার পিসি চিপ সম্পর্কে নিশ্চয়ই পনারা জ্ঞাত আছেন। [এ লেখার সময় পিসি'র লেটেষ্ট চিপ ছিলো ইনটেল পেন্টিয়াম-৪, অপরদিকে ম্যাক কম্পিউটারের লেটেষ্ট চিপের নাম ছিলো- পাওয়ার পিসি জি-৫।] এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট দিয়ে ডাটাকে নিয়ন্ত্রণ এবং যাবতীয় অংক কষার কাজ করা হয়। এখানে কোটি কোটি রেজিষ্টার বা রেকর্ড থাকে। রেজিষ্টার হচ্ছে কতকগুলো মেমরী-যন্ত্রাংশ যেখানে, যে কোন বিশেষ মান জমা করা যায়। যেমন আমরা যদি দুটি নাম্বারকে যোগ করতে চাই তবে দুটি নাম্বারই প্রথমে এক টুকরো কাগজের মধ্যে লিখতে হবে, তারপর যোগ করে যোগফলটি আবার লিখে দিতে হবে। রেজিষ্টারের মধ্যেও এই কাগজে লিখার মতো নাম্বার অথবা যে কোন মান (ভেলু) লিখে রাখা হয়। এক একটি রেজিষ্টার হচ্ছে এক একটি মেমরী বা, যেখানে কোন বিশেষ কিছু জমা করে রাখা যায়।



কম্পিউটার যন্ত্রাংশ: এই চিত্রে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দেখা যাচ্ছে।

এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিটের কাজ তাই অত্যন্ত সহজবোধ্য। একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম যেসকল ভেলুর উপর যেরূপ কার্য সমাধা করতে চাইবে, এ ইউনিট ঠিক তাই করবে। যাবতীয় লজিক্যাল সমস্যাবলীর কতকগুলো ফাংশন বা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। এগুলোর নাম হলো খড়মরপ এধঃবং (ইড়ড়ষবধহ- গঙঝ ড়ৎ ঘঙ) ফাংশন। কম্পিউটার এই লজিক-অংকের মাধ্যমে চলে। এধরনের গণিতকে বুলিয়ান বীজগণিত বলে। বুলিয়ান বীজগণিতে যে কোন সমস্যার দুটিমাত্র ফলাফল সম্ভব হতে পারে, হয় উহা সত্য না হয় মিথ্যা। একই সময় সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে বুলিয়ান বীজগণিত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নয়, তবে কম্পিউটারে কিভাবে প্রসেস করে তার একটা ধারণা এখানে উপস্থাপন করলাম মাত্র।

একই সময়ে প্রসেস করা এবং সবকিছু জমা করে রাখা কিন্তু এ্যারিথমেটিক এবং লজিক ইউনিট দ্বারা সম্ভবপর নয়। এর জন্য আলাদা আরও মেমরীর প্রয়োজন।

(খ) মেমরী ইউনিট

কম্পিউটারে দুই ধরনের মেমরী ইউনিট থাকে, এদের একটা হলো প্রাথমিক ও অপরটি মাধ্যমিক ইউনিট। প্রাথমিক ইউনিটে জমাকৃত সবকিছু একটা প্রোগ্রাম চলাকালে ব্যবহৃত হয়। এটাকে রাম (রানডম এক্সেস মেমরী) বলা হয়। মাধ্যমিক মেমরীর মধ্যে প্রসেস করা সবকিছু জমা করে রাখা হয়। আপনার কম্পিউটারে যে হার্ড ডিস্ক আছে এটাই হচ্ছে মাধ্যমিক বা ষ্টোরেজ মেমরী। কম্পিউটার বন্ধ করে দিলে যাবতীয় রাম মেমরী বিলুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু হার্ড ডিস্কে জমাকৃত মেমরী নষ্ট হয় না। আজকাল বিভিন্ন উপায় উপকরণের মাধ্যমে প্রোগ্রাম ফাইল ও ডাটা জমা রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে সিডি রম (রিড অনলি মেমরী), সাড়ে তিন ইঞ্চি ফ্লপি ডিস্ক, জিপ ও ঝাজ ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ প্রভৃতি উল্লেখওযোগ্য।

(গ) কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ

এ ইউনিটের মাধ্যমে ষ্টোর করা মেমরীকে প্রোগ্রামের কমাণ্ড ও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়। অর্থাৎ এটির কাজ হলো ষ্টোর করা জিনিসপত্র প্রয়োজন অনুযায়ী কন্ট্রোল করে রাখা। এটা দ্বারা যাবতীয় প্রসেস পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(ঘ) ইনপুট/আউটপুট ইউনিট

যে কোন কম্পিউটার পরিচালনায় ডাটা বা ইনফরমেশনকে কোন উপায়ে ভেতরে প্রবেশ করানো এবং প্রসেস শেষে ফলাফল বের করে আনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ দুটি জরুরী কার্য সমাধা হয় ইনপুট/আউটপুট ইউনিটগুলো দ্বারা।

আজকাল ইনপুট ইউনিট হিসেবে কিবোর্ড, মাউস, মাইক্রোফোন, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, মডেম, স্ক্যানার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে আউটপুটের জন্য মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, ইমেজসেটার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত কম্পিউটারের ভেতর ও বাহিরের যন্ত্রাংশ বা হার্ডওয়ার সম্পর্কে আলোচনা হলো। এবার যে উপায়ে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং আপনি এটা দিয়ে যাকিছু করবেন তা কিভাবে করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই সফট্ওয়ারের কথা শুণে থাকবেন। বাংলাতে সফট্ওয়ারকে তরল-যন্ত্রাংশ বলা যায়। এটা সহজেই অনুমেয় যে, একটা কম্পিউটার এই সফট্ওয়ার ছাড়া চলে না। সফট্ওয়ার হচ্ছে একটা কোড-করা (কম্পিউটারের প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্য অর্থবোধক কিছু কোড), অনুজ্ঞেয় বা নির্দেশনাবলী। আপনি এসব সফট্ওয়্যার বা প্রোগ্রাম সর্বদাই ব্যবহার করে যাচ্ছেন। যে মুহূর্তে আপনি একটা কম্পিউটার অন করবেন, তখন থেকেই সফট্ওয়্যারের কাজ আরম্ভ হবে। অপারেটিং সিস্টেম ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রোগ্রাম, এ দু'ধরনের সফট্ওয়্যার দ্বারা কম্পিউটার চলে।

অপারেটিং সিস্টেম বা কার্য-পরিচালনা ব্যবস্থা

যে কোন কম্পিউটারকে একটা বিশেষ নিয়মে পরিচালনা করার জন্যে একটা বিশেষ অপরিবর্তনীয় সফট্ওয়্যারের প্রয়োজন হয়। এ পরিচালনা করার প্রোগ্রামকে অপারেটিং সিস্টেম বলে। অপারেটিং সিস্টেমের কাজ হলো কম্পিউটার পরিচালনার মৌলিক পদ্ধতি বা ইনটারফেইস। আপনি আরও যতোসব প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার এনে কম্পিউটারে ব্যবহার করবেন তা এই অপারেটিং সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল। অনেক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে, তবে আজকাল দু-ধরনের সিস্টেমই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর এগুলো হলো পিসি এর জন্য মাইক্রোসফটের তৈরী উইনডোজ ৯৫/৯৭/৯৮/২০০০ ... ও আপেল মেকিনটশের তৈরী মেক অপারেটিং সিস্টেম। আপনার যদি পিসি থাকে তবে আপনাকে অবশ্যই, উইনডোজ সিস্টেমে চলে- এ ধরনের প্রোগ্রাম ক্রয় করতে হবে। আর মেকিনটশ কম্পিউটার হলে, মেক অপারেটিং সিস্টেমের সফট্ওয়্যার আনতে হবে। অবশ্য আজকাল একই প্রোগ্রাম দুটি সিস্টেমের জন্যেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ সফট্ওয়্যার যারা সৃষ্টি করছেন, তারা দুটি সিস্টেমের জন্যেই করছেন। আপনি কোন সিস্টেম ব্যবহার করবেন তা একান্ত পনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে সাধারণতঃ মেক সিস্টেমকে সহজবোধ্য বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু এটার মূল্য উইনডোজ থেকে অনেকটা বেশী।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার বা তরল যন্ত্রাংশ

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার হচ্ছে একটা বিশেষভাবে লিখিত প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার বুঝতে পারে। এই সফট্ওয়্যার প্রোগ্রাম ছাড়া একটা কম্পিউটার সম্পূর্ণ অকেজো যন্ত্র মাত্র। শক্ত যন্ত্রাংশ আর তরল যন্ত্রাংশ- এ দুটি অংশের মিশ্রণে একটা কম্পিউটার ব্যবহারযোগ্য মেশিনে পরিণত হয়। যে কোন প্রোগ্রামকে জমা করে রাখার জন্য, জবধফ ঙহষু গবসড়ৎু (জঙগ), বা শুধু পড়া যায়, এমন মেমরীর মধ্যে রাখা হয়ে থাকে। আপনার কম্পিউটারের ভেতর যে হার্ড ডিস্ক আছে ওটা হলো জঙগ মেমরী। জঙগ মেমরীর আরোও দৃষ্টান্ত হলো, ঋষড়ঢ়ঢ়ু উরংপ, ঈউ জড়স প্রভৃতি।

যে কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম একজন প্রোগ্রামার দ্বারা বিশেষ কোন কার্য সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখা হয়। প্রোগ্রাম লেখার অনেক ধরনের ভাষা আছে, যা ইংরেজী ভাষার মত এবং তা বুঝা সহজবোধ্য। যে কোন একটা ভাষার মাধ্যমে প্রোগ্রাম লেখার পর এটাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিটি কমাণ্ড এবং অনুজ্ঞাকে (Instructions) ০ ও ১- এ দুটি বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করতে হবে। এ কাজ অবশ্য প্রোগ্রামারকে নিজে করতে হয় না, এর জন্য আলাদা আরেকটি বিশেষ প্রোগ্রাম আছে যেটির নাম হলো কমপাইলার (Compiler)।

দুই ধরনের প্রোগ্রাম করার ভাষা আছে। এগুলো হলো, মেশিন কোড যাকে নিম্নস্তরের প্রোগ্রামও (Low Level Language) বলা হয় এবং উচ্চ স্তরের প্রোগ্রাম (High Level Language)। সাধারণতঃ বাইনারি কোডে প্রোগ্রাম লেখা হয় না। নিম্ন স্তরের ও উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামকে কমপাইলার দিয়ে বাইনারি কোডে রূপান্তরিত করা হয়। আপনার কম্পিউটারে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত প্রোগ্রাম বা ওয়ার্ড প্রসেসারগুলো- যেমনঃ মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ক্লারিস ওয়ার্কস, ফটোশপ, ইলোস্ট্রেটর, কুয়ার্ক এক্সপ্রেস প্রভৃতি সফট্ওয়্যার হচ্ছে এক একটা প্রোগ্রাম, যা প্রথমে হাই লেভেল প্রোগ্রাম করার ভাষায় (যেমন পাসকেল বা সি++) লিখে কমপাইলার দ্বারা বাইনারিতে বদলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একটি কম্পিউটারের জন্য তা গ্রহণযোগ্য কোডে পরিণত হয়েছে। ইতোমধ্যে উল্লেখিত এক একটা প্রোগ্রামের মধ্যে হাজার হাজার লাইন প্রোগ্রামিং কোড আছে। একজন প্রোগ্রামারকে তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোড লিখতে হয়, কারণ সামান্যতম বেশ-কম হলেই সমগ্র প্রোগ্রাম অকেজো হয়ে যাবে। এতে প্রোগ্রামের মধ্যে বাগ (খারাপ প্রোগ্রাম) ঢুকে যেতে পারে। প্রোগ্রাম করা তাই সহজ ব্যাপার নয়। ওয়ার্ড প্রসেসারের মত একটা জটিল কঠিন প্রোগ্রাম লিখতে এবং প্রকাশ করতে, তাই এক থেকে দু'বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। কম্পিউটার সফট্ওয়্যারের মূল্যও তাই আজকাল বেশী হচ্ছে। বর্তমানে মাইক্রোসফটের মত পৃথিবী বিখ্যাত বৃহৎ কোম্পানী গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র কম্পিউটার সফট্ওয়্যার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক বিল গেইট্স এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি হয়েছেন- কম্পিউটার তৈরী করে নয়, সফট্ওয়্যার সৃষ্টি ও প্রকাশ-বিকাশ করে। সফট্ওয়্যার ব্যবসা তাই এখন একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

কম্পিউটার ও ইনটারনেট

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্বজুড়ে ইনফরমেশন (তথ্যাদি) সহজে এবং কম খরচে বিনিময় করার উদ্দেশ্যে ইনটারনেট নামে একটি অভিনব ব্যবস্থা চালু হয়। খুব শীঘ্রই এটা জনপ্রিয় একটি শিক্ষা-মাধ্যম ও তথ্য বিনিময় উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। আজকাল আপনি ইনটারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন অন্যান্য একাধিক স্থানে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এই ইনটারনেট সত্যিই ইনফরমেশন টেকনলজীকে বিপ্লবে পরিণত করে দিয়েছে। কম্পিউটারের উপর এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে এসে আমি এ সর্বাধুনিক কম্পিউটার বিপ্লবের উপর আলোকপাত করবো।

ইনটারনেট হলো একাধিক কম্পিউটার, যেগুলো টেলিফোনের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক হিসেবে জড়িত করা হয়। এ নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হতে সক্ষম। অর্থাৎ যেখানেই টেলিফোন লাইন থাকবে সেখানে একটি কম্পিউটার ইনটারনেটের নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত করা সম্ভব। এমনকি ল্যান্ড-লাইন না থাকলেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সুদূর মফস্বলে থেকেও আপনি ইনটারনেটের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে, অভিনব এই টেকনোলজি আসলে কি- তা একবার তলিয়ে দেখা যাক।

বাস্তবে ইনটারনেট হচ্ছে, মাকড়সার জালের মতো প্রকাণ্ড একটি ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্ক, যা ভূ-গোলকের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। ইনটারনেটকে Net বা জালও বলা হয়ে থাকে। যে মুহূর্তে আপনি আপনার নিজের কম্পিউটার ও টেলিফোনের (মডেম) মাধ্যমে ইনটারনেট খুলবেন, তখন আপনার কম্পিউটারও এই জালের অংশ হিসেবে হয়ে যাবে। নেটওয়ার্কে যে লক্ষ লক্ষ আরও কম্পিউটার একই সময় জড়িত আছে, তখন এগুলো আপনার সাথে ইনফরমেশন সেয়ার করতে পারবে, অর্থাৎ আপনি তাদের সাথে সরাসরি ইনফরমেশন রদবদল করতে পারবেন। ইনটারনেটের মাধ্যমে যে কোন ধরনের ফাইল স্থানান্তরিত করা যায়। আপনি যদি আপনার কোন বন্ধুর নিকট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানে পত্রাদির

মাধ্যমে যোগাযোগ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি ইনটারনেটের ই-মেইল (ইলেকট্রনিক মেইল) সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন। আপনার এ পত্র প্রথমতঃ একটি সুপারকম্পিউটার বা সার্ভারে জমা হয়ে থাকবে। যখনই আপনার বন্ধু ইনটারনেট খুলবেন তখনই সার্ভার থেকে আপনার বন্ধুর কম্পিউটারে লেখাটা পৌঁছে যাবে।



ইনটারনেট একটি পৃথিবী-বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

বস্তুত এই সুপারকম্পিউটার সার্ভারের মাধ্যমেই ইনটারনেটকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ ধরনের বহু সার্ভার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। এই অতিথি বা হস্‌ট কম্পিউটারের মাধ্যমেই আপনি ইনটারনেটে জড়িত হতে পারবেন।

ইনটারনেটে যোগ দিতে হলে কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। প্রথমতঃ আপনার একটা কম্পিউটার অবশ্যই থাকতে হবে। সেই সাথে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি মডেম এর দরকার। আজকাল এই মডেম কম্পিউটারের

সাথেই এসে থাকে। তারপর ইনটারনেটে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে কোন একটি সার্ভিস প্রভাইডার বা ইনটারনেটে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

আজকাল ঢাকা, সিলেট, চিট্টগ্রামসহ বাংলাদেশেরও বিভিন্ন শহরে এসব সার্ভিস প্রভাইডার আছে। এসব প্রতিষ্ঠান মাসিক বা বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট ফি নিয়ে থাকে। সাধারণতঃ যতোক্ষণ আপনি ইনটারনেট খুলে রাখবেন ততক্ষণ লক্যাল রেইটে টেলিফোন খরচ পড়বে, তবে এ খরচটা তেমন বেশী নয়। এর কারণ হলো আপনি পৃথিবীর যে কোন স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকলেও লক্যাল রেইটে টেলিফোন চার্জ হবে।

আজকাল ইনটারনেট সার্ভিস বেশ সস্তা হয়েছে। লণ্ডন-আমেরিকা ও ইউরোপে কোন কোন ক্ষেত্রে ইনটারনেট প্রায় ফ্রি হয়ে গেছে। এসব সার্ভিস প্রভাইডাররা তাদের আয় মূলত বিজ্ঞাপন থেকে পেয়ে থাকে। এছাড়া টেলিফোন কোম্পানী থেকেও তারা একটি লভ্যাংশ পায়।

ইনটারনেট সত্যিই ইনফরমেশন টেকনোলজীকে সর্বসাধারণের নাগালের ভেতরে এনে দিয়েছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের ধারণা, ২০১০ সাল নাগাত পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ বাড়িতেই এবং স্কুল কলেজে সর্বত্র ইনটারনেট চালু থাকবে।

ইনটারনেট যদিও আমাদের জন্য অনেক সুফল বয়ে নিয়ে এসেছে সত্যি- কিন্তু এসাথে নতুন প্রজন্মের নৈতিক ও মানসিক উন্নত চরিত্রগঠনে বিরাট হুমকিস্বরূপ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। অনিয়ন্ত্রিয় এই সর্বাধুনিক মিডিয়ায় অশ্লীলতা সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে- যা যে কোন ব্যবহারকারীর নিকট অনায়াসেই প্রাপ্য। সুতরাং ইনটারনেটের এই নেগিটিভ দিকটি নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে ভেবে শতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। এ ব্যাপারে প্রথমখণ্ডের শেষের দিকে কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করেছি। সুতরাং এখানে অতিরিক্ত আর কিছু বলার নেই। এ কথাগুলো প্রয়োজনের তাগিদে ইনটারনেট ব্যবহারকারীদের জ্ঞাতার্থে ব্যক্ত করলাম।

"তাঁরই স্বত্বাধীন যা কিছু আছে আসমানে, যা কিছু যমীনে, যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে" [সূরা ত্বাহা ঃ ৬]।

পরিচ্ছেদ ১১

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি

ইংরেজীতে টেলিকমিউনিকেশন শব্দটির অর্থ ব্যাপক। গ্রীক শব্দ টেলি- কে কমিউনিকেশন শব্দটির সঙ্গে যুক্ত করে এ শব্দটি সৃষ্ট। টেলি অর্থ দূরবর্তী স্থান বা শুধু দূরে। আর কমিউনিকেশন অর্থ যোগাযোগ। সুতরাং গ্রীক ও বাংলা শব্দের সমন্বয়ে 'টেলিযোগাযোগ' বলতে মূলতঃ কোন দূরবর্তী স্থানে সংবাদ বা মেসেজ প্রেরণকে বুঝায়। আধুনিক যুগে তাই রেডিও, টেলিভিশন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ই-মেইল, ফ্যাক্স, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, রাডার ইত্যাদি সবই হচ্ছে টেলিযোগাযোগের অন্তর্ভূক্ত। এককথায় তথ্য প্রেরণের জন্য যেসব দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং দূরত্বে পাঠানোর যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে তা সবই হলো টেলিযোগাযোগ।



টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির মূলে যে জিনিসটি সর্বক্ষেত্রেই কার্যকরী তাহলো তথ্যকে প্রথমে প্রযৌক্তিক উপায়ে এনার্জি বা উদ্যমে পরিণত করা।

সাধারণত তিনটি এনার্জিতে তথ্য রূপান্তর করা হয়। এগুলো হলোঃ ইলেকট্রিক এনার্জি, ইলেকট্রমেগন্যাটিক এনার্জি এবং আলো বা লাইট এনার্জি। এই এনার্জি সৃষ্ট হয় প্রথমে যেখান থেকে মেসেজ প্রেরণ করা হবে সেখানে। তারপর এই এনার্জিকেই আবার রিসিভার বা তথ্যসংগ্রহ যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দ, লিখিত ফাইল কিংবা ছবিতে রূপান্তরিত করা হয়, যাতে প্রাপক তা সহজে বুঝে নিতে পারে। অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংবাদটি কোন বিশেষ উপায়ে প্রথমে রেকর্ড করতে হয়- যেমন, মূদ্রণ, হাতের লেখা, ছবি, ডিস্ক, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি উপায়ে। কিন্তু টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে মিডিয়াম বা মাধ্যম হিসেবে এনার্জি ব্যবহৃত হয়। মাধ্যম হিসেবে এনার্জি ব্যবহারের মধ্যে বড় ধরণের সুবিধা আছে। প্রথমতঃ এনার্জিকে পাঠাতে গিয়ে আমরা স্বভাবের মৌলিক শক্তি ব্যবহার করতে পারি যেমন, বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি (ইলেকট্রমেগন্যাটিজম)। দ্বিতীয়তঃ এনার্জি প্রেরণ হবে অতিদ্রুত- বাস্তবে আলোকের গতির সমপরিমাণ গতিতে। তৃতীয়তঃ এটা সহজ ও পরিষ্কার পদ্ধতি। এছাড়া নিষ্কলুষ এনার্জির মাধ্যমে একাধিক তথ্য আমরা একই সঙ্গে প্রেরণ করতে পারি যেমন, শব্দ, ছবি ও গ্রাফিক্স।

মৌলিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি

চারটি মৌলিক যন্ত্র বা কম্পোনেন্ট দ্বারা টেলিযোগাযোগ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এগুলো হলোঃ ১. ট্রান্সমিটার (প্রেরকযন্ত্র), ২. সিগন্যাল (তরঙ্গ), ৩. মিডিয়াম (মাধ্যম) ও ৪. রিসিভার (প্রাপকযন্ত্র)।

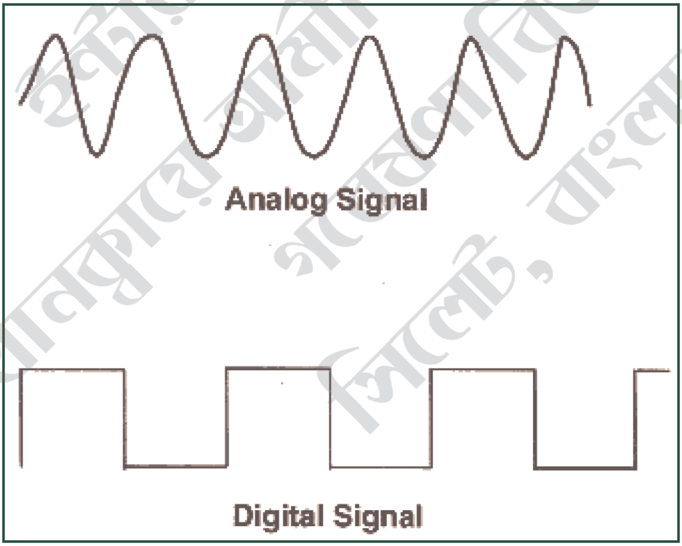
প্রেরকযন্ত্র কোন মেসেজকে প্রথমে একটি এনার্জি কিংবা তরঙ্গে পরিণত করে। এই এনার্জি একটি মাধ্যম যেমন, রেডিও-অডিও কিংবা ধাতুর তৈরী তার দ্বারা প্রাপকযন্ত্রে প্রেরণ করা হয়। প্রাপকযন্ত্র এই এনার্জিকে আবার মূল মেসেজে পুনঃরূপান্তর করে। প্রাপকযন্ত্র থেকে প্রেরকযন্ত্রে সংবাদ পৌছুতে কিছুটা এনার্জি বা তথ্য ক্ষয় হয়ে যেতে

পারে- এই ক্ষয় হওয়াকে বলে নইজ। এছাড়া প্রেরকযন্ত্র থেকে মেসেজ আবার প্রাপকযন্ত্রে ফিরে আসতে পারে- এটাকে বলে, ফিডব্যাক।

টেলিযোগাযোগের মৌলিক পদ্ধতি এটাই। এবার একে একে এসব সিস্টেম নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

এনালগ সিগন্যাল বা তরঙ্গ

তরঙ্গ ইলেকট্রিক্যাল কিংবা ইলেকট্রমেগন্যাটিক হতে পারে। ১৮৩৭ সালে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ সার্ভিস চালু হয়। বৃটিশ রেলওয়ে এই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল দ্বারা যোগাযোগ সৃষ্টি করে। একটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটে বিশেষ পদ্ধতিতে অন-অফ সুইচ দিয়ে টেলিগ্রাফ সিগন্যাল প্রেরণ করা হতো। এরপর সাম্যুয়েল এফ. মোর্স নামক একব্যক্তি ডট-ডাশ [ফোটা ও লাইন] সিস্টেম আবিষ্কার করেন। এই কোডিং মূলত লিখিত অক্ষর এবং নাম্বারের জন্য ব্যবহৃত হতো। এটাকে বলে মোর্স কোড।

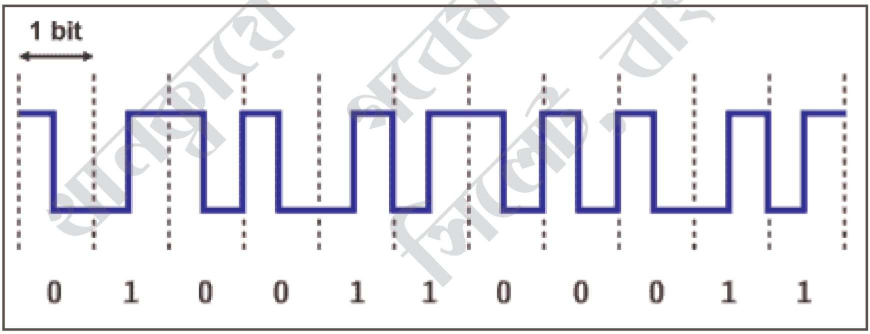


আলেকজান্ড্রার গ্রাহাম বেল কর্তৃক ১৮৭৬-৭৭ সালে টেলিফোন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত মোর্স কোডের মাধ্যমে টেলিগ্রাম সিস্টেমই ছিলো টেলিযোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। টেলিফোন মূলত একটি এ্যানালগ টেলিযোগাযোগ সিস্টেম। এটাকে এ্যানালগ বলার অর্থ হলো টেলিফোনের মাধ্যমে মূলত আপনার-আমার কথা থেকে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গকে ইলেকট্রিক্যাল ওয়েভে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ মানুষের কথার শব্দতরঙ্গ ও ইলেকট্রিক্যাল তরঙ্গ একটা আরেকটার সঙ্গে এ্যানালোজাস-সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ্যানালগ পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে, মডিউলেশন। এ্যানালগ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতি আছে যাকে বলে, ডিজিট্যাল কোডিং। ডিজিট্যাল মানে নাম্বার ব্যবহার। প্রতিটি তরঙ্গকে শূন্য (০) কিংবা এক (১)-এ পরিণত করে কোডিং করা হয়। এ উপায়ে কোর্ডি করলে সিগন্যাল হয় উন্নতমানের ও কলুষমুক্ত। আপনি নিশ্চয়ই ডিজিট্যাল টেলিভিশন বা টেলিফোনের কথা শুনেছেন। ডিজিট্যাল সিগন্যাল নিয়ে আমরা একটু পরই আলোচনা করবো।

এ পর্যন্ত সিগন্যাল প্রেরণের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি-যুক্ত ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ সিগন্যালকে ধাতুর তৈরী তারের মাধ্যমে প্রেরণ করার পদ্ধতি। কিন্তু তামার কিংবা অন্য কোন ধরণের ধাতুর তৈরী তার ছাড়াও সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিকে বলে রেডিও সিগন্যাল। তবে এটা মূলত একটি ইলোকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গ। স্বভাবের চার ফোর্সের একটি হচ্ছে এই এনার্জি বা তরঙ্গ। প্রাথমিক অবস্থায় এই তরঙ্গ ব্যবহারে এ্যানালগ সিস্টেমই চালু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দির শুরুতে ভয়েস বা কথা এবং শব্দতরঙ্গকে ইলেকট্রমেগন্যাটিক সিগন্যালে পরিণত করে পাঠানো হতো। এই তরঙ্গকে বলে ক্যারিয়ার ওয়েভ বা মাধ্যম তরঙ্গ। প্রাথমিক যুগে টেলিভিশন সিগন্যালও একই উপায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে অত্যন্ত জটিল টেকনোলজির মাধ্যমে শব্দ, কথা ও ছায়াছবিকে মাধ্যম তরঙ্গে (ক্যারিয়ার ওয়েভ) রূপান্তর করে পাঠিয়ে তা আবার টিভির পর্দায় সম্প্রচার করার ব্যবস্থা করা হতো।

ডিজিট্যাল সিগনাল

বিংশ শতাব্দির শেষের দিকে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার থেকেই ডিজিট্যাল সিগন্যালের প্রতি মানুষ ঝুকে পড়ে। আগেই বলেছি এই সিগন্যাল মূলতঃ নাম্বার কোডিং। এ্যনালগ সিস্টেমে কোন তরঙ্গকে ওয়েভ পেটার্নে পরিণত করে মাধ্যম তরঙ্গে বদলানো হতো। অর্থাৎ শব্দ কিংবা কথাকে প্রথমে একটি ইলেকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গে রূপান্তর করে ক্যারিয়ার ওয়েভ বানিয়ে দূরে প্রেরণ করার সিস্টেম প্রচলিত ছিলো। এই সিস্টেম এখনও আছে- তবে, ডিজিট্যাল সিগন্যাল এখন বেশি থেকে বেশি ফ্যাশনেবল হয়ে উঠছে। ডিজিট্যাল সিগন্যাল যেহেতু যিরো কিংবা এক দ্বারা কোডিং হয় তাই এটা নইজ থেকে অনেকটা মুক্ত। এছাড়া আরও সুবিধা আছে। মেসেজকে কম্পিউটার দ্বারা কমপ্রেস বা ছোটকরণও সম্ভব- এতে অল্প সময়ে বেশি মেসেজ প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া অত্যাধুনিক তথ্য-যোগাযোগ ইনটারনেটও এই ডিজিট্যাল সিগন্যালের উপর নির্ভরশীল। ডিজিট্যাল সিগন্যাল ব্যবহারে আরেকটি উল্লেখগুেযাগ্য সুবিধা হচ্ছে প্যাকেজ ট্রান্সমিশন। একই সঙ্গে বিভিন্ন তথ্য একত্রে পাঠানো সম্ভব- যেমন, ভয়েস (কথা), ইমেজ (ছবি), গ্রাফিক্স (চিত্রাঙ্কন), ডাটা (তথ্য) ইত্যাদি একই সঙ্গে প্যাকেজ হিসেবে প্রেরণ করা যেতে পারে।



যোগাযোগ স্যাটেলাইট

আজকাল টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদির সিগন্যাল পৃথিবীর যে কোন স্থানে সহজে ও একই সঙ্গে অসংখ্য সিগন্যাল প্রেরণ করা হচ্ছে মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। এই বিশেষ কৃত্রিম উপগ্রহকে বলে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ স্যাটেলাইট।

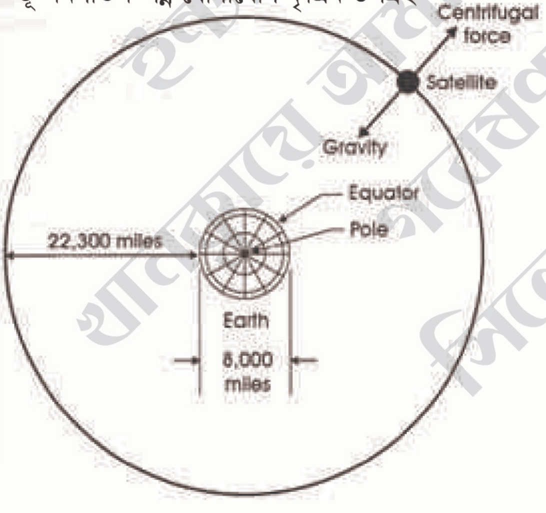
যোগাযোগ স্যাটেলাইট মূলত মহাকাশে জিও-স্টেশনারী কক্ষপথে ঘুর্নমান থেকে কাজ করে। জিও-স্টেশনারী অরবিট বা কক্ষপথ হচ্ছে- পৃথিবীর আহ্নিত গতির সমপরিমাণ গতিশীল কক্ষপথ। মনে করুন, বাংলাদেশের উপরে যদি একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট স্থাপিত হয় তবে তা সর্বদাই মহাকাশে একই অবস্থানে অর্থাৎ বাংলাদেশের উপরেই থাকবে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের ভূখণ্ড যে গতিতে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ছুটে যাচ্ছে সেই একই গতিতে স্যাটেলাইটটিও পূর্ব দিকে প্রদক্ষিণ করছে। এই উপায়ে প্রদক্ষিণকেই বলে জিও-স্টেশনারী অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় স্থির প্রদক্ষিণপথ।



প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক ঔপন্যাসিক আর্থার সি. ক্লার্ক ১৯৪৫ সালে জিও-স্টেশনারী অরবিটের ধারণা জন্ম দেন। ওয়েরলেস ওয়ার্লড নামক একটি ম্যাগাজিনে এ সম্পর্কে তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য রাশিয়া কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণের তখনও ১২ বছর (১৯৫৭ সাল) বাকী ছিলো। যা হউক, আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশ সরকারীভাবে এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করে বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছে। এবার দেখা যাক এসব উপগ্রহ কিভাবে কাজ করে।

যোগাযোগ স্যাটেলাইটে থাকে রেডিও রিসিভার ও ট্রান্সমিটার এবং এদের এ্যান্টেনা। পৃথিবী থেকে এসব রিসিভার (প্রাপক এ্যান্টিনা) সিগন্যাল গ্রহণ করার পর তা উন্নতমানের করে (আমপ্লিফিকেশন-এর মাধ্যমে)। এরপর এই সিগন্যালটিকে আবার পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করে। প্রতিটি স্যাটেলাইটের মূল পাওয়ার সোর্স হচ্ছে সোলার সেল (সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত এনার্জি)।

ভূ-সমগতিসম্পন্ন যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ



যোগাযোগ স্যাটেলাইটের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার্থে পৃথিবীর উপর প্রধান একটি স্টেশন থাকে। এই স্টেশনে বিরাট আয়তনের অন্তত একটি রিসিভার এ্যান্টেনা (প্রায় ৩০ মিটার ব্যসসম্পন্ন) থাকা জরুরী। এছাড়া থাকতে হবে একটি শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার (যেটির মাধ্যমে কয়েক শত ওয়াট থেকে কয়েক হাজার ওয়াট সিগন্যাল প্রেরণ করা যায়)। আর্থ-স্টেশন ছোট আকারেরও হতে পারে এবং একই স্যাটেলাইটের জন্য একাধিক স্টেশন থাকতে পারে। আর্থ-স্টেশন ও

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সিগন্যাল লেদদেন হয়। একটি স্যাটেলাইট টিভি স্টেশন থেকে অডিও-ভিডিও ডিজিট্যাল সিগন্যাল প্রথমে আর্থ-স্টেশনে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে সিগন্যালটি চলে যায় মহাকাশে স্থাপিত যোগাযোগ স্যাটেলাইটে। স্যাটেলাইট তা আমপ্লিফাই (উন্নত) করে আবার পৃথিবীপানে প্রেরণ করে। বিভিন্ন বাড়িতে স্থাপিত ডিশ-এ্যান্টেটা এই সিগন্যালকে ধরে টিভির পর্দায় এনে দেয়। প্রশ্ন জাগতে পারে এভাবে সিগন্যাল প্রসেসিং কেমন করে এতো দ্রুত সম্পন্ন হয়? বাস্তবে কোন লাইভ বা সরাসরি সম্প্রচারে তো আমরা কোন সময় অপচয় হতে দেখি না? এ প্রশ্নের জবাব হলো, ইলেকট্রম্যাগনাটিন যে কোন সিগন্যাল আসলে আলোকের গতিতে চলে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল হলো এ সিগন্যালের গতি। সুতরাং পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত কিংবা মহাকাশে ২০০-৩০০ মাইল ভ্রমণে অত্যল্প সময় অতিবাহিত হয়। তাই আমরা এই- মাত্র এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় দেরী হওয়া অনুধাবন করতে পারি না। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ থেকে একটি সিগন্যাল পৃথিবীতে আসতে পুরো ২০ মিনিট সময় লেগে যায়- যদিও তা এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিসম্পন্ন। সুতরাং টিভি স্টেশন যদি মঙ্গলে হয় তবে প্রতিটি সিগন্যাল বা ছবি দেখতে আমাদের ২০ মিনিট সময় অপেক্ষা করতে হতো।

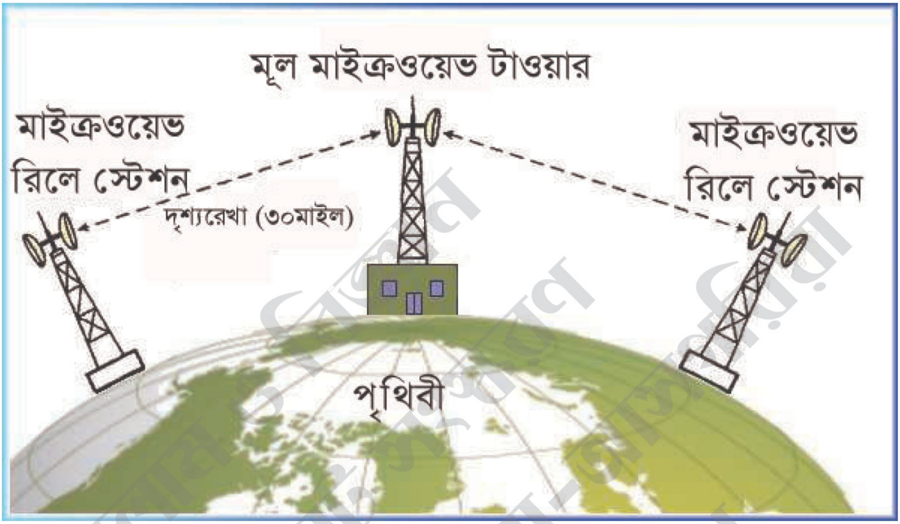
মাইক্রওয়েভ

ইলেকট্রমেগন্যাটিক তেজষ্ক্রিয়ার একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (ওয়েভলেনথ) ও ফ্রিক্যুয়েন্সি (প্রতি সেকেন্ডে যে ক'টি ওয়েভ বিকিরণ হয় তাকে বলে ফ্রিক্যুয়েন্সি- বাংলায় বলা যায় তরঙ্গহার) আছে যাকে বলে মাইক্রওয়েভ। এসব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার এবং এর ফিক্যুয়েন্সি ৩ থেকে ৩০০ গাইগা হার্টজ (এক গাইগা হার্টজ = ১ বিলিয়ন হার্টজ্) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি থেকে মাইক্রওয়েভের তরঙ্গ-দৈর্ঘ অনেকটা ছোট আবার ইনফ্রারেড রেডিয়েশন থেকে তা অনেকটা দীর্ঘায়িত। সুতরাং মাইক্রওয়েভ হলো রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি ও ইনফ্রারেড ফ্রিক্যুয়েন্সি থেকে ভিন্ন একটি তেজষ্ক্রিয়া। এই তেজষ্ক্রিয়া একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রওয়েভ ওভেন বা কুকারের কথা আমরা সবাই জানি। এই তরঙ্গের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে তাপশক্তি সৃষ্টি করে খাদ্য পরিপাক করা হয়। মাইক্রওয়েভ রাডার ও অন্যান্য কমিউনিকেশন সিস্টেমেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টেলিফোন ও টেলিভিশন সিগন্যাল ক্যারি বা বহণের জন্য মাইক্রওয়েভ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ রেডিও তরঙ্গের পরিবর্তে মাইক্রওয়েভ ব্যবহার অনেকটা উন্নতমানের। এরমধ্যে একটি দিক হলো, এই ওয়েভ দ্বারা বেশি তথ্য প্রচার করা সম্ভব। কারণ, যেহেতু এর ফ্রিকুয়েন্সি বেশি আর ইনফরমেশন ক্ষমতা ফ্রিকুয়েন্সির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে মাইক্রওয়েভের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা আছে। প্রেরিত সিগন্যাল পৃথিবীর বায়ূমণ্ডল পেরিয়ে চলে যায়- অন্যান্য সিগন্যালের মতো এটা ফিরে আসে না। এ কারণে মাইক্রওয়েভ শুধুমাত্র দিগন্ত (হোরাইজন) পর্যন্ত প্রেরণ করা সম্ভব। এই সমস্যা দূর করতে ৪০ কিলোমিটার পর পরই একেকটি রিলে স্টেশন তৈরী করে একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে। এছাড়া মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহের মাধ্যমেও মাইক্রওয়েভের এই সমস্যা দূর করা যায়।

মাইক্রওয়েভ ট্রান্সমিশন ও রিসেপশন

মাইক্রওয়েভ অন্যান্য সকল ইলেকট্রমেগন্যাটিক রেডিয়েশনের মতো আলোকের গতিতে চলে। তবে মাইক্রওয়েভকে কোন কোন ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা তথা গাইড করতে হয়। এ কাজটি এ্যান্টেনার মাধ্যমে করা যায়। এই এ্যান্টেনা এবং প্রাপক এ্যান্টেনা কিছুটা ভিন্ন ধরণের।



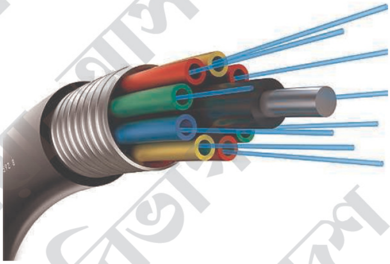
মাইক্রওয়েভ একটি নতুন টেকনোলজি। এ থেকে ভবিষ্যতে আরও উন্নতমানের যোগাযোগ সিস্টেম আবিষ্কৃত হবে বলে অনেকেই বলে থাকেন। তবে মাইক্রওয়েভ একটি উচ্চতর এনার্জির তেজস্ক্রিয়া। এ থেকে মানুষের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয় কি না সেটাই ভাবার বিষয়।

ফাইবার অপটিক্স

অপেক্ষাকৃত নতুন আরেক ধরণের যোগাযোগ টেকনোলজির উদ্ভাবন ঘটেছে যার নাম হলো ফাইবার অপটিক্স। চুলের মতো সরু কাঁচের তৈরী ফাইবার টিউবের ভেতর দিয়ে আলো প্রেরণ করে তথ্য প্রচার হচ্ছে এই নতুন প্রযুক্তি। কাঁচের ভেতর থেকে আলো বেরিয়ে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব কারণ, আলোর তুলনায় ফাইবারের রিফ্লেকটিভ ইনডেক্স (আলো প্রতিবিম্ব হওয়ার একটি পরিমাপ) অনেকটা বেশী। এটা আগে থেকে জানা, আলোর নিজের রিফ্লেকটিভ ইনডেক্স যদি যে মাধ্যমের উপর দিয়ে সে চলমান তার তুলনায় কম হয় তবে, তা বেরিয়ে আসতে পারে না। অর্থাৎ আলো আটকা পড়ে যায়। ফাইবার কাঁচের ভেতর থেকে তাই আলো সামনের দিকে চলমান থাকে। ফাইবার কাঁচ আয়নার মতো কাজ করে। এখন, যে আলো এই টিউবের ভেতর দিয়ে

ভ্রমণ করবে তাতে যদি তথ্য থাকে তবে তা সহজেই এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রেরণ করা যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, যে কোন তথ্যকে প্রযৌক্তিক উপায়ে তিনটি ভিন্ন এনার্জিতে রূপান্তর করা যায়। এগুলো হলো, ইলেকট্রিক (কারেন্ট), ইলেকট্রমেগন্যাটিক (রেডিও ওয়েভ) এবং আলো। সুতরাং প্রযুক্তির মাধ্যমে অডিও-ভিডিও কিংবা অন্য কোন তরঙ্গকে আলোক-তরঙ্গে রূপান্তর করা যেতে পারে। এরপর এই আলোক-তরঙ্গকে ফাইবার অপটিক্স দিয়ে প্রেরণ করে যোগাযোগের সিস্টেম তৈরী সম্ভব।





আধুনিককালে ফাইবার অপটিক্স টেকনোলজি পশ্চিমা দেশে সর্বত্র খুব দ্রুত গজিয়ে উঠছিলো। টিভি, রেডিও এই টেকনোলজির মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঘরে ঘরে স্থাপিত হচ্ছিলো। ফাইবার অপটিক্স কমিউনিকেশনও অন্যান্য সিস্টেম থেকে অনেকটা ভালো। এর মাধ্যমে অসংখ্য ধরণের সিগন্যাল সহজে ও দ্রুত প্রেরণ করা যায়।

“আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে”
[সূরা নাম্‌ল ঃ ৭৫]।

পরিচ্ছেদ ১২

এনার্জি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সচরাচর ব্যবহৃত ও সম্পৃক্ত একটি শব্দ হচ্ছে এনার্জি। এনার্জিকে বাংলায় শক্তি, বল, উদ্যম ইত্যাদি বলা যায়। তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এনার্জির একটি বিশেষ স্থান আছে। বাস্তবে এর একটি স্বতন্ত্র অর্থও আছে। এই পরিচ্ছেদে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এনার্জির স্বরূপ আমরা আলোচনা করবো।

এনার্জি কি?

গ্রীক শব্দ এনার্জিয়া থেকে এনার্জি শব্দটি ধারকরা হয়েছে। এনার্জিয়ার অর্থ হলো, কর্মশীল। এনার্জির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হলো কর্মের ক্ষমতা। কর্মক্ষমতা বা এনার্জি সাধারণত মেকানিক্যাল (যান্ত্রিক) কর্ম সিহেবে মাপা যায়। এনার্জি মাপার ইউনিট হলো ওয়াট ও জুল্‌স।



বাতাস (বায়ে) ও সৌরবিদ্যুৎ (ডানে) থেকে এনার্জি আহরণ।

বিভিন্ন ধরনের এনার্জি

এনার্জি অনেক ভিন্ন অবস্থায় অস্তিত্বশীল হতে পারে। এরমধ্যে প্রধান ক'টি হলো, পটেনশিয়াল (জমাকৃত বা সম্ভাব্য এনার্জি), কিনেটিক (গতির মধ্যে এনার্জি), রসায়নিক (বস্তুর আভ্যন্তরীণ এনার্জি), আলোক এনার্জি ইত্যাদি। এনার্জি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরও করা যায়- যেমন পেট্রল (রসায়নিক এনার্জি) জ্বালিয়ে একটি গাড়ির ইঞ্জিন পরিচালনা (মেকানিক্যাল এনার্জি)। এনার্জি পরিবর্তনের সময় কর্ম সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় এনার্জি রদবদলের সময় আমরা এই এনার্জি থেকে উপকারযোগ্য কর্ম (ওয়ার্ক) পেয়ে থাকি। সুতরাং টেকনোলজি মূলত এনার্জি নিয়েই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আমরা আসলে কোন এনার্জি সৃষ্টি করতে পারি না। বাস্তবে এনার্জি সৃষ্টি অসম্ভব। আমরা এক ধরনের এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে অন্য ধরনের এনার্জিতে পরিণত করি মাত্র এবং এরই মাধ্যমে আমাদের কাঙ্খিত কর্মটি সম্পাদিত হয়।

ম্যাস (বস্তু) ও এনার্জি

আলবার্ট আইনস্টাইন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, বাস্তবে বস্তু নিজেই এক ধরনের এনার্জি। তিনি তাঁর প্রখ্যাত সমীকরণ ই=এমসি স্কোয়ার দ্বারা তা দেখিয়েছেন। এখানে ই হচ্ছে এনার্জি, এম বস্তুর মধ্যকার ম্যাস এবং সি হলো আলোকের গতি। লক্ষ করুণ এমনিতেই আলোকের গতি বিরাট (১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড) আর এখানে এই গতির নিজস্ব গুণফল বলা হয়েছে। সুতরাং সামান্য একটু বস্তুর মধ্যে কত বিরাট অংকের এনার্জি বিদ্যমান তা সহজেই অনুমেয়। তবে সাধারণত বস্তুকে এরূপ বিরাট অংকের এনার্জিতে রূপান্তর সম্ভব নয়। যদিও এই সমীকরণ থেকেই আনবিক বোমা তৈরী হয়েছিল।একটি আনবিক বোমার জন্য মাত্র ৫ থেকে ৭ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম পদার্থের প্রয়োজন। আইনস্টাইনের সমীকরণ এটাই বুঝাচ্ছে যে, বস্তুকে যদি নিষ্কলুষ এনার্জিতে রূপান্তর করা যায় তবে তা হবে বিরাট শক্তিবিশিষ্ট।



কিনেটিক এনার্জি হচ্ছে- গতিশীলতার মাধ্যমে সৃষ্ট এনার্জি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন একটি বস্তু যার ম্যাস হলো m এবং k গতিতে তা চলমান আছে। এরূপ বস্তুর মধ্যে এনার্জি = $1/2 *m*k^2$ হবে। অর্থাৎ তাহলো, ০.৫ পুরণ m পুরণ (k*k)। মনে করুন বস্তুটির ওজন ১০ কেজি, এর গতি ৩ মিটার প্রতি সেকেন্ড- তাহলে এর মধ্যে কিনেটিক এনার্জি হবে, ০.৫x১০x(৩x৩) = ৪৫।

পটেনশিয়াল এনার্জি

এই এনার্জি হলো- জমাকৃত বা সম্ভাব্য এনার্জি। একটি স্প্রিংয়ের মধ্যে সম্ভাব্য এনার্জি থাকতে পারে। এটাকে টেনে লম্বা করার পর ছেড়ে দিলে জমাকৃত এনার্জি মুক্ত হয়ে কিনেটিক এনার্জিতে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে পটেনশিয়াল এনার্জি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীর মহাকর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি বস্তুকে যদি উপরে ওঠানো হয় তবে তার মধ্যে মহাকর্ষজণিত পটেনশিয়াল এনার্জি জমা হবে।

ইলেকট্রিক্যাল চার্জের মধ্যে থাকে সম্ভাব্য এনার্জি যা কর্মের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। কেপ্যাসিটর নামক একটি ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশে এভাবে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি জমা করে রাখা হয়। প্রয়োজনে এটাকে ডিসচার্জের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে কাংখিত কর্ম সম্পাদিত হতে পারে। এরপর এটাকে আবার চার্জ করে এনার্জি জমা করা যায়।

আভ্যন্তরীণ এনার্জি

বস্তুর ভেতরের এটম ও মলিকিউলের মধ্যে যেসব এনার্জি থাকে এগুলোকে বলে আভ্যন্তরীণ এনার্জি। এই এনার্জি যখন কোন কারণে রদবদল হয় তখন কোন কোন সময় ফলাফলস্বরূপ বস্তু থেকে তাপ এনার্জি বেরিয়ে আসে। মনে করুন এক টুকরো ধাতু আগুনে রাখা হলো। এতে ধাতুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবেঃ এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ হলো, আগুন থেকে তাপ এনার্জি ধাতুর আভ্যন্তরীণ এনার্জিকে বৃদ্ধি করেছে; ধাতুর এটমগুলো বেশি দ্রুত কম্পন করছে এবং একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য এনার্জি

উপরোক্ত ভিন্ন ধরণের এনার্জি ছাড়াও আরও বহু রকমের এনার্জি স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান। এর একটি হলো রেডিয়াল (দীপ্তিমান) এনার্জি। এটা মূলত ইলেকট্রমেগন্যাটিক কম্পন থেকে সৃষ্ট- যেমন, আলো বা রেডিও তরঙ্গ। অপর আরেকটি এনার্জি হচ্ছে মেগন্যাটিক ফিল্ড এনার্জি। একটি ইলেকট্রমেগন্যাটে এই এনার্জি জমা থাকতে পারে। কারণ, এটি বৈদ্যুতিক তার দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং যখন কারেন্ট চলে তখন এটার মধ্যে মেগন্যাটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়। তেজষ্ক্রিয়া, এক্স-রে, আলফা-বিটা-গামা তরঙ্গ ইত্যাদি সবই একেক ধরণের এনার্জি।

এনার্জি রূপান্তর

আগেই বলেছি, আমরা সর্বদাই এনার্জিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর বা পরিবর্তন করে থাকি এবং এর মাধ্যমেই উপযোগী কর্ম সাধিত হয়। তবে এই

রূপান্তর সীমিত। এছাড়া এনার্জি সৃষ্টি করা কিংবা রূপান্তরের সময় এর মাত্রা বাড়ানোও সম্ভব নয়। এনার্জি সংরক্ষণ আইন তা গ্রহণ করে না। এই আইন হলোঃ এনার্জি সৃষ্টিও করা যায় না কিংবা ধ্বংসও সম্ভব নয়- শুধুমাত্র এটাকে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় রূপান্তর সম্ভব। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়তো ভালো হবে।

আমরা সবাই আনবিক শক্তির চুল্লীর কথা শুনেছি। এই পাওয়ার প্ল্যান্টের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক এনার্জি দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়া হয়। এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বাস্তবে কিভাবে কাজ করে?

প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম নামক ভারী পদার্থের এটমিক নিউক্লিয়াস রিয়েকশনের মাধ্যমে ভেঙ্গে পড়ে। এই ভেঙ্গে দেয়ার জন্য উচ্চগতিসম্পন্ন নিউট্রন নামক পরমাণু নিউক্লিয়াসের উপর পতিত করা হয়। এটমের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে আরও নতুন নিউক্লিয়াস তৈরী হয়। এর ফলে নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ এনার্জির ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু এই হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে রিয়েকশনকে ঠাণ্ডা করার জন্য যে ভারী পানি ব্যবহৃত হয় তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের এনার্জি ক্ষয়ের ফলাফল দাঁড়ায় পানির মধ্যে তাপ এনার্জি সৃষ্টি। এই উত্তপ্ত পানি থেকে সৃষ্টি হয় বাষ্প যা দিয়ে ইলেকট্রিক টারবাইন পরিচালিত হয়। টারবাইন থেকে সৃষ্টি হয় জেনরেটরের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যা শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরে ঘরে এসে পৌঁছে নেশন্যাল গ্রীডের মাধ্যমে।

এখানে এনার্জির রূপান্তরের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠেছে। ইউরেনিয়ামের আভ্যন্তরীণ এনার্জিকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করছি কয়েকটি ধাপে। প্রথমে আভ্যন্তরীণ এনার্জি থেকে আসছে তাপ এনার্জি, এরপর তাপ থেকে কিনেটিক এনার্জি তথা টারবাইন ঘুরানো হচ্ছে, সবশেষে টারবাইন দিয়ে ঘুরানো হচ্ছে একটি জেনারেটর। এটা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের শেষ এনার্জি ইলেকট্রিসিটি। তহালে দেখাই যাচ্ছে- আমরা মূলতঃ কোন এনার্জি সৃষ্টি করছি না, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় রূপান্তর করছি মাত্র।



এখন প্রশ্ন জাগতে পারে এনার্জি দিয়ে কার্য সমাধার পর এটা যায় কোথায়? যেহেতু আমরা জেনেছি, এনার্জি ধ্বংস করাও অসম্ভব। এর জবাব হলো এনার্জি কাজের মাধ্যমে মূলতঃ তাপ এনার্জি হিসেবে বায়ূমণ্ডলে চয়ে যায়। যেমন একটি লাইট বাল্ব থেকে শুধু আলোই বেরিয়ে আসে না, এ থেকে তাপ এনার্জিও বিকিরণ হয়। একটি জ্বলন্ত বাল্বে হাত লাগালেই তা বুঝতে পারা যায়। এনার্জি দিয়ে যখন কোন মেকানিক্যাল কার্য সমাধা হয়- যেমন একটি গাড়ির ইঞ্জিন চালনা, তখন ইঞ্জিনটি গরম হয়ে এনার্জি বায়ূমণ্ডলে মুক্ত হয়।

সুতরাং সবশেষে আমরা এটাই বলতে পারি- বিশ্বব্যাপী নেচালের এনার্জি সর্বত্র বিদ্যমান। আমরা এই এনার্জিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করে আমাদের প্রয়োজন মেটাই- এরপর এই এনার্জি আবার যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই ভিন্ন অবস্থায় ফিরে যায়। আর এই এনার্জিকে যে যতো বেশি কাজে লাগাতে সক্ষম সে-ই বেশি উপকৃত হয়- অর্থাৎ সেই দেশ বা জাতিই পৃথিবীর মধ্যে উন্নত জাতি।

"হে জ্বিন ও মানবজাতি! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও যমীনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও; কিন্তু ক্ষমতা (সুলতান) ব্যতিরেকে তোমরা বের হতে পারবে না" [সূরা আর-রাহমান ঃ ৩৩]।

পরিচ্ছেদ ১৩

মহাকাশ অনুসন্ধান

বিংশ শতাব্দির ষষ্ঠ দশকে মাহাকশ অনুসন্ধান যুগের সূচনা হয়েছিল। সূচনালগ্নে মাত্র কয়েক বছরের মাথায় এসেই প্রথমে কৃত্রিম রবট উপগ্রহ এবং পরে মানুষ স্ব-দেহে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশের একটি বস্তু চন্দ্রের উপর পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। এরপর একাধিক মানুষশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সৌরজগতের দূর-দূরান্তে- মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহে।

পৃথিবীর নিকট-মহাকাশে স্থাপিত আন্তর্জাতিক স্পেইস স্টেশন (ISS)।



তবে মহাকাশ যুগ এখনও বাস্তবে অতি টেণ্ডার বয়সের মধ্যে আছে। এখনও এ যুগটি সূচনালগ্ন পেরিয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক আশাতীত সফলতা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া এ যুগের সত্যিকারের সূচনা গেল শতকের ষাটের দশকে হয়ে থাকলেও এর জন্য থিওরিটিক্যাল ও প্রেকটিক্যাল উন্নয়ন-প্রস্তুতি কিন্তু অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান এই যুগের ফাউনেণ্ডশন প্রস্তর অনেক আগেই প্রোথিত করেছিল।

মহাকাশ অনুসন্ধানের মৌলিক উপায় হচ্ছে রকেট ইঞ্জিন সৃষ্টি। পৃথিবীর বায়ূমণ্ডল ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দিতে হলে এই রকেট ইঞ্জিনের বিকল্প নেই। এছাড়া এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি অর্জিত না হলে মহাকাশে যাওয়াও সম্ভব নয়- আর এই ভেলোসিটি অর্জনে প্রয়োজন পড়ে বিরাট অংকের এনার্জির। এসব প্রেকটিক্যাল সমস্যাবলীর সমাধান মানুষ খুঁজে বের করার পরই ব্যাপকভাবে মহাকাশ অনুসন্ধান প্রোগ্রাম শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে স্থাপন করে মাহাকাশ ও এর মধ্যে অসংখ্য বস্তু যেমন, গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, তারা, গ্যালাক্সি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহিত হতে থাকে। এছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা (ইতোমধ্যে এ ব্যপারে আলোচনা হয়েছে) সৃষ্টি হয়েছে। একবিংশ শতাব্দির শুরুতে স্থাপিত হয়েছে মহাকাশে আন্তর্জাতিক স্পেইস স্টেশন (আইএসআই)। আইএসআই একটি বিরাট কৃত্রিম উপগ্রহ- এতে একাধিক নভোচারী অনেকদিন পর্যন্ত বসবাস করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করবেন।

মৌলিক রকেট প্রযুক্তি

আইজ্যাক নিউটনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আইন রকেট প্রযুক্তির মধ্যে ব্যবহৃত হয়। রকেট ইঞ্জিনে থাকে হাইড্রোজেন জ্বালানী। হাউড্রোজেন জ্বলতে থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল ম্যাস (ওজন) অগ্নিকুণ্ডের আকারে রকেটের ইঞ্জিন থেকে দ্রুত নীচের দিকে বেরিয়ে

আসে। এরফলে সৃষ্টি হয় একটি উর্ধ্বগতিশীল ফোর্স যা ইঞ্জিনকে উপরের দিকে তুলে।



থ্রাস্ট বা ধাক্কা

রকেট ইঞ্জিনের থ্রাস্ট বা ধাক্কা পাউণ্ড কিংবা কিলোগ্রাম দিয়ে মাপা হয়। এক কে.জি থ্রাস্ট এর অর্থ হলো ৯.৮১ মিটার প্রতি সেকেন্ড গতি। এই গতি মহাকর্ষের গতির সমপরিমাণ।

এফিসিয়েন্সি বা কার্যদক্ষতা

একটি রকেট ইঞ্জিনের এফিনিয়েন্সি থেকেই এর সঠিক কার্যক্ষমতা নিরূপণ করতে হয়। স্পেসিফিক ইম্পাল্‌স (নির্দিষ্ট বেগ) হচ্ছে এটা নিরূপণের ইউনিট। এই ইউনিট = গতি / মহাকর্ষ। সুতরাং রকেটের উর্ধ্বগতিশীলতা যতো বেশি হবে এর নির্দিষ্ট বেগও ততো বড় হবে। সাধারণত রকেট ইঞ্জিনের স্পেসিফিক ইম্পাল্‌স হয়ে থাকে ২০০ ইউনিট। কিন্তু আনবিক শক্তিসম্পন্ন রকেট ইঞ্জিনের স্পেসিফিক ইস্পাল্‌স ৮০০ থেকে ৯০০ পর্যন্ত হতে পারে।

মহাকাশে রকেট প্রেরণে একাধিক স্টেজ বা পার্যায় ব্যবহৃত হয়। আরোহণের সময় প্রাথমিক পর্যায়ে বিরাট ফোর্সের প্রয়োজন পড়ে। বড় বড় বুস্টার ইঞ্জিনের মাধমে বিরাট মাত্রার জ্বালানি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেইস ক্রাফটিকে প্রথমে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্ত করতে হয়। মহাকর্ষ থেকে মুক্তির জন্য যে গতির প্রয়োজন তাকে বলে মুক্তগতি। এই গতি সম্পর্কে একটু পরই আলোচনা হবে।

উর্ধ্বাকাশে আরোহণের পর বুস্টার ট্যাংকের আর প্রয়োজন নেই তাই এগুলোকে ক্রাফট থেকে আলাদা করে ভূপাতিত করা হয়। সাধারণত এগুলো মহাসাগরে পতিত করা হয় যাতে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহার করা যায়। তবে এই প্রথম স্টেজের পরও স্পেইস ক্রাফটে আরও ইঞ্জিন থেকে যায়। এগুলো ক্রাফটিকে আরও উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়ার পর আলাদা করে দেয়া হয়। মহাশূন্যে অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ূমণ্ডলের বাইরে পৌঁছার পর কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে ঘুর্ণমান হয়। তখন আর বেশি ফোর্স বা পাওয়ারের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র ক্রাফটিকে সঠিক কক্ষপথে ঘুরানোর জন্য ধাক্কা লাগে যা অল্প শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন দিয়ে সহজে তা সম্পাদন করা যায়। কক্ষপথে একবার ঘুর্ণমান হয়ে গেলে ক্রাফটি পৃথিবীর মহাকর্ষ দ্বারা চালিত হয়।

বাস্তবে কক্ষপথে ঘুরার অর্থ হলো পৃথিবীর দিকে এমনিতেই পতিত হওয়া বা মুক্তভাবে পড়ন্ত অবস্থা (ফ্রি ফল), কিন্তু একটি নির্দিষ্ট এ্যাঙ্গুলে (বক্রভাবে) পতিত হওয়ায় তা পৃথিবীর উপর এসে পড়ে যায় না। ঠিক যেভাবে পৃথিবীর চতুর্দিকে চন্দ্র তার কক্ষপথে ঘুরে সেভাবে কৃত্রিম উপগ্রহও একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে

থাকে। সুতরাং চন্দ্রের যেহেতু কোন ইঞ্জিন নাই তাই ক্রাফটেরও কোন ইঞ্জিনের প্রয়োজন মূলত নেই। তবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনে আবার পৃথিবীতে ফিরে আনতে যেয়ে ছোট্ট আকারের একটি ইঞ্জিন এর গায়ে জড়িত করে দেয়া হয়।

মিশন

একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ সহজ ব্যাপার নয়। এটা একটি মিশন। প্রতিটি কাজ সুস্পষ্টভাবে সম্পাদন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষজ্ঞ টীম। সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো: ১. লঞ্চ (উৎক্ষেপণ), ২. ইনফ্লাইট অপারেশন (উড়ান্তাবস্থায় নিয়ন্ত্রণ) ও ৩. পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা (তবে সর্বক্ষেত্রে নয়)।

লঞ্চ: রকেট ইঞ্জিনসহ উপগ্রহটিকে খাড়াভাবে একটি লঞ্চ প্যাডে রাখা হয়। এরপর উচ্চতর ধাক্কা সৃষ্টিতে বিরাট মাত্রার জ্বালানী ব্যবহারের মধ্যমে ছোড়ে দেয়ার জন্য ফোর্স তৈরী করা হয়। বুষ্টার ইঞ্জিন থেকে নিম্নের দিকে খুব দ্রুত আগুন বেরুতে থাকে। এরফলে মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত ক্রাফটের বিরাট ওজনকে উপরের দিকে তুলা হয়। স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হতে বেশি পাওয়ারের প্রয়োজন। যেমন, একটি গাড়ির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গিয়্যার হলো ফাষ্ট গিয়্যার। এর কারণ হলো গাড়িটিকে স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল করতে বেশি ফোর্সের প্রয়োজন। কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সময়ও স্থির অবস্থা থেকে উপরের দিকে গতিশীল করতে বেশি শক্তির দরকার হয়। এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অনেক জ্বালানী ক্ষয় হয়ে যায়। বুষ্টার ইঞ্জিন ক্রাফটির গতি ৭,৬০০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে নিয়ে পৌঁছায়। সাধারণতঃ ২ মিনিটের মধ্যেই সমগ্র ক্রাফটি অন্তত ১০০ মাইল ঊর্ধ্বে আরোহণ করে।

কৃত্রিম উপগ্রহকে একশ মাইল ঊর্ধ্বে তুলেই পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুর্ণমান করা হয়। এই কক্ষপথকে বলে লো আর্থ অরবিট [এলইও], অর্থাৎ পৃথিবীর নিম্ন প্রদক্ষিণপথ। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বা যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহকে আরও বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে

যেতে হয়- এই কক্ষপথকে বলে, জিওসিক্রোনাস বা জিওষ্টেশনারী অরবিট [জিএসও], অর্থাৎ ভূখণ্ডস্থির প্রদক্ষিণপথ। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। জিএসও মূলতঃ ২৪ ঘণ্টার অরবিট। অর্থাৎ পৃথিবীর আহ্নিত গতির সমপরিমাণ, এর ফলে ক্রাফটি পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডের উপর স্টেশনারী বা স্থির থাকে।

কোন স্পেইস ক্রাফট্‌কে যদি পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হয়, যেমন, আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের জন্য- তাহলে এটাকে মহাকর্ষ থেকে একটি বিশেষ ফোর্স দ্বারা মুক্ত করে দিতে হবে। অর্থাৎ মুক্তগতির মাধ্যমে এমন ধাক্কা দিতে হবে যাতে পৃথিবীর মহাকর্ষ এটাকে আর আটকে রাখতে না পারে [মুক্তগতি সম্পর্কে বিস্তারিত একটু পরই বর্ণিত হবে]।

ইনফ্লাইট অপারেশনঃ উড়ান্তাবস্থায় ক্রাফটিকে নিয়ন্ত্রণ, ন্যাভিগেশন ও কন্ট্রোল করতে হবে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থার বিশেষ অর্থ আছে। গাইড্যান্স বা নিয়ন্ত্রণ হলো ক্রাফটিকে কোনদিকে নিয়ে মহাকাশে স্থাপন করা হবে- যেমন, কোনো বিশেষ গ্রহের কক্ষপথে নেয়া কিংবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে ডক করা (ভিড়ানো)। ন্যাভিগেশনের মাধ্যমে উড়ান্তাবস্থায় ক্রাফটি কোনো বিশেষ সময়ে এবং ভবিষ্যতে ঠিক কোন স্থানে এটি অবস্থান করবে তা নির্ণয় করা হয়। কন্ট্রোল অর্থ হলো যে কোন সময় ক্রাফটির গতিপথ রদবদল করার ব্যবস্থা। সাধারণতঃ কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যে ছোট্ট রকেট ইঞ্জিন থাকে সেটি দিয়ে এ কাজটি আঞ্জাম দেয়া হয়।

একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। ক্রাফটের ওজন, গতি, অবস্থান, মহাকর্ষ ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে নির্ণয়ের মাধ্যমে অঙ্ক কষে এর নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হবে তা জেনে নিয়ে রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে অন-বোর্ড (ক্রাফটের আভ্যন্তরে স্থাপিত) কম্পিউটারে ইন্সট্রাকশন বা নির্দেশ দিতে হবে। এই কাজটির জন্য কর্মশীল থাকে একটি গ্রাউন্ড ক্রু। ক্রাফটের অবস্থান নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। শক্তিশালী রাডার থেকে মহাকাশে সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়। এই সিগন্যাল স্পেইস ক্রাফট থেকে ফিরে আসার পর এর

অবস্থান হিসেব করে বের করা যায়। তবে এ উপায়ে অবস্থান নির্ণয় নিম্ন কক্ষপথে স্থাপিত ক্রাফটের বেলা প্রযোজ্য।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের অবস্থান তার নিজের রেডিও সিগন্যাল থেকে জানা যায়। আর যেসব স্পেইস ক্রাফট আন্তঃগ্রহ মহাকাশে চলমান থাকে এগুলোর অবস্থান জানতে বিজ্ঞানীরা রেডিও সিগন্যাল ও তা ফেরত আসার মাধ্যমে হিসেব করে বের করেন। অবশ্য সিগন্যাল যাওয়া আসার সময়, রেডশিফট (টার্গেট পর্যবেক্ষকের নিকট থেকে দূরে যেতে সিগন্যালের রদবদল- ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে) এবং ডপলার এফেক্ট (এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে) ইত্যাদি বিষয় হিসেবে নিতে হবে। একটি ক্রাফটকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। ক্রাফটের মধ্যেও অটোমেটিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। মহাকাশে তারার অবস্থান, যে কোন মুহূর্তে তার নিজের অবস্থান ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান ইত্যাদি থেকে ক্রাফটের নিজস্ব কম্পিউটার হিসেব করতে পারে ঠিক কোথায় ক্রাফটি আছে এবং কোনদিকে চলতে হবে। প্রয়োজনে এই অটোপাইলট সিস্টেম দিয়েও যানটিকে কাংখিত পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পাওয়ার সাপ্লাই

মহাকাশযানের মৌলিক পাওয়ার সোর্চ হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। স্বল্পমেয়াদী কৃত্রিম উপগ্রহকে সাধারণ ব্যাটারী কিংবা উচ্চ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ফিউল সেল দ্বারা পাওয়ার দেয়া হয়ে থাকে। ফিউল সেল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে যার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বা বৈর্জ্য হলো পানি।

দীর্ঘমেয়াদী কত্রিম উপগ্রহে থাকে সোলার প্যানেল। পাখার মতো স্থাপিত এসব প্যানেলে আছে অসংখ্য সোলার সেল [সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির এক ধরণের ব্যাটারী]। কোন কোন ক্রাফটে সেলগুলো চতুর্দিকে জড়িয়ে দেয়া হয়। তবে এই সেলগুলো থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ কিছু সাধারণ ব্যাটারীকে চার্জের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কারণ সবসময় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সূর্যালোক পায় না। তার কক্ষপথে ঘুরার সময় এক পর্যায়ে পৃথিবী বা গ্রহের ছায়র মধ্যে পতিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

সোলার এনার্জি কিন্তু দূর দূরান্তে মিশনের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়। বিরাট গ্রহ জুপিটার ও এর থেকে দূরবর্তী গ্রহে ভ্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহে ছোট্ট আনবিক জেনারেটর ব্যবহার করা হয় পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য। সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে থার্মোইলেকট্রিক (তাপইলেকট্রিক) সিস্টেম। তেজষ্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট তাপকে থার্মোকাপোল্স নামক একটি যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়।

পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাঃ কোন মহাকাশযানকে যদি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন পড়ে যেমন স্পেইস শ্যাটল, তাহলে একটি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অবরোহণ করতে হবে। প্রথমে ডি-অরবিট নামক একটি স্টেজ আছে। এর মাধ্যমে ক্রাফটের মধ্যে স্থাপিত যন্ত্র দিয়ে এটির গতি কমিয়ে আনা হয়। এই অল্পমাত্রায় গতি স্তিমিত হওয়ার ফলেই কিন্তু ক্রাফটি পৃথিবীর দিকে অবরোহণ শুরু করবে। পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ূমণ্ডল এই গতিকে আরও কমাতে থাকবে। এরপর শুরু হবে বায়ূমণ্ডলে রি-এন্ট্রি বা পুনঃপ্রবেশ ফেইজ। এই ফেইজ ক্রাফটের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা। ক্রাফটের একটু সামনেই সৃষ্টি হয় বিরাট উচ্চতাপ। বাস্তবে ক্রাফটের দেহে সরাসরি কোন তাপমাত্রা হয় না, গতিশীল ক্রাফট থেকে সৃষ্ট শক্-ওয়েভ সামনের বায়ূর মধ্যে কমপ্রেশন (চাপের মাধ্যমে এঁটে দেয়া) তৈরী হয়- যা এই তাপসৃষ্টির জন্য দায়ী।

সময় সময় ক্রাফটের সামনের বায়ূ প্লাজমা অবস্থায় পৌঁছে যায় যার তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রার সমান হতে পারে। এই উচ্চতাপে ক্রাফটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। সুরতাং এ থেকে রক্ষার্থে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। বারবার ব্যবহারযোগ্য স্পেইস ক্রাফট শ্যালট-এর দেহে এই অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক ধরণের বিশেষ টালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো মূলতঃ তাপ-ইনস্যুলেটর- অর্থাৎ তাপকে এই বস্তু ভেতরের দিকে যেতে বাঁধা দেয়।

উচ্চগতিশীল ক্রাফটকে বায়ূমণ্ডল খুব দ্রুত কমগতিতে নামিয়ে আনে। বাস্তবে বায়ূমণ্ডল গাড়ির ব্রেকের মতো কাজ করে। এসময় অপর একটি ব্যাপার হচ্ছে রেডিও যোগাযোগ ব্লাক-আউট। পৃথিবী ও ক্রাফটের মধ্যে যোগাযোগ রাখা যায় না। ভীষণ তাপযুক্ত বাতাস আয়োনাইজ (চার্জ অবস্থা) হয়ে ক্রাফটকে ঘিরে রেখে রেডিও-তরঙ্গ আসা-যাওয়া অসম্ভব করে দেয়।

এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তগতি

এ পর্যন্ত মুক্তগতি শব্দটি একাধিকবার লেখা হয়েছে। এটা হচ্ছে পৃথিবী বা যে কোন গ্রহ-উপগ্রহের মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গতি।

সবকিছুর মধ্যে স্বভাবের মৌলিক ফোর্স মহাকর্ষ ক্রিয়াশীল আছে। একটি বড় জড়বস্তু যেমন সূর্য বা পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট মহাকর্ষ আছে যা তার জড়বস্তুর পরিমাণের (মূলত এর ওজনের) উপর নির্ভরশীল। জড় যতো বেশী থাকবে মহাকর্ষও ততো বেশি হবে। মহাকর্ষের এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত না হতে পারলে কোন বস্তু কিংবা একটি স্পেইস ক্রাফট মহাশূন্যে যেতে সক্ষম হবে না। একটা দৃষ্টান্ত হলো উড়োজাহাজ। আমরা জানি, পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাকায় পৃথিবীটা একটি উচ্চগতিতে (প্রতি সেকেন্ডে ২৭ মাইল) পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে (স্পিন করছে)। উড়ন্ত একটি বিমান যখন আকাশে ভ্রমণ করে তখন এই গতির ফলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যেতে গতি হওয়ার কথা, বিমানের নিজস্ব গতি + আহ্নিক গতি। অপরদিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে আহ্নিক গতি − নিজস্ব গতি হওয়ার কথা। অর্থাৎ যেহেতু নিম্নের ভূমি এমনিতেই ভ্রমণরত সুতরাং এক দেশ থেকে আরেকদেশে উড়ে যেতে নীচের মাটির ভ্রমণকেও হিসেবে ধরতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রেয়োজন নেই। ৫০০ মাইল কিংবা ১০০০ মাইল গতিশীল হলেও বিমানটি আসলে মহাকর্ষের খপ্পর থেকে মুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটি যেভাবে আমাদের নিয়ে ঘুরছে সেভাবে বিমনটিকেও সে না ছেড়ে ঘুরাতে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবী তার বায়ূমণ্ডলসহ ঘুরে। আর বায়ূমণ্ডলে গতিশীল কোন বস্তুকে সে ঘুরায়। একারণে বিমানের গতি হবে নীচের মাটির সঙ্গে তুলনামূলক। কিন্তু বিমানের গতি যদি হয় ১০,৮০০ মিটার প্রতি সেকেন্ড! তহালে ভিন্নকথা। কারণ এই গতি পৃথিবী থেকে মুক্তির গতি বা মুক্তগতি। এরূপ গতিশীল বস্তুকে মহাকর্ষ আটকে রাখতে পারে না। তবে যতো বেশি ঊর্ধ্বে আরোহণ করা হবে মুক্তগতির মাত্রাও ততো বেশি কমে আসবে। বাস্তবে একটি স্পেইস ক্রাফট যখন ১ মিলিয়ন মাইল দূরত্বে চলে যায় তখন সেটা পৃথিবীর মহাকর্ষের প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত হবে। কিন্তু তখন এটা সূর্যের বিরাট মহাকর্ষে আবদ্ধ হয়ে ঘুরতে থাকবে। সূর্যের

মুক্তগতি হলো ৬১৭.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। সুতরাং সৌরজগত থেকে মুক্ত হতে হলে এই গতির প্রয়োজন।

এস্কেপ ভেলোসিটি নির্ণয়ের একটি সরল পদ্ধতি আছে। এই ফর্মুলাটা হলোঃ Sq(2 x GM/R) এখানে Sq অর্থ ব্র্যাকেটের সবকিছুর ফলাফলের স্কোয়ার রুট, G হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন্যাল স্থির নাম্বার (বর্তমানে যে নাম্বার সাবাই মেনে নিয়েছেন তা হলো, G = 6.67259×10^{-8}), M অর্থ গ্রহের ম্যাস (ওজন) এবং R হলো গ্রহের ব্যাসার্ধ (রেডিয়াস)।

বস্তু	ওজন (কি.গ্রা.)	ব্যাস (কিমি)	মুক্তগতি
সূর্য	১.৯৯×১০^{৩০}	৬,৯৬,০০০	৬.১৭৭×১০^{৭} সেমি/সে
বুধ	৩.৩×১০^{২৩}	২,৪৩৯	৪.৩ কিমি/সে
শুক্র	৪.৮৭×১০^{২৪}	৬,০৫১	১০.৩ কিমি/সে
পৃথিবী	৫.৯৮×১০^{২৪}	৬,৩৭৮	১১.২ কিমি/সে
চন্দ্র	৭.৩৫×১০^{২২}	১,৭৩৮	২.৪ কিমি/সে
মঙ্গল	৬.২৪×১০^{২৩}	৩,৩৯৩	৫.০ কিমি/সে
বৃহস্পতি	১.৯০×১০^{২৭}	৭১,৪৯২	৫৯.৫ কিমি/সে
শনি	৫.৬৯×১০^{২৬}	৬০,২৬৮	৩৫.৬ কিমি/সে
ইউরেনাস (গ্রীষ্ম)*	৮.৬৮×১০^{২৫}	২৫,৫৯৯	২১.২ কিমি/সে
নেপচুন (বর্ষা)*	১.০২×১০^{২৬}	২৪,৭৬৪	২৩.৬ কিমি/সে
প্লুটো (শরৎ)*	১.২৯×১০^{২২}	১,১৫০	১.১৭৮ কিমি/সে
তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট। * বিকল্প নাম (আমার লেখা 'আসুন ঘুরে দেখি সৌরজগৎ' গ্রন্থে এসব নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে।)			

মহাকাশে অভিযান মানুষ 'এই মাত্র' শুরু করেছে। আমাদের সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহে মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে। পৃথিবী থেকে প্রথম মানুষ মাত্র ক'দশক আগে আমাদের অকৃত্রিম উপগ্রহ চন্দ্রের মাটিতে অবতরণ করেছে। কিন্তু মাহাকাশ তো বিরাট। অন্য একটি গ্রহ- মঙ্গলে মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ অবতরণ করা সম্ভব হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এ গ্রহে মানুষ গিয়ে পৌঁছুবে। আমেরিকা ও রাশিয়া একটার পর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ বা রবোট উপগ্রহ মাহাকাশে প্রেরণ করে যাচ্ছে। দূর-দূরান্তের গ্রহ জুপিটার, শনি, ইউরেনাস ইত্যাদির কাছে এগুলো পাঠিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য

সংগ্রহ করা হচ্ছে। মানুষ যদি কোনদিন এই সৌরজগত ছেড়ে যেতে চায়, আর আমার বিশ্বাস যাবেই- তাহলে এসব তথ্যাদি একান্ত জরুরী।

তবে সৌরজগত ছেড়ে তারকাজগতের দিকে পাড়ি দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এতে মৌলিক সমস্যা হচ্ছে দূরত্ব। নিকটতম তারাটিই ৪ থেকে ৫ আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ আলো যেতেই ৪-৫ বছর সময় লেগে যায়। সুতরাং কাছাকাছি না হলেও অন্তত আলোকের ৫০% গতিশীল মাহাকাশযান ছাড়া আন্তঃতারা মহাশূন্যে মানবসহ ভ্রমণ আদৌ সম্ভব নয়। তবে নিরাশ হবার কিছু নেই। ইতোমধ্যে মানবশূন্য একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আন্তঃতারা মহাশূন্যে আমরা প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৭৮ সালে পাইওনিয়ার নামক এই স্পেইস ক্রাফ্‌ট ঐতিহাসিক এ পদক্ষেপটি গ্রহণ করে। জুপিটারের বিরাট মাহকর্ষ দ্বারা ধাক্কা দিয়ে এটির গতি ৪০,০০০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় উত্তীর্ণ করা হয়। এরপর এটিকে ৯ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত ভেগা নামক একটি তারার দিকে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে এই উচ্চগতিও কিন্তু আন্তঃতারা মহাশূন্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অত্যল্প। পাইওনিয়ার যদি কোনদিন ভেগায় পৌঁছতে সক্ষমই হয় তাহলে, তা হবে আজ থেকে অন্তত ৪০ হাজার বছর পরে!

আন্তঃতারা ভ্রমণে 'সময়' ব্যয় হওয়ার ব্যাপারে আলবার্ট আইনস্টাইন আমাদেরকে কিছুটা আশার আলো যোগিয়েছেন। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আলোকের গতির সঙ্গে তুলনামূলক গতিশীল স্পেইস ক্রাফটের নভোচারীরা অন্তত 'সময়'কে অনেকটা বাঁচাতে সক্ষম হবেন। তাদের কাছে কয়েক আলোক বৎসরের দূরত্বও লাগবে কায়েক মাস কিংবা এরচেয়ে কম সময়। তবে পৃথিবীতে ঠিকই কয়েক বছর পার হয়ে যাবে। তথাপি এই থিওরী আমাদেরকে টাইম ট্রাভেলের সম্ভাবনা উন্মোচন করে দিয়েছে যদিও তা শুধুমাত্র ভবিষ্যতের দিকে হবে।

এমন দিন হয়তো আসবে, যেদিন এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সৃষ্টি মানবজাতি মাহাকশের অগণিত তারায় তারায় ভ্রমণ করবে। সেদিন আমরা যতো দূরে মনে করছি, হয়তো তা ততো দূরে নয়।

“আমি (আল্লাহ) তো মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশুষ্ক টনটনে মাটি থেকে” [সুরা হিজর ঃ ২৬]।

পরিচ্ছেদ ১৪

প্রাণীজগৎ

মহান আল্লাহর সৃষ্ট এ জড়জগৎ নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে বিশদ আলোচনা করেছি। তবে জড়জগতের চেয়েও জটিল এবং চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি হচ্ছে প্রাণীজগৎ। বিজ্ঞান এখনও এই পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে কিংবা তারাজগতে প্রাণীর সন্ধান পায় নি। এ মহাবিশ্বে একমাত্র আমাদের এই নীল গ্রহটিই প্রাণী জীবনের জন্য সবদিক থেকে উপযোগী। এই পরিচ্ছেদে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে প্রাণীজীবন এবং বিশেষকরে শ্রেষ্ঠ জীবী মানুষ ও তার দেহ নিয়ে আলোচনা করবো। তবে যেহেতু এই গ্রন্থটি কোন পাঠ্যপুস্তক নয় তাই এখানে বায়োলজি বা প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হবে না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশাল সাবজেক্টের উপর জরুরী কিছু আলোচনা হবে মাত্র।

জীবন বা প্রাণ আসলে কি?

জীবন বা প্রাণ বলতে আমরা আসলে কি বুঝাচ্ছি তা এখনও পরিষ্কার হয়নি। এমনকি বিজ্ঞানও লাইফ শব্দটির সংজ্ঞা ভাঙ্গাভাঙ্গাভাবে উপস্থাপন করেছে। জীবিত মানুষ বলতে আমরা কি বুঝি তা নিয়ে লিখিত ইতিহাস শুরু হওয়ার পর থেকেই চিন্তাশীলরা ঝগড়া করে আসছেন। মানবদেহটি একটি চলমান, শক্তিশালী, জ্যান্ত বস্তু হলেও এরমধ্যে লুকিয়ে আছে আরও অনেক রহস্য যার সঠিক সংজ্ঞা বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষের চিন্তাক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা, অনুভূতি, সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, আত্মা, ইত্যাদি বস্তু কিছুটা বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে। এগুলো সুষ্ঠু মাপকাঠির মাধ্যমে নির্ণয় ও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। অথচ এসব বস্তুর অস্তিত্বও অস্বীকার করার উপায় নেই। দার্শনিকরা এসব ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে চিন্তা করে

আসছেন। তুলে ধরছেন আমাদের সামনে বিভিন্ন থিওরী। অপরদিকে একদল সাইকোলজিষ্ট [মনোবিজ্ঞানী] বিজ্ঞানের কাছাকাছি থেকে মানুষের ইমোশন ও কর্মকাণ্ডের সঠিক স্বরূপ উন্মোচন করার চেষ্টায় রত আছেন। এ ক্ষেত্রেও বিশ্বজনিন কোন সঠিক তথ্য তারা খুঁজে পাননি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেন বাস করে একেকটি আলাদা, একক, স্বতন্ত্র বিশ্ব। সুতরাং এতো জটিল-কঠিন মানুষ নামক এই প্রাণীকে বুঝা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তবে একটি জিনিস সর্বক্ষেত্রেই প্রায় সমান বলে দেখা যায়, তহালো মানুষের দেহের কার্যকারিতা। প্রাণীজীবন নিয়ে আলোচনায় আমরা প্রথমেই মানবদেহের বিভিন্ন অংশের ফাংশন নিয়ে আলোচনা করবো। তবে প্রাণ বা জীবন আসলে কি তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও বায়েলজিতে এর একটি সংজ্ঞা আছে। প্রথমে এই সংজ্ঞাটি কি তা জানা জরুরী।

সাধারণতঃ জীবন্ত হওয়ার অধিকারী ঐসব বস্তুকে বুঝায় যার মধ্যে তিনটি গুণ নিহিত: ১. মেটাবলিজম [খাদ্য গ্রহণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, পাকযন্ত্রের ক্রিয়া এবং অকেজো বস্তু পরিত্যাগ], ২. গ্রোউথ [ক্রমবৃদ্ধি বা বেড়ে ওঠা] এবং ৩. রিপ্রোডাকশন [বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা]। নির্জীব কোন কোন জড়বস্তুর মধ্যে এই তিনটির এক বা দুটি পর্যন্ত গুণ থাকতে পারে কিন্তু তা প্রাণী হিসেবে গন্য হয় না।

উপরোক্ত তিনটি মৌলিক গুণ ছাড়াও প্রায় সব প্রাণীদের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ প্রাণীর দেহ তৈরী হয় কার্বন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন পদার্থের সমন্বয়ে। এবার উপরোক্ত মৌলিক তিনটি গুণাবলী নিয়ে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

মেটাবলিজম: এই সিস্টেমই দেহের কোষগুলোকে কর্মশীল করে তুলে। খাদ্য পাকস্থলীতে হজম হতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং এই ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডায়োক্সাইড বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ অক্সিজেন খাদ্যকে এনার্জিতে রূপান্তরিত করে। একটি দেহের কি পরিমাণ এনার্জি দরকার তা কয়েকটি ভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল। একটি দেহ নির্দিষ্ট সময়ে যেটুকু অক্সিজেন ব্যবহার করে- অর্থাৎ এনার্জি ক্ষয় হয়, তাকে বলে মেটাবলিক রেইট। এই রেইট বিভিন্ন কারণে বেশী কিংবা কম হতে পারে। যেমন, কোন প্রাণী যদি তার পেশীকে অতিরিক্ত কর্মে ব্যবহার করে তাহলে রেইট হবে বেশী; কি পরিমাণ খাদ্য সে গ্রহণ করছে সেটা থেকে এনার্জির

পরিমাণ নির্ণিত হবে; গর্ভাবস্থায় এনার্জি খুব দ্রুত কমে যেতে পারে; ইমোশন বা অনুভুতিও রেইটকে রদবদল করে। মেটাবলিক রেইটকে কিছু মৌলিক কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসেব উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এ রেইটকে বলে বাসেল মেটাবলিক রেইট (বিএমএ)।

মানুষের ক্ষেত্রে কন্ডিশন হলো, ৮ ঘণ্টা নিদ্রা; অন্তত ১২ ঘণ্টা পূর্বে খাদ্যগ্রহণ; ৩০ মিনিটব্যাপী কোন ব্যায়াম নেই; এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ১৬.৭ ডিগ্রী থেকে ৩০.৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে হতে হবে। এবস কন্ডিশন সঠিকভাবে প্রাপ্তির পর, সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় রেখে একজন মানুষের জন্য কি পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন, সেটা মেপে বের করলেই তা হবে সঠিক মেটাবলিক রেইট।

মেটাবলিজমের মাধ্যমে মূলতঃ দেহের ভেতর জরুরী এনার্জি সাপ্লাই হয়ে থাকে। খাদ্রগ্রহণের পর মেটাবলিক সিস্টেম এটাকে ভেঙ্গে এনার্জিতে পরিণত করে এবং ওয়েষ্ট প্রোডাক্ট কার্বন ডায়োক্সাইড, মল-মূত্র ইত্যাদি দেহ থেকে বের করে দেয়। এনার্জি দ্বারা দেহের প্রতিটি কোষ কর্মশীল হয়ে উঠে- অর্থাৎ এগুলো জীবন্ত থেকে নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকে।

গ্রোউথ: ক্রমবৃদ্ধি হচ্ছে যে কোন প্রাণীর একটি মৌলিক গুণ। প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রোউথ শব্দটি কিছু বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একক একটি সেল বা কোষ যেমন বাড়ে তেমনি একাধিক কোষের সমন্বয়ে ঘটিত একটি প্রাণীও বেড়ে ওঠে। মানুষের ক্ষেত্রে একটি ডিম্বকোষ বীর্যের মাধ্যে ফারটিলাইজ [ফলনশীল] হওয়ার পর থেকেই বাড়তে শুরু করে। গর্ভাশায়ে এই ভ্রূণটি কোষ বিভক্তির মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। বৃক্ষ-তরু-লতাও এই কোষ বিভক্তির মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে।

বংশবৃদ্ধি: প্রত্যেক প্রাণীজীবনই রিপ্রোডাকশন বা বংশবৃদ্ধি করে অস্তিত্ব বজায় রাখে। সাধারণতঃ দুটি উপায়ে বংশবৃদ্ধি হয়- এক. এসেক্সুয়াল (যৌনাঙ্গবিহীন) এবং দুই. সেক্সুয়াল (যৌকর্মের মাধ্যমে)। প্রথম ধরণের বংশবৃদ্ধি বৃক্ষরাজির মধ্যে বিদ্যমান। একটি ফুলের মধ্যে মুকুল বিকাশ করে, এরপর এতে সৃষ্টি হয় একটি বীচি যার মাধ্যমে নতুন আরেকটি গাছের জন্ম হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন শেওলা জাতীয় বৃক্ষ, বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে স্পোর বা বীজগুটি ছাড়ে যা অন্যত্র গিয়ে পতিত হয়ে

আরেকটি বৃক্ষের জন্ম দেয়। স্পোরের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি অপুষ্প উদ্ভিদের মধ্যেই দেখা যায়।

সেক্সুয়াল বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হয় স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্ন দুটি কোষ একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে। এই কোষগুলোকে বলে গ্যামেটিস- যেমন পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্বকোষ। গ্যামেটিস একত্রিত হয়ে যে নতুন বস্তু সৃষ্টি করে তার নাম হলো জাইগোট। একটি ফারটিলাইজ ডিম্বকোষ হচ্ছে এই জাইগোট। এই জাইগোট থেকেই শুরু হয় একটি নতুন জীবনের।

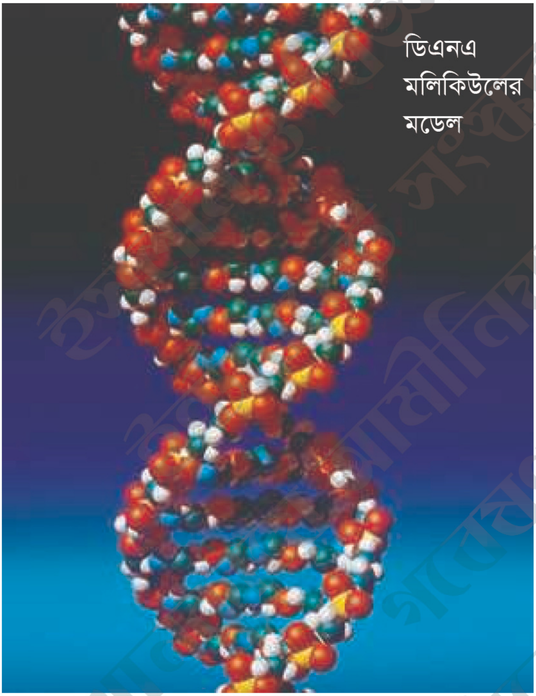
মানবশিশু

নারীর গর্ভাশয়ে একটি ডিম্বকোষে একটি মাত্র শুক্র (বীর্য) প্রবেশ করে একজন নতুন মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। অথচ একক কোন শুক্রকে মানুষ নগ্নচোখে দেখতেই পায় না। এই ডিম্বকোষ ও শুক্রের ভেতর কিসব গুপ্ত জৈবিক পদার্থ আছে, যা থেকে আস্ত একটি মানবদেহ সৃষ্টি হয়ে যায়? শুধু তাই নয়, এ দুটোর মিলনে যে ভ্রূণটি অস্তিত্বে আসে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রং, রূপ, আকার, প্রভৃতি সবকিছুই ঐ দুটি ক্ষুদ্রকায় জৈবিক পদার্থের মধ্যে লুকানো থাকে। মানবশিশু কিভাবে মায়ের গর্ভাশয়ে জন্ম নেয় এবং বেড়ে ওঠে এ ব্যাপারে এখন কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

ডিএনএ এবং আরএনএ

প্রাণীজগত কোষ বা সেল দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের দেহটির মধ্যে অসংখ্য সেল আছে। এই সেলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অংশ আছে। প্রতিটি সেলকে মেমব্রেন নামে একপ্রকার পদার্থ ঘিরে রাখে। বৃক্ষ-তরু-লতার সেলের চতুর্দিকে আরো একটি আলাদা শক্ত মেমব্রেন থাকে। এটাকে দেয়াল বলা যায়। তবে মানুষের সেলের এই দেয়াল তেমন শক্ত নয়।

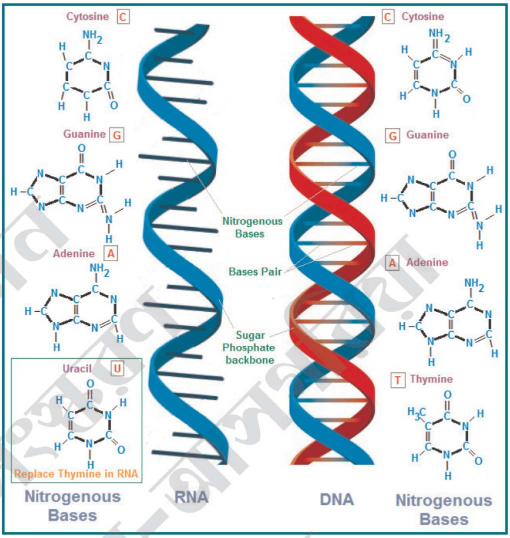
মেমব্রেন এর ভেতর আছে সাইটোপ্লাজম নামক একপ্রকার জৈবিক পদার্থ। প্রতিটি সেলের একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে। এটির সাথে বাইরের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা হয় পোর্স বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা। সেলের কেন্দ্রেই অবস্থান করে এক বা একাধিক মৌলিক জৈবিক এসিড। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ডিএনএ (ডিওক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড) আর অপর আকেরটি হলো আরএনএ (রিবোনিউক্লিক এসিড)।



ডিএনএ মলিকিউলের মডেল

ডিএনএ এর মধ্যে ক্রমোজাম নামক দুটি বস্তু আছে। এর একটি হলো এক্স-ক্রমোজাম আর অপরটি ওয়াই-ক্রমোজাম। প্রতিটি নবজাতকের যাবতীয় সৃষ্টি-কৌশল এই ডিএনএর মধ্যে কোড করা আছে। অন্যদিকে আরএনএ এর কাজ হলো প্রোটিন সিনথেসিস বা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। ডিএনএ এর মধ্যে কোড দেয়া আছে নতুন শিশুর চুল, চামড়ার রং কিরূপ হবে, নাক চাপা না খাড়া হবে, চোখ বড় না ছোট হবে প্রভৃতি দেহের প্রতিটি অংশের অবস্থান ও গঠনপ্রণালী এই ডিএনএ-তে কোড করা আছে। মূলতঃ ডিএনএ-কে মানবদেহ তৈরীর ব্লু-প্রিন্ট বলা যায়। এখানে অংকিত আছে সবকিছু।

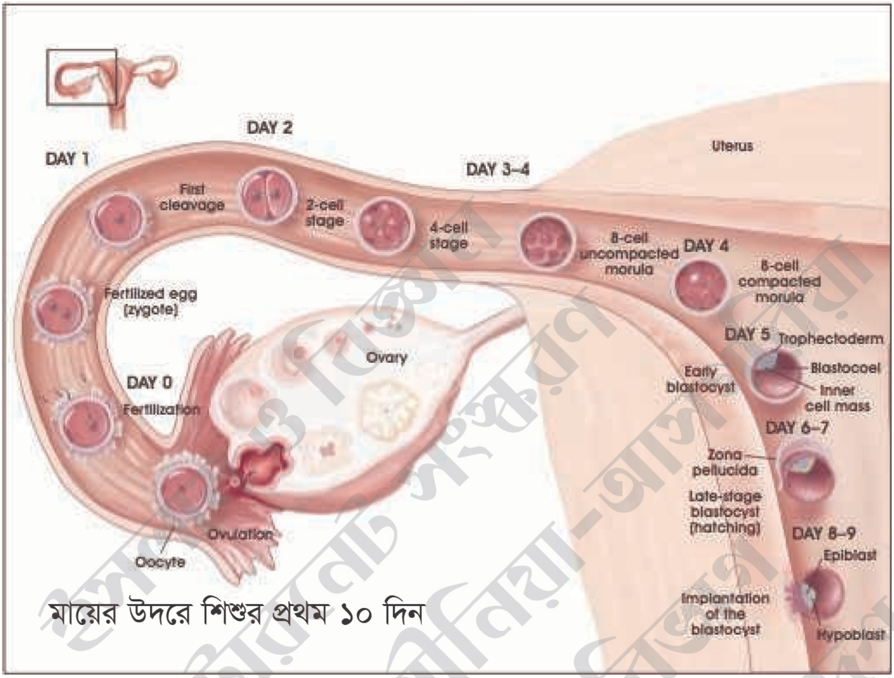
ডিএনএ থেকে নির্দেশ যায় দেহের কোথায় কি এবং কোন ধরণের অংগ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হবে। এবার দেখা যাক একটিমাত্র ক্ষুদ্র শুক্র ও ডিম্বকোষ থেকে কিভাবে আস্ত একটি মানুষের সৃষ্টি হয়।



গর্ভাশয়ে ভ্রূণ

মায়ের উদরে কিভাবে একটি শিশু পালিত হয় তা জানার বিজ্ঞানকে ভ্রূণবিদ্যা বা এ্যম্ব্রিয়োলজী বলে। এ প্রসংঙ্গে এই জ্ঞানের শাখার উপর অত্যল্প আলোকপাত করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং কোন টেকনিক্যাল গবেষণায় না গিয়ে সরল ভাষায় ভ্রূণবিদ্যার উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরছি মাত্র।

নারীদের গর্ভাশয়ে ফেলোপিয়ান টিউব নামে একটি অংশ আছে। এ টিউবে একটি বিশেষ স্থানে ডিম্বকোষ অপেক্ষা করতে থাকে। নারী-পুরুষের মিলনের ফলে পুরুষের শুক্রগুলো দ্রুত সেই অপেক্ষারত ডিম্বটির দিকে অগ্রসর হয়। অনেকের মতে ডিম্বের মধ্যে একধরণের কেমিক্যাল আছে যা এই শুক্রকে টেনে তার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিটি শুক্রের আকার হচ্ছে ঠিক বেঙ্গাচির মতো। এদের একটি গোলাকার মাথা ও একটি লম্বা লেজ আছে। এগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে সাঁতার কেটে ডিম্বকোষের দিকে অগ্রসর হয়। ডিম্বের আয়তন শুক্র থেকে অনেকগুণ বড়। শুক্রগুলো ডিম্বের চতুর্দিকে একত্রে ভেতরে ঢুকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তবে একটিমাত্র ডিম্ব [সময় সময় দুটি বা ততোধিক] ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই ডিম্বের মধ্য থেকে একটি সিগন্যাল এসে আর ভেতরে ঢুকার সম্ভাবনাকে রহিত করে দেয়।



মায়ের উদরে শিশুর প্রথম ১০ দিন

এই ভেতরে ঢুকার মুহূর্তই হচ্ছে ফারটিলাইজ হওয়া বা গর্ভধারণ করা। এ মুহূর্তের তিনদিন পরেই ডিমটি ইউটেরাস বা আসল গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। এর পরই ডিমের কেন্দ্রে ভ্রূণটি বাড়তে শুরু করে। অন্যদিকে ডিমের অন্যান্য অংশ থেকে প্লাসেন্টা বা নাভী সংযুক্তি সৃষ্টি হয়। এই প্লাসেন্টার মাধ্যমে নবজাতকের খাবার ও বর্জ্য পদার্থ মায়ের দেহের মাধ্যমে চলাফেরা করে। ভ্রূণটি যাতে সহজে এবং নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারে এজন্য তার চতুর্দিকে মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই একধরণের পানীয় দ্রব্য তৈরী হয়। এ তরল পিচ্ছিল পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ভ্রূণটি ভাসতে থাকে। মায়ের ছোটাছুটি ও নড়াচড়ায় যাতে ভ্রূণটির দৈহিক কোন ক্ষতি না নয়, এ নিশ্চয়তা দেয় এই পানীয়টুকু। এ পানীয়কে বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যামনিয়টিক ফ্লোইড বলে।

ক্রমাগত বেড়ে ওঠা এই ভ্রূণের ভেতর সেলগুলো সর্বদাই বিভক্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনের মধ্যেই তিনটি আলাদা অংশে বিভক্ত হয়ে উন্নতি হতে থাকে। এ

তিনটি অংশ থেকেই আস্ত মানবদেহ সৃষ্টি হয়। এ্যাক্সোডার্ম, মেসোডার্ম ও এ্যান্ডোডার্ম হচ্ছে এসব অংশের বৈজ্ঞানিক নাম।

এ্যাক্সোডার্ম থেকে চামড়া, চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এটা নার্ভাস সিস্টেমকেও সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ডের ভেতরের কোর্ড এবং মস্তিষ্কও এই অংশের দ্বারা তৈরী হয়।

মেসোডার্মের মাধ্যমে মানবদেহের হাড্ডিগুলো এবং মাসুল বা পেশী তৈরী হয়। এছাড়া হৃদযন্ত্র, ছোটবড় ধমনী, কিডনী, ব্লাডার ও যৌনাঙ্গ এ অংশ থেকে সৃষ্টি হয়।

মেসোডার্ম থেকে সৃষ্ট হৃদযন্ত্রটি মাত্র ২৪ দিনের মধ্যেই কম্পন বা বিট দেয়া শুরু করে। এ্যান্ডোডার্ম দ্বারা ডাইজেস্টিভ টিউব বা আঁত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সিস্টেমের ভেতরের লাইনিং তৈরী হয়।

প্রায় দশমাস মায়ের গর্ভে ভ্রূণটি এভাবে বড় হতে থাকে এবং অবশেষে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেঁচে থাকা ও আরোও দেড়যুগ যাবৎ বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-উপাদানসহ জন্মগ্রহণ করে।

এ হচ্ছে অতি সংক্ষেপে মায়ের গর্ভে শিশুর জীবনবৃত্তান্ত। কোন্ উপাদান থেকে নবজাতক ছেলে না মেয়ে হিসেবে সৃষ্ট হয়, তা এবার একটু গবেষণা করে দেখা যাক।

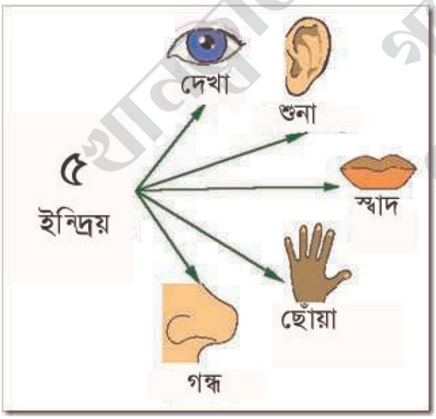
মায়ের গর্ভে শিশু

পুরুষের প্রতিটি শুক্র বা স্পার্ম দুটি অবস্থার একটি হয়ে থাকে। আগেই বলেছি ডিএনএ-এর মধ্যে ক্রমোজাম আছে। এর একটি হচ্ছে এক্স আর অপরটি ওয়াই ক্রমোজাম (এক্স বা ওয়াই নামগুলো ভিন্নতা বুঝাতে ব্যবহার করা হয় মাত্র)। পুরুষের শুক্রে থাকে এক্স এবং ওয়াই- এই উভয় ক্রমোজাম। অন্যদিকে মহিলাদের ডিম্বে আছে শুধুমাত্র এক্স ক্রমোজাম। আর ডিমের মধ্যে এই একক এক্স ক্রমোজাম সম্পূর্ণ অকেজো। তাই পুরুষের দুটি (এক্স এবং ওয়াই) ক্রমোজামের মধ্যে একটি মাত্র প্রয়োজন যা থেকে ডিমের মধ্যে একটি জোড়ার সৃষ্টি হয়। এই জোড়া হয় এক্স-এক্স

না হয় এক্স-ওয়াই হবে। এক্স-এক্স হলে শিশুটি মেয়ে হবে আর এক্স-ওয়াই হলে শিশুটি ছেলে হবে। এখানে লক্ষ করুন, যেহেতু নারীর ডিমের মধ্যে শুধুমাত্র এক্স আছে তাই নতুন শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে, তা নিশ্চিত করার কোন ক্ষমতা নারীদের নেই। কিন্তু পুরুষের এক্স এবং ওয়াই উভয়টি থাকায় নারীর এক্স এর সাথে উভয় জোড়া সৃষ্টি করতে পারে (অর্থাৎ, নারীর এক্স এর সাথে এক্স ক্রমোজাম দিয়ে এক্স-এক্স জোড়া বা ওয়াই দিয়ে এক্স-ওয়াই জোড়া তৈরী করে)। সুতরাং, নবজাতক শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপরই নির্ভরশীল।

মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়

মানবদেহে অনেকধরনের ভিন্ন বস্তু ও অংশ আছে। এর সবগুলো মিলেই একটি পূর্ণ মানবদেহ জ্যান্ত থাকে এবং জীবনভর বিভিন্ন ফাংশন করে থাকে। মানবদেহের প্রতিটি অংশই এক বা একাধিক কার্যে নিয়োজিত আছে। হৃদযন্ত্র দেহের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করে, ফুঁসফুসি স্বাস গ্রহণ নিশ্চিত করে এবং রক্তের মধ্যে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়। পকস্থলী খাদ্যদ্রব্যকে পাক করে উপকারী দ্রব্যাদি দেহে রেখে বর্জ্য পদার্থ ভাওয়েলে নিক্ষিপ্ত করে। মাথার খুলিতে রক্ষিত মোটা ব্রেনটি দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া কন্ট্রোল করে। এটা একটা মেমরী ষ্টোরেজ ও চিন্তার বস্তুও বটে। এছাড়া মানবদেহে আরোও কত কিছু বিদ্যমান তার ইয়ত্তা নেই। ব্লাডার, কিডনী, লিভার প্রভৃতি যন্ত্রাংশও নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে।



বাইর জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি ও এ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষের মধ্যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এগুলো হলো, চোখ (দৃষ্টি), কর্ণ (শ্রবণ), নাক (গন্ধ), জিহ্বা (স্বাদ) ও ত্বক (ছোঁয়া)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী সম্পর্কে সবারই জানা আছে। তবে এগুলো আমরা অহরহ ব্যবহার করে কিভাবে জগতে বিচরণ করছি

তা কি গভীরভাবে একবার ভেবে দেখেছি? এবার এগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষের মধ্যে আছে কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়। যেমনঃ বুদ্ধি, অনুভূতি, চিন্তা, চেতনা ও দিব্যদৃষ্টি। এবার সবগুলো ইন্দ্রিয় সম্পর্কে একে একে আলোচনা করে দেখা যাক।

(১) চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তিঃ মানুষের চোখ একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে চক্ষুকে একটি ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যায়। ঠিক ক্যামেরার মতো বস্তু থেকে আগত আলো একটি লেন্সের ভেতর দিয়ে রেটিনা বা অক্ষিপটে (ক্যামেরার ক্ষেত্রে ফিল্মে) পতিত হয়ে বস্তুর একটি ছবি অংকিত হয়। এ ছবিটি পরে ব্রেনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে। তবে ঠিক সাধারণ ছবির মতো হয়ে যায় না। এই আলো-আঁধারের খেলা থেকে মস্তিষ্ক কিভাবে দেখে তা বিজ্ঞান এখনও পরিষ্কার করে বলতে সক্ষম হয়নি। আমাদের চোখগুলো আসলে দেখে না, দেখে আমাদের ব্রেন। চোখের কাজ হলো বাইর জগতের আলো-আঁধার ব্রেনে নিয়ে পৌঁছানো। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্রেন গবেষণা বা আনালাইজ করে বোধশক্তিসম্পন্ন জিনিস হিসেবে দেখে। এ কঠিন কাজটি ঠিক কিভাবে মস্তিষ্ক সম্পন্ন করে তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আমাদের ব্রেন শত শত ভিন্ন ধরণ, রং ও গঠনের বস্তু দেখতে পারে ও আলাদা করতে জানে।

(২) নাক (গন্ধশক্তি): নাকের সাহায্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদিত হয়। এর একটি হচ্ছে শ্বাস-নিঃশ্বাস আর অপরটি হলো গন্ধ অনুধাবন করার শক্তি। নাক থেকেও কিছু তথ্য ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে এবং ব্রেন গন্ধের অনুভূতি দান করে।

নাকের গভীরে ওলফেক্টরী নামক একটি অংশ আছে। এখানে কিছু গন্ধ অনুধাবন করার সেল বা কোষ আছে। বাতাসের সাথে বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন কেমিক্যাল ও এদের আলাদা গন্ধ নাকের ভেতরে গিয়ে এই কোষগুলোতে প্রতিক্রিয়া করে। ওলফেক্টরী সেলে পতিত কেমিক্যাল তথ্য শেষ পর্যন্ত নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। ব্রেন এসব তথ্য থেকে বিভিন্ন গন্ধ অনুধাবন করে।

এভাবে আমরা সুগন্ধী আর বাসি জিনিসের অর্থ কি বুঝতে পারি। এ ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে আমরা গন্ধ অনুধাবন করি তা বিজ্ঞান বের করতে সক্ষম হয়নি। এর একটা বিশেষ কারণ হলো, মানুষের মধ্যে ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিক্ষমতা এবং চেতনা আছে। সর্বোপরি আত্মা নামক একটি অজড় জিনিসের নিবাস মানুষের মধ্যে। ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলির (চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বার) মাধ্যমে আগত তথ্যসমূহ ব্রেন বুঝতে পারে, কিন্তু কে বুঝে? এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান জানে না। এটা ফিলোসফি ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার। তবে এক্ষেত্রে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, মানুষ একটি যন্ত্র নয়। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট রহস্যের জগত। বিজ্ঞান সৃষ্ট বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে। মানব দেহটিও একটি সৃষ্ট বস্তু, কিন্তু এটির সাথে জড়িত আছে অতিন্দ্রিয় জতগের সংযোজন, যা বিজ্ঞানের গণ্ডিসীমার বাইরে অবস্থান করে। মানবদেহের পরিচলন, এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েই বিজ্ঞানের গবেষণা সিমীত।

(৩) জিহ্বা বা স্বাদঃ স্বাদ গ্রহণ করা ও বুঝার বস্তুটি হলো আমাদের জিহ্বা। জিহ্বা ও নাক একত্রে কাজ করে থাকে। এ দুটো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে খাবারের মধ্যে বিষাক্ত কিছু আছে কি না তা অনুধাবন করা যায়। এছাড়া শ্বশুরবাড়ির খোরমা-পোলাও সুস্বাদু কি না তা-ও জানা যায়।

জিহ্বার মধ্যে স্বাদ কি তা বুঝার মতো সেনসিটিভ সেল আছে। কোন খাদ্যদ্রব্য জিহ্বায় পড়লেই এসব সেল লালার সাথে মিশে খাদ্যের স্বাদ অনুযায়ী বিভিন্ন নার্ভ সিগন্যাল ব্রেনে পাঠিয়ে দেয়।

স্বাদ ও গন্ধ ব্রেনের যে অংশটুকু বুঝতে পারে তা ব্রেনের গোড়ায় অবস্থিত। জিহ্বার স্বাদ ও গন্ধ থেকে আমাদের অনুভূতি বা ইমোশনও উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানেও কি উপায়ে আমরা ব্রেন দিয়ে স্বাদ অনুভব করি বা আসলে কে তা করে বিজ্ঞান ঠিকমতো বলতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত মানুষের চেতনা ও নিজস্ব পরিচিতি বলতে যা বুঝায়, এসব না থাকলে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন তথ্য অনুধাবন করতে পারতাম না।

(৪) কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়ঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ও আরেকটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। বাতাসে ভ্রমণকারী শব্দ-তরঙ্গ কানে পৌঁছলে কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে শব্দ-তরঙ্গ নার্ভ সেলের

মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। যদিও শব্দের উৎপত্তি ভাইব্রেশন বা কম্পন থেকে কিন্তু ব্রেন এটাকে শব্দ হিসেবে শোনে। ব্রেনের ভেতর এমন কিছু গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে আছে যে, এটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিটি নার্ভ সিগন্যালকে (এক ধরণের ইলেকট্রিক তরঙ্গ) আলাদাভাবে বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে জানে। মূলতঃ ব্রেনকে এজন্যেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বলা হয়। একমাত্র হৃদযন্ত্র ছাড়া আমাদের দেহের যাবতীয় ফাংশন বা কার্যকারিতা এই ব্রেনই নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা, শোনা, অনুভব করা, চিন্তা, চেতনা, স্বাদ, গন্ধ, হাত-পায়ের চলাচলসহ প্রতিটি দৈহিক ফাংশন একমাত্র ব্রেনই কন্ট্রোল করে থাকে।

কর্ণের কার্যকারিতা অনেকটা স্পিকারের মতো। কানের ভেতরে ইয়ার-ড্রাম নামে একটি অংশ আছে। এ ড্রামের মধ্যে বাতাস ভর্তি থাকে। বাইর থেকে আগত শব্দ-তরঙ্গ এই ড্রামের মধ্যে কম্পন শুরু করে। ড্রামের মধ্যে কিছু নার্ভ-সেল আছে যা ব্রেনের সাথে সংযুক্ত। আগত শব্দ ড্রাম থেকে এই নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে পৌঁছে এবং ব্রেন তা শব্দ হিসেবে আমাদের চেতনায় জানিয়ে দেয়। এভাবে আমরা জগতের শব্দ শ্রবণ করে থাকি।

(৫) ত্বক বা ছোঁয়া: আমরা চোখ বন্ধ করে রাখলেও কেউ যদি আমাদের হাতে একটি ছোট বল দেয় তবে আমরা বলতে পারি এটা গোলাকার একটি বল। অনুরূপভাবে এটা যদি অন্য কোন আকারের বস্তু হয় তবে তা আমরা সহজে বুঝতে পারি বস্তুটির আকার কি। যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে সক্ষম হই এটাকে টাচ বা ছোঁয়ার ইন্দ্রিয় বলে। ত্বক বা চামড়ার মধ্যে সর্বত্র এক ধরণের নার্ভ সেল আছে। আমরা যখন কিছু স্পর্শ করি তখন এগুলোর মাধ্যমে অনেক সিগন্যাল আলোকের গতিতে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। ব্রেন তখন এসব সিগন্যালকে ব্যাখ্যা করে চেতনার মধ্যে অনুভূতি জাগায়। আমরা তখন বুঝতে পারি যে বস্তুটি স্পর্শ করেছি তা কী হয় এবং এটা গরম না ঠাণ্ডা, লম্বা না বেটে, ভারী না হালকা, কঠিন না তরল প্রভৃতি।

এ হচ্ছে আমাদের দেহের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এক্ষেত্রে আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

মানবদেহে অনুভূতি ও চেতনা সম্পর্কে দার্শনিক এ্যারিষ্টটল প্রথম গবেষণা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এরপর প্রায় ন'শ বছর পূর্বে মহাত্মন ইমাম গায্‌যলী (রহঃ) ইন্দ্রিয় সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেন।

তিনি সাধারণ পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়াও আরো একাধিক আভ্যন্তরীণ চেতনা সৃষ্টিকারী ইন্দ্রিয় যে মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে, সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেন। যেমনঃ ব্যথা, উষ্ণতা, ব্যালান্স, হাড্ডির জোড়ার অবস্থান, পেশী ও এতে সৃষ্ট চাপ এবং রক্তচাপ। এসব ক্ষেত্রেও ব্রেনে তথ্যসমূহ আসে (মস্তিষ্ক ইনফরমেশন পায়)। এখানে উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু তথ্য ব্রেনে পৌঁছলেও আমাদের চেতনা বা কনশিয়াসনেছ তা বুঝতে পারে না। যেমন রক্তচাপের ক্ষেত্রে ব্রেনে আগত তথ্য অনুযায়ী চাপের মধ্যে ব্যালান্স তৈরী করে স্বাভাবিক করা হয়। অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, দেহের মধ্যে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের মধ্যে এ্যাবিডি নামক কিছু সেল আছে, এগুলো এই ফরেন জীবাণুগুলোকে আক্রমণ করে। এটাকে দেহের ইম্যিউন সিস্টেম (রোগ প্রতিশেধক ক্ষমতা) বলে। তবে রোগজীবাণুগুলো যে দেহে প্রবেশ করেছে এ তথ্য ব্রেনে নার্ভ সেলের মাধ্যমে পৌঁছার পরই সেখান থেকে আক্রমণের ওর্ডার আসে। এরূপ অসংখ্য তথ্যাবলী ব্রেন ও দেহের মধ্যে চলাচল করছে যার খবর আমাদের চেতনা মোটেই জানে না। আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে।

সক্রিয় একটি অপূর্ব পাম্প হৃদযন্ত্র

মানবদেহের প্রতিটি কোষে বা সেলে যে যন্ত্রটি রক্ত সরবরাহ করে সেটি হলো হৃদযন্ত্র। এ যন্ত্রের সাথে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশের সরাসরি যোগাযোগ আছে। ধমনী, শিরা, উপশিরা প্রভৃতির মাধ্যমে এ যোগাযোগ রক্ষিত হয়।

মানবদেহের খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আমরা সাধারণত তরল ও কঠিন পদার্থ গ্রহণ করে থাকি। তবে দেহের বিভিন্ন অংশ এবং সেলগুলো কিন্তু এ অবস্থায় খাদ্য থেকে উপকার গ্রহণ করতে অসমর্থ। আর আগেই বলেছি মানবদেহের প্রতিটি সেলই জ্যান্ত, সুতরাং তাদের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যকে যেসব অবস্থায় সেলগুলো গ্রহণ (ব্যবহার) করতে পারে তাহলো অক্সিজেন, কার্বন ডায়োক্সাইড, জৈবিক নিউট্রিয়েন্‌স প্রভৃতি।

যে সিস্টেমের মাধ্যমে এই খাদ্যগ্রহণ সম্ভব হয় সেটিই হচ্ছে মানবদেহের সার্কুলেটরী সিস্টেম। এ সিস্টেমের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটির নামই হচ্ছে হৃদযন্ত্র বা হার্ট। হার্টের ভেতর চারটি চেম্বার (কামরা) আছে। এগুলো হলো ডান ও বাম আট্রিরাম, এ দুটি চেম্বার দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে-আসা রক্তকে গ্রহণ করে, বাকী আরো দুটি চেম্বার আছে যেগুলোকে ডান ও বাম ভেনট্রিকোল বলে। ভেনট্রিকোলগুলোর মাধ্যমে রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। আর্টারী বা ধমনী হচ্ছে রক্ত-ভেস্যাল, যার মাধ্যমে রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে যায়। অপরদিকে শিরা বা ভেইন রক্তকে হার্টে নিয়ে আসে। আর্টারী ও শিরার সাথে অসংখ্য ছোট ছোট উপশিরা বা ক্যাপিলারী সংযুক্ত আছে। এই ক্যাপিলারীর দেয়াল থেকেই সেলগুলো রক্ত (রক্তে উপস্থিত খাদ্য) গ্রহণ করে এবং বর্জ্য (অনুপকারী বস্তু) ফিরিয়ে দেয়। এসব কার্য সম্পাদিত হয় হৃদযন্ত্রের পাম্প বা চাপ থেকে, যা একটি মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিন পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, হৃদযন্ত্র কিভাবে কাজ করে- কিন্তু এর পেশীগুলো যে অনবরত নিয়মমাফিক পাম্প করে যাচ্ছে তার কারণ কি বলতে পারছেন না। দেহের প্রতিটি যন্ত্র ও অংশকে মস্তিষ্ক কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু হার্টকে পারে না।

শেষকথা

বিজ্ঞান আজ একটি বিরাট বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকাল শুধুমাত্র এই একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা হচ্ছে বহুখণ্ডে প্রকাশিত বিশ্বকোষ। সুতরাং জ্ঞানের এই বিরাট শাখার উপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে আমি আশাকরি এই খণ্ড পাঠ করার পর অনেকেই হয়তো বিজ্ঞানের উপর কিছুটা অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে কতো চিত্তাকর্ষক বিষয় তা-ও হয়তো অনুধাবন করেছেন। এই লেখা পাঠের পর বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও অধিক জানার আগ্রহ যদি বাড়ে তবে এ চেষ্টা সার্থক হবে।

নিঃসন্দেহে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে, বিজ্ঞানের উপর আরোও অধ্যয়ন করতে যেয়ে বাংলা ভাষায় বই-পুস্তক পাবো কোথায়? কারণ, এটা সর্বজনজ্ঞাত একটি ফ্যাক্ট যে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর বাংলা ভাষায় লেখালেখি খুব

অল্প হয়েছে। তবে পত্র-পত্রিকায় ইদানিং এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে যা অনুসন্ধিৎসুদের জন্য সুখবর বটে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সবার প্রিয় একটি সাবজেক্ট হিসেবে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তুলে ধরতে হলে আমাদেরকে কিছু মৌলিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রথমতঃ সর্বসাধারণের মধ্যে একটি অবাস্তব ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। আর তাহলো, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবার জন্য বুঝা খুব কঠিন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদেরকে বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে, মস্তিষ্কের ক্ষমতার মাত্র ২% বা ৩% অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করে থাকে। বাকী ৯৭% কিংবা ৯৮% অকেজো হিসেবে পড়ে আছে! সুতরাং বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ব্রেন-পাওয়ার বা বুদ্ধিক্ষমতার ত্রুটি থাকতে পারে- তা আদৌ সঠিক নয়। কিন্তু এরপরও এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি মানুষের আগ্রহ কেন এত অল্প- তা ভালোভাবে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

আমরা জানি পুরো দেশব্যাপী সাবজেক্টের প্রতি আগ্রহের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অধ্যয়নে নিরুৎসাহ প্রদর্শন করে। আর এই অনীহার প্রধান কারণ হলো, তারা মনে করে এ বিষয়ে অধ্যয়ন কঠিন। সুতরাং, যেহেতু দীর্ঘকাল সাইন্সে লেখাপড়া শেষে পাশের আশা নেই- তাই সহজ-সরল আর্টস্ সাবজেক্ট একটা নিয়ে ডিগ্রী দিলেই সারলো! ভাবটা এটাই।

ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞানাতঙ্ক কেন জন্মে, এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো- ছোট থেকেই বিজ্ঞানের উপর সরল ভাষায় লিখিত অপর্যাপ্ত বই-পুস্তক হেতু এ বিষয়ে তারা তেমন বেশী জানতে সক্ষম হয় নি। এর চিত্তাকর্ষক দিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকায় তারা বিষয়টির উপর অনুৎসাহিত।

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আকর্ষণীয় দিক প্রথমতঃ সবার জন্য প্রাঞ্জল, সরল-সহজ ভাষায় প্রিন্টেড মিডিয়ায় তুলে ধরতে হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় যা লিখা হচ্ছে তার সিংহভাগই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। এর একমাত্র কারণ

হলো উপস্থাপনে কাঠিন্যতা অবলম্বন করা হচ্ছে। বিদেশী শব্দব্যবহার হচ্ছে অবাধে। অথচ এভাবে লেখার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের সকলেরই ভালোবাসা আছে বলে আমরা দাবী করি- কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, লেখক-গবেষকরা বিদেশী শব্দ-প্রয়োগে তৃপ্তিবোধ করেন! এ প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে। কাঠিন্যতা প্রজ্ঞাকে প্রমাণ করে না- বরং দুর্বোধ্যতার ফলে পাঠকের আগ্রহে ভাটার সৃষ্টি করে।

অনেকে বলবেন, বিজ্ঞান যেহেতু আজকের বিশ্বে এসে ইংরেজির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেছে তাই অন্তত ইংরেজি শব্দব্যবহার ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি আছে? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা ভাষার খাতিরে, পাঠকদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সরল ভাষায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে আমরা অনেক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে পারি- সাথে সাথে মূল ইংরেজিটাও রেখে দিতে পারি। এতে যারা ইংরেজি শব্দটির উপর বেশী আস্থাশীল তাদেরকে যেমন খুশী রাখা যায়- একই সময় বাংলা শব্দটি প্রয়োগের ফলে ইংরেজি যে বুঝেন না, তার জন্য অনেকটা বোধগম্যও হয়ে গেল। আর কালে এই ব্যবহৃত বাংলা প্রতিশব্দটি সবার বোধগম্য হয়ে ওঠলে আমরা অবশেষে ইংরেজিটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে পারি। তবে প্রয়োজনে বাংলা শব্দব্যবহার ছাড়াও অর্থের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পরে। এতে দুর্বোধ্য বা অল্প ব্যবহৃত বাংলা শব্দটির সঠিক অর্থ পাঠকদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। এসাথে পুরো ব্যাপারটি বোধগম্য হয়েও ওঠবে।

দ্বিতীয়তঃ খুব বেশী বেশী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর সরল ভাষায় লেখালেখির প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন বয়সের পাঠকদের উদ্দেশ্য করে এ লেখালেখি করতে হবে। চিত্তাকর্ষক ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ও তথ্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

যা হোক, আমি আশা করবো লেখক, বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিন্তাশীল সুধীজন আমার এই গ্রন্থটি পাঠ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব যে কতো বিরাট তা আরোও বেশী অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। এসাথে এটাও অনুধাবন করবেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সংঘাত নেই- যার উপর পরবর্তী খণ্ডে বিশদ আলোচনা হয়েছে। আর এটাও সবাইকে অনুধাবন করতে হবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর ব্যাপক আগ্রহ-অধ্যয়ন ও গবেষণা ছাড়া আমাদের সমাজজীবনে বৈষয়িক উন্নয়নসহ ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ঠিকে থাকা খুব কঠিন হবে।